বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

ডক্টর অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ., এল. এল. বি., পি-এইচ. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পালি বিভাগের
প্রধান অধ্যাপক

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২ :: ১৯৬৬

মুখবন্ধ

বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতেই নয়, এককালে বহির্ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানেও তার প্রভাব বিস্তার করে ধর্মীয় জগতে এক ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। সিংহল, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম আজও সজীব রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতে তা কালক্রমে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। ১৯৫৬ সালে সার্ধদ্বিসহস্রতম মহামানব বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষে ভারত সরকারের উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদার সহিত সারা ভারতে সাড়ম্বর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির লুপ্ত গৌরব ও প্রাচীন রত্নরাজি উদ্ধারের চেষ্টা বেড়ে উঠেছে এবং অনেকের মধ্যে এ ধর্ম সম্বন্ধে জানবার বেশ একটা আগ্রহও জেগেছে। তাই আজ বুদ্ধদেব ও তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধীয় সাধারণের পাঠোপযোগী সহজপাঠ্য বই-এর প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে।

ইতিপূর্বে বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক কয়েকটি পুস্তক লিখেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী প্রমুখ মনীষিগণ। তাঁদের লিখিত গ্রন্থগুলি যে পাঠক-পাঠিকার কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়ে আসছে তাতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আরও নানা দিক থেকে আলোচনা করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে আমি বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে বৌদ্ধধর্মের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য সম্পর্কে একখানি সংক্ষিপ্ত পূর্ণাংগ ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা করে আসছিলাম। বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এরূপ একখানি গ্রন্থ আগে লিখে উঠা সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি খড়্গপুর কলেজে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। এর পর আমার কয়েকজন শুভার্থী বন্ধু ও ছাত্র-ছাত্রী উক্ত বক্তৃতা কয়টি বাড়িয়ে এবং তার সংগে আরও কিছু নতুন তথ্য সংযোগ করে সাধারণের পাঠোপযোগী একখানি পুস্তক প্রকাশ করতে আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হই এবং আমার দীর্ঘ দিনের বাসনাও ফলবতী হয়। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে খড়্গপুর কলেজে পঠিত বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু

ছাড়াও এ বিষয়ে আমার আরও কয়েকটি প্রবন্ধ জগজ্জ্যোতি, বসুমতী ও নালন্দা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এবং এর সংগে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও কয়েকটি নতুন বিষয় যোগ করে এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছি। পাঠক-পাঠিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে খুব সহজে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান, ক্রমবিকাশ, বৌদ্ধসংঘ, বৌদ্ধসাহিত্য, বৌদ্ধশিক্ষা-দীক্ষা ও বৌদ্ধধর্মের তিরোধান প্রভৃতি বিষয়ের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রেখে আমি এ পুস্তক প্রকাশে অগ্রণী হয়েছি। বইখানি পড়ে তাঁদের যদি কিছু মাত্রও লাভ হয়, তা হলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় আমি আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নানা-ভাবে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তাদের মধ্যে ঋষিকেশ গুহ, কানাই লাল হাজরা, জ্ঞানকীর্তি শ্রমণ, বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু ও ডক্টর আশা দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থের নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করেছেন আমার ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত। তাঁকেও আমার ধন্যবাদ। পরিশেষে 'ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়' নামক প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে যে সাহায্য করেছেন সে জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-১২
১৭ জুন, ১৯৬৬

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

যে মহামানবের জীবনকথা ও ধর্মমত প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে তিনি 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'র ই এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ। খৃষ্টপূর্ব ছ'শতকে জাতীয় জীবনের এক বিশেষ যুগে এই দীপ্তিমান পুরুষের আবির্ভাব। প্রাচীন ইতিহাসে এই যুগ উজ্জ্বল ও গৌরবময়। কিন্তু ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থার সাথে একটু পরিচিত না হলে এই আলোচনার ভিত শক্ত হয় না। তাই এসবের পট-ভূমিতেই বক্তব্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

• রাজনৈতিক অবস্থা ঃ এই মহাপ্রাণ পুরুষ গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শুধু তাই-ই নয়, এই রাজ্যের অধিপতিগণ পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় কেউ-ই বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হন নি। তখন অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার, কম্বোজ—এই ষোলটি রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। এগুলো-ই বৌদ্ধ সাহিত্যের ষোড়শ মহাজনপদ। এ জনপদগুলি গড়ে উঠেছিল কাবুল হতে গোদাবরী পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে। এগুলির মধ্যে অশ্মক কেবল দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী তীরে অবস্থিত ছিল। পালি দীঘনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, মহানিদ্দেস ও জৈন ভাগবতীসূত্রে এদের উল্লেখ মেলে। এখানে এগুলোর একট সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ঃ—

অঙ্গ—বর্তমান ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এটির রাজধানী ছিল চম্পানগরী। ভাগলপুরের নিকট চম্পানগর ও চম্পাপুরী চম্পানগরী বলে সনাক্ত করা হয়। রাজা বিম্বিসারের সময় এটি মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মগধ—বিহারের বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। রাজ-গৃহ বা গিরিব্রজ ছিল রাজধানী। চম্পানদী অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের সীমা নির্দেশ করতো।

কাশী—ষোড়শ জনপদগুলোর মধ্যে অধিক ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। বাবাণসী ছিল বাজধানী। বিস্তারে ও জাঁকজমকে বাবাণসী সেকালেব সব নগবেব সেবা ছিল। জানা যায, পববর্তীকালে কাশী কোশলেব অধীনে আসে।

কোশল—বর্তমান উত্তব প্রদেশেব অযোধ্যা ও তাব সংলগ্ন এলাকা নিযে গঠিত। শ্রাবস্তী কোশলের বাজধানী ছিল। অযোধ্যা ও শাকেত কোশলেব সমৃদ্ধিশালী ও উল্লেখযোগ্য নগব ছিল।

বৃজি—আটটি গোষ্ঠীব মিলিত বাষ্ট্র নিযে গঠিত ছিল। এগুলোব মধ্যে লিচ্ছবি ও বিদেহ অধিক শক্তিশালী ছিল। বৃজি বাজ্যেব বাজধানী ছিল বৈশালী। উত্তব বিহাবেব বর্তমান মজফফবপুব জেলাব বেসাব বা বসাব বৈশালী নগব বলে সনাক্ত কবা হয।

মল্ল— এ বাষ্ট্রটিব দু'টি ভাগ ছিল। একটিব বাজধানী ছিল কুশাবতী বা কুশিনাবা এ। অপবটিব বাজধানী ছিল পাবা। ক্ষুদ্র গণ্ডক নদীব তীবে ও গোবখপুব জেলাব পূর্বদিকে বর্তমান কাসিযা কুশিনাবা ও কাসিযাব বারো মাইল দক্ষিণ পূবে বর্তমান পদবোবন পাবা বলে সনাক্ত কবা হয।

চেদি—যমুনা নদীব তীবে বর্তমান বুন্দেলখণ্ড ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল নিযে গঠিত ছিল। শুক্তিমতী নগব ছিল বাজধানী। মহাভাবতেব শুক্তিমতী নগব বলে এটিকে অনেকে মনে কবেন।

বৎস বা বংশ—এ বাষ্ট্রটি ছিল গঙ্গাব দক্ষিণ দিকে। উত্তব প্রদেশেব এলাহাবাদেব সন্নিকটে যমুনা নদীর তীবে কৌশাম্বী—বর্তমান কোশক ছিল রাজধানী। উদযন ছিলেন এ বাষ্ট্রের রাজা। মনীষী ওল্ডেনবার্গেব মতে ঐতেবয ব্রাহ্মণে বৎস ছিল বংশ।

কুরু—উত্তরে সবস্বতী নদী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীব মধ্যবতী সোনাপৎ, অমিন, কর্ণল ও পানেপথ জেলাগুলি নিযে গঠিত ছিল। উত্তব কুরু ও দক্ষিণ কুরু এই দু'টি বিভাগ ছিল।

পাঞ্চাল—বোহিলখণ্ড ও মধ্য দোযাব নিযে গঠিত ছিল। এ বাষ্ট্রটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ভাগেব নাম উত্তব পাঞ্চাল আব একটিব নাম ছিল দক্ষিণ পাঞ্চাল। ঐহিচ্ছত্র বা ছত্রবতী উত্তব পাঞ্চালেব এবং কাম্পিল্য দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী ছিল।

মৎস্য—চম্বল ও সরস্বতী নদীর তীরস্থ জঙ্গল সন্নিহিত পাহাড়গুলির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত ছিল। বর্তমান জয়পুরের বিরাট নগর বা বৈরাট ছিল রাজধানী।

শূরসেন—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মথুরা ছিল রাজধানী। বর্তমান মথুরা শহরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মহোলী মথুরা বলে সনাক্ত হয়।

অশ্মক—গোদাবরী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। পোতন বা পোতল ছিল রাজধানী। নিজাম রাজ্যের বোদন পোতন বলে সনাক্ত হয়। পালি সাহিত্যে অশ্মকের অবন্তীর সহিত সতত উল্লেখ দেখা যায়।

অবন্তী—বর্তমান মালোয়া নিমার ও মধ্যভারতের সংলগ্ন এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে অবন্তীর দু'টি ভাগ ছিল। উজ্জয়িনী উত্তর ভাগের এবং মাহিষ্মতী দক্ষিণ ভাগের রাজধানী ছিল। পালি দীঘনিকায়ের মহাগোবিন্দসুত্ত হতে জানা যায় মাহিষ্মতী অবন্তীর রাজধানী ছিল এবং বিশ্বভূ ছিলেন রাজা।

গান্ধার—কাশ্মীর উপত্যকা নিয়ে গঠিত ছিল। তক্ষশীলা ছিল রাজধানী। সম্রাট অশোকের সময় গান্ধার তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়।

কম্বোজ—ভারতের উত্তর পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত ছিল। ডাঃ বিমলা চরণ লাহার মতে কম্বোজ রাজোরি বা প্রাচীন রাজপুরের চতুর্দিকের অঞ্চল ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলা নিয়ে গঠিত ছিল।

এদের অধিকাংশই রাজতন্ত্র এবং কয়েকটিতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজতান্ত্রিক মগধ, কোশল, বৎস, অবন্তী প্রভৃতি বিশেষ পরাক্রমশালী রাজ্যের রাজাদের অন্য রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিরোধ বিদ্রোহ লেগেই থাকত। গণতন্ত্রশাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে বৃজি, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক প্রভৃতি গোষ্ঠীর মিলিত রূপ বৃজি রাজ্যই ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোন রাজা না থাকায় এই রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার থাকত একটি সমিতির উপর। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বৃজি রাষ্ট্র ছাড়াও মল্ল, শাক্য, মোরিয় প্রভৃতি আরও কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামাজিক অবস্থা: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ বিভাগ ছিল এই যুগের এক বৈশিষ্ট্য এবং পরবর্তীকালে এই প্রথাই কঠোর জাতিভেদের

আকার ধারণ করে। এ যুগে ব্রাহ্মণেরা সমাজের উচ্চ কোঠায় বসে একদিকে যেমন প্রবল আধিপত্যে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন অন্যদিকে তেমনই শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ ও পৌরোহিত্যও করতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-ব্যবসা ও রাজ্য-শাসন করতেন, বৈশ্যরা করতেন কৃষিকাজ, পশু পালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য আর শূদ্ররা সমাজের নীচু কোঠায় থেকে করতো সমাজের দাসত্ব। তাই এই শূদ্রের ভাগ্যেই জুটত যত অবহেলা, অপমান ও লাঞ্ছনা। জাতিভেদ প্রথা এই সময় জন্মগত হয়ে দাড়িয়েছিল। এই সময় একদিকে ব্রাহ্মণেরা যেমন অহংকারী ও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অন্যদিকে বৈশ্যরাও তেমনই বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করে হয়ে উঠেছিলেন ব্যয়বিলাসী ও সুখভোগী। স্ত্রীলোকের অবস্থা বেশ ভাল ছিল না, কারণ তারা গার্হস্থ্য সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। আবার সমাজে বহু বিবাহের যেমন প্রচলন ছিল তেমনই অসবর্ণ বিবাহেরও অভাব ছিল না। উচ্চ তিন শ্রেণীর পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল কিন্তু স্ত্রী শিক্ষা কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাও অতি স্বল্পভাবে।

আর্থিক অবস্থা : এ যুগে ব্যবসা বাণিজ্য অজ্ঞাত ছিল না। সমুদ্রপথে বণিকেরা দেশবিদেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করে যে বেশ বিত্তশালী হয়ে উঠত সে কথার নিদর্শন আমরা বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্য হতে পেয়ে থাকি। দেশের মধ্যে শকট করে এবং নদীতীরবর্তী দেশসমূহে নৌকাতে মাল আদান প্রদান করে বহুসংখ্যক লোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। এছাড়া অনেক প্রকার শিল্প কলারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সূত্রধর, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার প্রভৃতির জীবিকানির্বাহের হাতিয়ার ছিল তাদের শিল্প কর্মই। রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন তখনও হয়নি। আবার ব্যাঙ্কের প্রচলন না থাকায় মাটির নীচেই সোনাদানা পুঁতে রাখা হত। উচ্চস্তরের লোকের আর্থিক অবস্থা উন্নতই ছিল কিন্তু নিম্ন শ্রেণীরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই—তাদের না ছিল সম্মান, না ছিল সম্পদ।

ধর্মীয় অবস্থা : এ যুগে কয়েকটি দেশেই ধর্মজগতে এসেছিল চিন্তার এক বিরাট আলোড়ন। গ্রীসে পারমেনিডেস (**Parmenides**) ও এমপেডোক্লিস (**Empe locles**), ইরানে জোরোস্থ্রুষ্ট্র (**Zarathustra**), চীনে লাও-সে ও কনফুসিয়াস এবং ভারতে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ—এঁদের আবির্ভাবই এনেছিল এই জোয়ার।

পটভূমি

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতের ধর্মসাধনায় চলেছিল এক বিপ্লবের স্রোত। বৈদিক রাজনীতি ও ক্রিয়াকলাপে দেশ আচ্ছাদিত। আবার যজ্ঞানুষ্ঠানের নামে ভারতভূমি পশু রক্তে প্লাবিত। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, ঠিক তখনই আবার চলে ব্রাহ্মণের প্রচার। সুষ্ঠু বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমেই হবে ধনাগম, আসবে অটুট স্বাস্থ্য, লাভ হবে একদিকে বিশুদ্ধ বস্তু অন্যদিকে ইহলোকে ও পরলোকে অপার সুখ ও শান্তি। যজ্ঞই মানবের একমাত্র কল্যাণের পথ, তাই ছিল তাঁদের মূল প্রচার। মানে এ হ'ল—

'কর্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে'।

কিন্তু বৈদিক এই ক্রিয়াকাণ্ড—যার উপর দেওয়া হত এত প্রাধান্য—তা মানুষের মনে কখনও প্রকৃত সুখ ও শান্তি দিতে পারেনি। এতে মানুষ হয়ত বা ক্ষণিকের সুখ পেতো কিন্তু বুঝতে পারতো না যে যজ্ঞানুষ্ঠান মানবের চিরস্থায়ী কল্যাণ আনতে পারে না—বুঝতো না যে দুঃখ দুর্দশার নিষ্করুণ হাত হতে এড়ানোর স্থায়ী উপায় এতে নাই। এইভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব সমাজ জীবনে শিথিল হতে থাকে। মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে মানব-জীবনের চরম সত্যে উপনীত হওয়া ও পরম পথ লাভ করা, আরাম হতে ছিন্ন হয়ে সেই গভীরে ডুব দেওয়া যেখানে অশান্তির অন্তরেও থাকবে সুমহান শান্তি। তাই সত্যসন্ধী চিন্তানায়কগণ এ মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ও বীতরাগ জানিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন পরমপুরুষার্থ লাভের সাধনপথে। তাঁদের এই গভীর জীবন-প্রেরণায় উদ্ভব হ'লো এক নতুন জীবন-প্রণালীর। এ জীবন ত্যাগের জীবন—ক্ষুদ্র তুচ্ছ ভোগবিলাসের জীবন নয়। এইভাবে উৎপত্তি হ'ল চারিটি আশ্রমের যেখানে প্রবেশ লাভের জন্যে কবির কথায় আজও আমরা বলি,—

'মুক্ত দৃপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব'।

এই চারিটি আশ্রম বলতে বোঝায় জীবনেরই চারিটি অবস্থা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রথম অবস্থায় প্রত্যেককে উপনয়ন গ্রহণ করে গুরুগৃহে পবিত্রভাবে শাস্ত্রাধ্যয়নে ছাত্রজীবন যাপন করতে হতো। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ জীবনে প্রবেশ করে বিবাহ প্রভৃতির দ্বারা সংসারধর্ম পালন করতেন এবং প্রৌঢ় বয়সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে সংসার মুক্ত হয়ে

অরণ্যে কুটীর বেঁধে ধর্মচিন্তায় কাল যাপন করতেন। অবশেষে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে সাংসারিক সকল মায়াবন্ধন ছিন্ন করে লোকালয়ের বাইরে পরমার্থ চিন্তায় জীবন কাটানোই ছিল শেষ লক্ষ্য। তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমে—বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসে—ধ্যান, সমাধি, সম্যক্‌জ্ঞান ও চরমশান্তি লাভের বিশেষ উপযোগী। তাই মানুষের চিন্তাধারা ও মননশক্তি ক্রমশঃ এ সব কর্মকাণ্ডেব অন্ধবিশ্বাস হতে মুক্তিলাভ কবে হ'ল যুক্তি ও বিচারমুখী। তারা বুঝতে পাবল জ্ঞানই চিবস্থায়ী কল্যাণলাভের প্রশস্ত উপায়—

'যেথা তুচ্ছ আচাবেব মরুবালুবাশি।
বিচাবের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসী।'

বৈদিক কর্মকাণ্ড নয়। উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধাবা হ'তে জানা যায়—মোক্ষ বা মুক্তি ও অপার শান্তি লাভের জন্য মানুষের কি দুর্বাব আকুতি। অধিকাংশ গ্রন্থেই ব্রহ্ম, আত্মা, জন্মবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মেব ভেদ নেই—এই হচ্ছে সাব কথা। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি জ্ঞানের দ্বাবাই সম্ভব—এই-ই জীবেব চরম লক্ষ্য। তাই সমাজেব উচ্চস্তবেব লোকের মনে ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞেব বিরুদ্ধে দেখা দিল এক চেতনাব বিপ্লব। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পডল সাডা, সম্যক্ জ্ঞানার্জনেব অনুশীলনে ফিরল চিন্তাধারা। কিন্তু জনসাধাবণ তখনও যেই তিমিবে সেই তিমিবেই। কুসংস্কাব, অন্ধ-বিশ্বাস ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হতে তখন মুক্তি পায়নি তারা—আত্মার স্বরূপ ও অবস্থান সম্বন্ধে তখনও তাদের নানারূপ অন্ধ ধারণা। তারা বিশ্বাস করত আত্মা মানুষ, জন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতির দেহে বাস কবে। আব তখনকার গাছ, সাপ, বৃক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতির পূজার রীতি দেখে তাদের মনে দৃঢ বিশ্বাস হয়েছিল সর্বপ্রাণবাদে (animism)।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মনীষিগণ ও অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা: বৌদ্ধশাস্ত্রে সেই সময়কার ছ'জন শাস্তাব ও তাঁদেব মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা একদিকে যেমন তীর্থংকর বলে পবিচিত ছিলেন অন্যদিকে জনসমাজে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তিরও অধিকারী ছিলেন। এরা অনেকেই গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক। তাই আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এই সব আচার্যদের মতবাদের সাথে কিছুটা পরিচয় থাকা দরকার। এখানে ঐ ছ'জন ধর্মোপদেষ্টার নাম ও তাঁদের মতবাদের একটু আলোচনা করা হচ্ছে:—

পটভূমি

(১) **পূর্ণ কাশ্যপ**—ইনি মগধরাজ বিম্বিসারের সমসাময়িক একজন বয়স্ক বিচক্ষণ আচার্য। তাঁর অনেক শিষ্যও ছিল। কথিত আছে, তিনি গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ষোল বছরের সময় জলে ডুবে মারা যান। অক্রিয়বাদ—এই মত তিনি পোষণ করতেন। দান, যজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্মে যেমন পুণ্য হয় না, প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা বলা প্রভৃতি অসৎকর্মেও তেমনই মানুষের পাপ হয় না। কারণ দেহই কাজ করে—আত্মা অক্রিয়। মানুষ ভাল মন্দ যে কাজই করুক না কেন আত্মা এ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না—দেহই ভোগ করে কর্মের ফল। প্রসিদ্ধ জৈনভাষ্যকার শীলঙ্কাব এ মতবাদকে অকারকবাদ আখ্যা দিয়েছেন। সাঙ্খ্যমতের সাথে এর বেশ সাদৃশ্য আছে বলে জানা যায়। কিন্তু আত্মা ও দেহের ভেদ ও অভেদ বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে না।

(২) **মস্করী গোশালীপুত্র**—বুদ্ধের সমসাময়িক একজন প্রখ্যাত আচার্য। জৈন ভাগবতীসূত্র হতে জানা যায় যে, তিনি প্রথমে তীর্থংকর মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু পরে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি তাঁর শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন এবং নিজেই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই 'আজীবিক' সম্প্রদায় বলে পরিচিত। তিনি মহাবীরের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। গোশালের মতে সকল জীবই পুনর্বার জীবন গ্রহণ করতে সক্ষম। নিয়তিসঙ্গতিভাব—এই মত তিনি পোষণ করতেন। নিয়তি জীবকে পরিচালনা করে—জীবের কোন বল নাই--নাই সামর্থ। জীবের সুখ ও দুঃখের অন্য কোন কারণ থাকতে পারে তা তিনি বিশ্বাসই করতেন না। কাজেই কর্মফলে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না—সংসারশুদ্ধি এই মত তিনি প্রচার করতেন। মোক্ষলাভের জন্য জীবের বহু জন্ম বহন করতে হয়--সত্তারই বিভিন্ন স্তর আছে এবং প্রত্যেক সত্তাই অনন্ত। রাজা অশোকের পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায় রাজকীয় অনুগ্রহ ও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে।

(৩) **অজিত কেশকম্বল**—বুদ্ধের সমসাময়িক হিসাবে ইনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁর মতবাদ ছিল জড়বাদ—তিনি না ছিলেন কর্মফলে বিশ্বাসী, না ছিলেন সৎ বা অসৎকর্মে বিশ্বাসী। তাঁর মতে মৃত্যুর পর জীবনের আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। জীব পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র—সে গুলো ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। মৃত্যুর পর স্কন্ধগুলো অনুরূপ স্কন্ধে লীন হয় আর জ্ঞানেন্দ্রিয় মিশে

যায় ব্যোমে। লোকাযত বা চার্বাক মতবাদেব সাথে এব বেশ সাদৃশ্য আছে—এটিই বৌদ্ধধর্মে উচ্ছেদবাদ বলে পবিচিত।

(৯) **ককুদ কাত্যায়ন**—ইনিও বুদ্ধেব সমসাময়িক একজন আচার্য। এঁব মতে জীব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃখ এবং জীব—এই সাতটি ভূতেব সমষ্টি মাত্র। ভূতগুলি শাশ্বত ও অব্যয। এগুলো একদিকে অজাত অন্যদিকে নতুন কিছু সৃষ্টিতেও অপাবগ—শুধু পর্বত চূডাব ন্যায দৃঢ। কাত্যাযনেব মতে ঘাতক, শ্রোতা ও উপদেষ্টা কিছুই নেই। জীবহত্যা অর্থ জীবেব ভূতসমষ্টি পৃথক কবা মাত্র। বৌদ্ধধর্মে এই মতবাদ শাশ্বতবাদ বলে অভিহিত।

(৫) **সংজয়ী বৈরট্টীপুত্র**—ইনিও বুদ্ধদেবেব একজন জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক। এক স্বতন্ত্র মতবাদেব প্রবর্তক এবং সমাজেব একজন শীর্ষস্থানীয ব্যক্তি। তাঁব মতবাদ ছিল অজ্ঞানবাদ। কোন কিছু প্রশ্নেব সোজাসুজি উত্তব না দিযে দ্ব্যর্থক বাক্য প্রযোগ কবাই ছিল তাব বৈশিষ্ট্য। উত্তব এডানোব অভ্যাস যেমন তাব ছিল, তেমনি ছিল তাঁব অধিবিদ্যা (metaphysics) পবিহাব কবাব অভ্যাসও। বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায বুদ্ধদেব স্বযং এইরূপ আলোচনা মানবজাতিব কল্যাণকব নয বলে পবিহাব কবতেন এবং শিষ্যদেব এ ধবনেব প্রশ্ন উত্থাপনেও নীবব থাকতেন। অমবাবিক্ষেপিক মতবাদ ও সঞ্জযেব মতবাদেব সাথে এব বেশ সাদৃশ্য পবিলক্ষিত হয। কথিত আছে, বুদ্ধেব প্রধান শিষ্যদ্বয়—শাবিপুত্র ও মোদগল্যাযন প্রথমে সঞ্জযেব শিষ্য ছিলেন এবং পবে অশ্বজিতেব উপদেশে মুগ্ধ হযে বুদ্ধেব নিকট ভিক্ষুত্ব গ্রহণ কবেন। এতে সাডা পডে যায সঞ্জযেব আশ্রমে এবং আবো আডাই'শ পডুযা শিষ্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হযে ওঠে। কিন্তু অচিবেই বক্তবমি কবে সঞ্জয মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(৬) **নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র**—ইনিও বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক অন্যতম আচাযদেব মধ্যেই একজন। ইনিই হচ্ছেন স্বনামধন্য মহাবীব।৮ কথিত আছে, ইনি প্রথমে ভগবান পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। এই পার্শ্বনাথেব নির্বাণ লাভ হয মহাবীবেব নির্বাণ লাভেবও দু'শো পঞ্চাশ বছর আগে। তাই তাঁব উপদেশাবলীব দ্বাবা যে তিনি প্রভাবান্বিত তা সহজেই অনুমেয। জ্ঞাতিপুত্রের মতবাদেব সাথে পার্শ্বনাথেব মতবাদেব বেশ সাদৃশ্যও আছে। অবশ্য পার্শ্বনাথ ও তাঁর শিষ্যগণ যেখানে নগ্নাবস্থায় থাকতেন ইনি সেখানে থাকতেন সাদা বস্ত্র পরিহিত হয়ে। ইনি ক্রিযাবাদের প্রবল প্রচাবক হিসাবে কর্মেব ফলাফলের উপব বেশি

জোর দিতেন। কেহই পাপকর্মের ফল হতে কাকেও রক্ষা করতে পারেনা— প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুখ দুঃখের নির্মাতা ও ভোক্তা। আত্মা, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক প্রভৃতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানতেন জ্ঞান ও সদাচারের মাধ্যমেই হয় মোক্ষলাভ আর সৎ ও অসৎ কর্মের দরুন হয় আত্মার জন্মান্তর।

পালি দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্ত হতে জানা যায় নিগ্রন্থেরা চতুর্যাম সংবর পালন করেন। অহিংসবাদের উপরই আবার এরা জোর দেন বেশি। স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ জৈনদর্শনে বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই মতবাদ অনুসারে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নানা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অবলোকন করা ব্যতীত জানা যায় না। কৃচ্ছ্রসাধনের উপর জোর বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মেই বেশি।

সেকালে এই ছ'জন ধর্মোপদেষ্টা ছাড়াও বহুসংখ্যক খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ আচার্য ও পরিব্রাজকের বিষয় জানা যায়। ব্রাহ্মণ আচার্যেরা বৈদিক ঐতিহ্য রক্ষা করতেন। তাঁরা বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞের পৌরোহিত্য করে যেমন জীবন যাপন করতেন তেমনি পেতেন রাজানুগ্রহ এবং সমাজের সহানুভূতি ও ভালবাসা। দীঘনিকায়ের কূটদন্তসুত্ত হতে জানা যায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই আহূত হতেন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য। পরিব্রাজকেরা ছিলেন বিচরণকারী শিক্ষক। তাঁরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে বাস না করে বছরের বেশির ভাগ সময়ই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্থানের ধর্মোপদেষ্টাদের সহিত নীতিবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা এবং আলোচনার সুবিধার জন্য নগর বা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্থানে বাসস্থান ছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জনও পরিব্রাজক জীবনযাপন করতে পারতেন, এমনকি নারীদের পরিব্রাজিকা হওয়াও আশ্চর্যের ছিল না। প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের উপর এই পরিব্রাজকদের প্রভাব যথেষ্টই লক্ষ্য করা যায়।

পালি দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রচলিত কিছু দার্শনিক মতবাদ ও যুক্তিতর্কের মোটামুটি আলোচনা মেলে। সেগুলো বৌদ্ধশাস্ত্রে দ্বাষষ্টি দৃষ্টি বা মতবাদ (দ্বাসট্ঠিয়ো দিট্ঠিয়ো) নামে খ্যাত। এগুলোর মধ্যে কিছু পূর্বান্তকল্পিক (পূর্বজন্মবিষয়ক) ও কিছু অপরান্তকল্পিক (মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধীয়)। এগুলোকে প্রধান আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :—

(ক) চারি প্রকার শাশ্বতবাদ,

(খ) চারি প্রকার কিছুটা শাশ্বত ও কিছুটা অশাশ্বতবাদ,

(গ) চারি প্রকার অন্তানন্তিকবাদ,

(ঘ) চারি প্রকার অমরাবিক্ষেপবাদ,

(ঙ) দুই প্রকার অধীত্যসমুৎপর্ণিকবাদ,

(চ) বত্রিশ প্রকার ঊর্ধ্বমাঘাতনিকবাদ—

ষোল রকম সংজ্ঞবাদ,

আট রকম অসংজ্ঞবাদ,

আট রকম নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাবাদ

(ছ) সাত প্রকার উচ্ছেদবাদ এবং

(জ) পাঁচ প্রকার দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ।

এই দ্বাষষ্টি প্রকার মতবাদের মধ্যে প্রথম আঠারটি পূর্বান্তকল্পিক ও শেষ চুয়াল্লিশটি অপরান্তকল্পিক।

(ক) শাশ্বতবাদ—এ মতবাদে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে স্বীকার করা হয়। এমতে আত্মা ও জগত অপরিণামী পর্বতশৃঙ্গের মত অনড এবং নগর-স্তম্ভের মত স্থির। শুধু প্রাণীরা এক জন্ম হতে আর এক জন্ম নিয়ে জন্মান্তরে ঘুরছে। এতে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। জগতও অপরিবর্তিত অবস্থান থাকে। কারণ কোন সাধক সমাধি অবস্থায় তাঁর লক্ষ লক্ষ জন্মের নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, চ্যুতি ও উৎপত্তির কথা জেনে প্রচার করেন যে, আত্মা ও জগত অপরিবর্তিত ও শাশ্বত। ইহাই প্রথম প্রকারের শাশ্বতবাদ। দ্বিতীয় প্রকারের শাশ্বতবাদে দশসংবর্তকালের পূর্বজন্মের আকার প্রকারের কথা মনে করতে পারেন। তৃতীয় প্রকারের শাশ্বতবাদে সাধক চত্বারিংশ সংবর্ত-বিবর্তকালের পূর্বজন্মের আকার প্রকারের কথা জানতে পারেন। চতুর্থ প্রকারের শাশ্বতবাদ যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(খ) কিছুটা শাশ্বত কিছুটা অশাশ্বতবাদ—এ মতবাদে আত্মা ও জগৎকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে প্রচার করা হয়।

প্রথম প্রকারের আংশিক শাশ্বত ও আংশিক অশাশ্বত মতবাদে কোন এক সময়ে জগত ধ্বংস হলে অনেক প্রাণী আভাস্বর ব্রহ্মলোকে মনোময় দেহ ধারণ করে স্বয়ংপ্রভ হয়ে অবস্থান করে। আয়ু শেষ হলে তাদের কোন একজন সেখান হতে চ্যুত হয়ে শূন্য ব্রহ্মবিমানে জন্ম নেয়। সেখানে অনেকদিন একাকী থাকরা ফলে মনে সঙ্গী লাভের ইচ্ছা হয়। অনতিবিলম্বে আভাস্বর জগতের

অন্যান্য প্রাণীরা ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হওয়াতে প্রথমোৎপন্ন প্রাণীর ধারণা হলো—তার ইচ্ছাতেই এ সব জীবের উৎপত্তি এবং শেষোৎপন্ন প্রাণীরাও প্রথমোৎপন্ন প্রাণীকে প্রথম দেখতে পেয়ে তাদেরও ধারণা হলো—তারা প্রথমোৎপন্ন প্রাণী কর্তৃক সৃষ্ট। প্রথমোৎপন্ন প্রাণী দীর্ঘায়ু, সুন্দর ও শক্তিশালী। শেষোৎপন্ন প্রাণীরা অল্পায়ু, অল্পসুন্দর ও হীন শক্তিসম্পন্ন। শেষোৎপন্ন প্রাণীদের কেউ ইহজগতে জন্ম নিয়ে সাধনার দ্বারা আভাস্বর জগতের পূর্বনিবাস পর্যন্ত জানতে পারে। এর পূর্বে আর জানতে না পেরে মনে করে—প্রথমোৎপন্ন প্রাণীই ব্রহ্মা, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, স্রষ্টা। তাই তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অপরিণামধর্মী। আর তারা ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট বলে অনিত্য, অধ্রুব ও পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয় প্রকারের আংশিক শাশ্বত ও আংশিক অশাশ্বত মতবাদের মতে ক্রীড়াপ্রদোষিক দেবতারা অনেকদিন হাস্যক্রীড়া করতে করতে তাদের মনে আসক্তি এলে তাদের চ্যুতি ঘটে। যে সকল দেবতাদের হাস্য-ক্রীড়ায় আসক্তি আসে না, তাদের চ্যুতি হয় না। তারা নিত্য, ধ্রুব ও শাশ্বত। যারা চ্যুত হয়, তারা অনিত্য, অধ্রুব ও পরিবর্তনশীল। তৃতীয় প্রকারের আংশিক শাশ্বত ও আংশিক অশাশ্বত মতবাদের মতে মনপ্রদোষিক দেবতারা পরস্পরের প্রতি অসূয়াভাব পোষণ না করে অবস্থান করে। যারা পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয় না তারা নিত্য, ধ্রুব ও শাশ্বত এবং যারা পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হওয়ার ফলে ইহজগতে জন্ম নেয়, তারা অনিত্য, অধ্রুব ও পরিবর্তনশীল। চতুর্থ প্রকারের আংশিক শাশ্বত ও আংশিক অশাশ্বত মতবাদ যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতে চোখ, কান, নাক জিভ ও শরীর অনিত্য অশাশ্বত ও পরিণামধর্মী। কিন্তু আত্মা, চিত্ত, বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব ও শাশ্বত।

(গ) অন্তানন্তিকবাদ—এ মতবাদে জগতকে একাধারে সান্ত ও একাধারে অনন্ত বলা হয়েছে। যিনি সমাধিতে অন্তসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন তিনি জগতকে সান্ত বলে প্রচার করেন। ইহাই প্রথম প্রকারের অন্তানন্তিকবাদ। যিনি অনন্তসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন তাঁর কাছে জগৎ অনন্ত। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তানন্তিকবাদ। কোন কোন সাধক সমাধিতে উপনীত হয়ে জগতের উর্ধ্ব ও অধোভাগ অন্ত ও তির্যক্ ভাবেন—ইহা অনন্ত বলে প্রচার করেন। ইহাই তৃতীয় প্রকারের অন্তানন্তিকবাদ। চতুর্থ প্রকারের অন্তানন্তিকবাদ হল জগত সান্তও নহে অনন্তও নহে।

(ঘ) অমরাবিক্ষেপবাদ—কোন প্রশ্ন করা হলে দ্ব্যর্থ বাক্যের দ্বারা এ মতবাদীরা প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়। তারা কোন প্রশ্নকে স্বীকার ও অস্বীকার কোনটা করে না। তারা এক রকমের পিছল মাছের মত যুক্তিতর্কের বন্ধন হতে বেরিয়ে যায়। এ মতবাদের প্রচারক হলেন সংজয়ী বৈরট্রীপুত্র। দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্তে তাঁর মতবাদের কিছু আলোচনা মেলে। কোন প্রশ্ন তোলা হলে অমরাবিক্ষেপবাদীরা এরূপ দ্ব্যর্থ বাক্যের আশ্রয় নেয়—ইহা আমার নয়। ঐ মতও আমার নয়। অন্য কোন ভিন্ন মতও আমার নেই। ইহা ও নয় তাও নয়—আমি বলছি না। ইহাও নয় উহাও নয়—এরূপও আমি বলছি না। এ মতবাদ চার প্রকারে দেখানো হয়েছে।

(ঙ) অধীত্যসমুৎপর্ণিকবাদ—এ মতবাদে আত্মা ও জগতকে অকারণসম্ভূত বলে প্রচার করা হয়। অসংজ্ঞ-সত্ত্বদের সংজ্ঞা হলে ঐ দেহের চ্যুতি হয় এবং তারা ইহজগতে জন্ম নেয়। সমাধি অবস্থায় তাদের সংজ্ঞার উৎপত্তির কথা স্মরণ করে এরা বলে—আত্মা ও জগত বিনা কারণে উৎপন্ন হয়। কারণ সে পূর্বে ছিল না। হঠাৎ সে সত্ত্বতে পরিণত হয়েছে। এ মতবাদও চার প্রকারে দেখানো হয়েছে।

(চ) উর্দ্ধমাঘাতনিকবাদ—

সংজ্ঞবাদ—মৃত্যুর পর আত্মার চেতনায় বিশ্বাস। ইহা ষোল প্রকারে দেখানো হয়েছে।

অসংজ্ঞবাদ—মৃত্যুর পর আত্মার অচেতনায় বিশ্বাস। ইহা আট প্রকারের দেখানো হয়েছে।

নৈবসংজ্ঞানাসজ্ঞাবাদ—মৃত্যুর পর আত্মার চেতনা অচেতনা কিছুই থাকে না এরূপ বিশ্বাস। ইহা আট প্রকারে দেখানো হয়েছে।

(ছ) উচ্ছেদবাদ—এ মতবাদ হচ্ছে মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশে বিশ্বাস। এর প্রচারক অজিত কেশকম্বল। তাঁর মতে মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ—এ পঞ্চ বস্তুর সমন্বয়ে সত্ত্ব গঠিত। মৃত্যুর পর মাটি, জল, বায়ু ও অগ্নি চতুর্মহাভূতের সঙ্গে মিশে যায় আর ইন্দ্রিয় মিশে যায় বায়ুতে। উচ্ছেদবাদে আত্মা রূপী, চাতুর্মহাভৌতিকও মাতাপিতা সম্ভূত। মৃত্যুর পর ইহার বিনাশ হয়। এর কোন অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই প্রথম প্রকারের উচ্ছেদবাদে। দ্বিতীয় প্রকারের উচ্ছেদবাদ দিব্য, রূপী, কামাবচার ও কবলিকার (শরীরের পুষ্টি সাধক) আত্মার

মরণের পর বিনাশ হয়। তৃতীয় প্রকারের উচ্ছেদবাদে দিব্য, রূপী, মনোময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত, অহীনেন্দ্রিয় আত্মা মৃত্যুর পর সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। চতুর্থ প্রকারের উচ্ছেদবাদে আকাশানঞ্চায়তন স্তরের আত্মার মৃত্যুর পর বিনাশ হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রকারের উচ্ছেদবাদে যথাক্রমে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-স্তরে আত্মা, অকিঞ্চন-আয়তন স্তরের আত্মা ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা স্তরের আত্মা মৃত্যুর পর বিনষ্ট হয়।

(জ) দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ—এ মতবাদে ইহজগতেই জীব নির্বাণ লাভ করে—এরূপ প্রচার করে। প্রথম প্রকারের দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ হল—আত্মা ইহজগতে পঞ্চমকামগুণ সমন্বিত হয়ে নির্বাণ লাভ করে। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ —আত্মা কাম, অকুশল ধর্ম হতে বিরত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি সুখ অনুভব করে প্রথম ধ্যানে উন্নীত হয়ে ইহজগতে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে। তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদে আত্মা বিতর্ক বিচার উপশম করে অধ্যাত্ম জগতে চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখ অনুভব করে দ্বিতীয় ধ্যানে উন্নীত হয়ে ইহজগতে নির্বাণ লাভ করে। চতুর্থ প্রকারের দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদে আত্মা প্রীতিতে বিরাগ হয়ে উপেক্ষার সহিত স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়ে সুখ অনুভব করে তৃতীয় ধ্যানে বিরাজ করে ইহজগতে নির্বাণ লাভ করে। পঞ্চম প্রকারে দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদে আত্মা সুখ দুঃখ ত্যাগ করে পূর্বের সৌমনস্য দৌর্মনস্য নিঃশেষ করে সুখ দুঃখহীন হয়ে উপেক্ষক ও স্মৃতিমান হয়ে চতুর্থ ধ্যানে বিচরণ করে ইহজগতে নির্বাণ লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধের জীবনী

খৃঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে ভারতের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যগণরাজ্যের লুম্বিনী উদ্যানে গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়। শাক্যকুলে জন্ম বলে তার এক নাম শাক্যসিংহ। জন্মসময়ে সকলের মনোরথ পূর্ণ হয় বলে তাঁর অন্য নাম সিদ্ধার্থ। আবার গৌতম বংশে জন্ম বলে তাঁর আর এক নাম গৌতম। আর বুদ্ধ আখ্যা পান বোধি বা সম্যক জ্ঞানলাভের পর। গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যবংশের অধিনায়ক ছিলেন। তার রাজধানী ছিল কপিলাবস্তু। শাক্যরা ছিলেন ইক্ষাকুবংশীয়। ইক্ষাকুরা সূর্যবংশ হতে উদ্ভূত বলে তাঁরা সূর্যবংশীয় নামেও খ্যাত। বুদ্ধকে এ কারণে আবার আদিত্যবন্ধু (আদিচ্চবন্ধু) নামেও অভিহিত করা হয়। গৌতমের মায়ের নাম মায়াদেবী। মায়াদেবী দেবদহ নগরের সুপ্রবুদ্ধের প্রথমা কন্যা।

গৌতমের জন্মের আগে তাঁর মাতা মায়াদেবী গভীর রাতে স্বপ্ন দেখেন, দেবদূতেরা মনোরম পালঙ্ক করে তাঁকে নিয়ে গেলেন অনবতপ্ত হ্রদের তীরে, এবং অনতিকাল পরে একটা সাদা হাতী সেখানেই তাঁর ডান কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়ে দিল এক শ্বেত পদ্ম। রাজা শুদ্ধোদনকে একথা জানালে তিনি মহা মহা গণৎকারদের ডাকালেন রাণীর স্বপ্ন ব্যাখ্যার জন্য। এ স্বপ্ন বিচার করে তারা রাজাকে জানালেন যে, রাণীর গর্ভের ভাবী শিশু হবেন এক মহাপুরুষ। তিনি সংসারী হলে রাজ-চক্রবর্তী হবেন, আর সংসার ত্যাগ করলে হবেন সম্যকসম্বুদ্ধ। এরূপে বোধিসত্ত্ব তুষিতপুর হতে চ্যুত হয়ে জন্ম নিলেন শুদ্ধোদন মহিষী মায়াদেবীর গর্ভে।

যথাসময়ে আসন্নপ্রসবা মায়াদেবী যেতে চাইলেন পিত্রালয়ে দেবদহনগরে। সেখানে যাওয়ার যথাযথ ব্যবস্থাও হলো অনতিবিলম্বে। মায়াদেবী রওনা হলেন অনেক পরিচারিকা নিয়ে আপন পিত্রালয়ের উদ্দেশে। যাওয়ার পথে কপিলাবস্তু নগরের লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম হল বোধিসত্ত্বের। কথিত আছে, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সাতটি পদক্ষেপে চলেছিলেন নবজাত বোধিসত্ত্ব এবং প্রতিটি পদক্ষেপেই ফুটে ওঠে এক একটি পদ্ম। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং ব্রহ্মা ও ইন্দ্র। নবজাতককে

দেখাবার জন্য সেখানে জড় হল দলে দলে লোক। যথাসময়ে মায়াদেবী ও নবজাতককে শোভাযাত্রা করে মহাসমারোহে আনা হল কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদ ভরে গেল আনন্দে। আনন্দ উল্লাসের হিল্লোলে মুখরিত হল সমস্ত কপিলাবস্তু নগর। সেদিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

বোধিসত্ত্বের জন্মসংবাদ পেয়ে হিমালয় হতে ঋষি অসিত তাঁকে দেখবার জন্য এলেন শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে। আনন্দিত হলেন শুদ্ধোদন ও তাঁর মহিষী ঋষিকে দেখে। উভয়ে আনন্দে নবজাতককে তুলে দিলেন ঋষির কোলে। নিজের কোলে শিশুকে দেখে ঋষি প্রথম কাঁদেন এবং পরে হাসেন। ঋষির এ অবস্থা দেখে সন্তানেব অমঙ্গল ভেবে রাজা ও মহারাণী হয়ে ওঠেন ভীত ও ত্রস্ত। পবে ঋষিকে এব কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, ঐ শিশু যখন বুদ্ধ হবেন তখন ঋষি ইহজগতে থাকবেন না। তাই তিনি কাঁদলেন। আর এই ভাবী বুদ্ধকে অন্ততঃ একবাব মাত্র দেখাব সুযোগ হয়েছে বলে হন অতি আনন্দিত। তাই তিনি হাসলেন।

সিদ্ধার্থের জন্মেব সাতদিন পবে মারা যান মায়াদেবী। তাঁর পালনের ভার পড়ল মাসী তথা বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীব ওপর। গৌতমীর স্নেহে ও যত্নে বর্ধিত হন গৌতম।

ছেলেবেলা হতে কুমার ছিলেন ভাবুক। একদিন রাজা শুদ্ধোদন হলকর্ষণ উৎসবে যোগ দেবার জন্য মাঠে গেলেন কুমাবকে নিয়ে। লাঙল দেওয়া মাটি হতে অসংখ্য পাখীকে কীটপতঙ্গাদি খেতে দেখে কুমারের মন হল খারাপ। ভোগ ঐশ্বর্যেব মধ্যেও রাজার কুমাব নির্জন বাসই পছন্দ করতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ডুবে গেলেন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে। তাঁর মনোবৃত্তি ছিল অতি কোমল। সাধারণ প্রাণীর প্রতিও ছিল তাঁর মমতা ও ভালবাসা। একদিন কুমারের বয়স্য মামাতো ভাই দেবদত্ত তীব ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিল একটি হংস। আহত হংসটিকে শুশ্রূষা করে জীবন দিল কুমার। হংসটি কার এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ। বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য তাঁবা পুরোহিতের কাছে গেলে সিদ্ধার্থেরই দাবি অগ্রগণ্য হল।

কুমারের মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল অতি প্রখর। রাজা শুদ্ধোধন কুমারের শিক্ষার জন্য শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন খ্যাতনামা পণ্ডিত বিশ্বমিত্রকে। অল্প সময়ের মধ্যেই কুমার পারদর্শী হয়ে ওঠেন তখনকার ক্ষত্রিয়সন্তানদের অবশ্য শিক্ষণীয়

সমস্ত বিদ্যা, শিল্প ও বিজ্ঞানে। আর ঘোড়ায় চড়া, রথ চালনা, ধনুর্বিদ্যাতেও হয়ে ওঠেন অদ্বিতীয়।

কিন্তু সংসারের প্রতি একেবারে অনাসক্ত ছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। ছেলের বৈরাগ্যভাব দেখে রাজা হয়ে ওঠেন উদ্বিগ্ন। ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি তিনি প্রকাশ করেন গভীর আশঙ্কা। তাই প্রাণাধিক একমাত্র পুত্র যাতে সংসার ত্যাগ না করে, তারই সুব্যবস্থা করেন রাজা। তিনি কুমারের জন্য তৈরী করে দিলেন তিনটি ঋতুপোযোগী প্রাসাদ, একটি গ্রীষ্মকালের জন্য, একটি বর্ষাকালের জন্য ও একটি শীতকালের জন্য। প্রতিটি প্রাসাদে ছিল উদ্যান ও পুষ্করিণী। সর্বদাই নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণা সুন্দরী ললনাগণ পরিবৃত হয়ে কাটত কুমারের জীবন।

এতেও কুমারের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হল না। চিন্তিত হয়ে পড়েন রাজা শুদ্ধোদন। পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য রাজা প্রতিবেশী কোলিয় গণতন্ত্রের রাজা দণ্ডপাণির পরমাসুন্দরী কন্যা যশোধরার (ভদ্দকচ্চায়না) সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কুমার কিছুদিন সংসারে আবদ্ধ থাকেন। যথাসময়ে যশোধরা গর্ভবতী হয়ে ওঠেন। তখন রাজার মনে জেগে ওঠে এক নতুন আশার আলো। রাজধানীতেও পড়ে যায় আনন্দ উচ্ছ্বাসের ঢেউ। শাস্ত্রজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু খণ্ডন করার নয়। কুমার বেরুলেন উদ্যান ভ্রমণে সঙ্গে ছিল তাঁর অনুচর ছন্দক। প্রথম দিন ভ্রমণে বেরিয়ে কুমার দেখেন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। সারথির মুখে জরাগ্রস্তের কথা শুনে মানবজীবনের জীর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উৎকণ্ঠিত মনে কুমার ফিরে এলেন প্রাসাদে। রাজা শুদ্ধোধন কুমারের শীঘ্র ফিরে আসার কারণ জেনে কুমারের মনে যাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য না আসে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অর্ধযোজন পরিমিত স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করেন যাতে পথে কোন জরাগ্রস্ত লোক দেখা না যায়। পুনরায় একদিন কুমার উদ্যান ভ্রমণে বেরিয়ে দেখেন একজন ব্যাধিগ্রস্ত লোক। পরে আর একদিন তিনি উদ্যান ভ্রমণে বেরিয়ে একটি মৃতদেহও দেখেন। আবার অন্যদিন উদ্যান ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি দেখেন একজন সৌম্য সন্ন্যাসী। প্রথম তিনটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে কুমারের ভাব বদলে গেল। পরে সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর মনে জাগল প্রবল বৈরাগ্য। এদিকে এক শুভক্ষণে কুমারের জন্মাল এক পুত্র সন্তান। কুমার যখন উদ্যানে চিন্তায় নিমগ্ন তখন পিতৃ-প্রেরিত দূতের মুখে পুত্রের জন্মসংবাদ শুনে স্বীয় উদীয়মান বিবেকরূপ

চন্দ্রকে গ্রাসের নিমিত্ত রাহু ভেবে কুমার বলেন, 'রাহুলের জন্ম হল—বন্ধনের জন্ম হল'।[১] দূতের মুখে কুমারের এ কথা জেনে তাঁর পিতা শিশুর নাম রাখেন—রাহুল। উদ্যান হতে প্রাসাদাভিমুখে ফেরার সময় কুমারের দূর সম্পর্কীয়া বোন কৃশাগৌতমী নামক একজন ক্ষত্রিয়কন্যা সৌভাগ্য ও কীর্তি সম্পদে পরিপূর্ণ কুমারকে দেখে ভাবাবেগে উচ্চারণ করেন—

'নিব্বুতা নূন সা মাতা,
নিব্বুতো নূন সো পিতা,
নিব্বুতা নূন সা নারী,
যস্‌সায়ং ঈদিশো পতি'।

—এইরূপ পুত্র লাভে মাতৃহৃদয় নিবৃত্ত বা নির্বাপিত হয়। এরূপ পুত্র লাভে পিতৃহৃদয় নির্বাপিত হয। এরূপ স্বামী লাভে নারীহৃদয়ও নির্বাপিত হয়।

ক্ষত্রিয়কন্যার এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস গাথা শুনে কুমার চিন্তা করলেন—নির্বাপিত হলে হৃদয়ও নিবৃত্ত হয়। 'নিব্বুত' শব্দ কুমারের মনে নির্বাণের ভাব এনে দিল। মহিলাটি তাঁকে অতি মূল্যবান উপদেশ শুনিয়েছে মনে করে, কুমাব নিজ কণ্ঠ হতে লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাহাব খুলে উপহাব দেন ক্ষত্রিয়কন্যা কৃশাগৌতমীকে।

প্রাসাদে ফিরে এলে নৃত্য-গীত-বাদ্যে সুনিপুণা অপ্সরাতুল্য ললনারা আপন আপন নৃত্য-কৌশলাদির দ্বাবা কুমারের মনে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কুমার কিছুতেই নৃত্যগীতে বমিত হলেন না। কুমার ঘুমিযে পডলেন। গভীর বাত্রে কুমার হঠাৎ জেগে উঠলেন। কক্ষে তখনও সুগন্ধ তৈল-প্রদীপ জ্বলছিল। সেখানে নিদ্রিতা নর্তকীদের বীভৎস চেহারা ও দৈহিক বিকৃত অঙ্গভঙ্গির অবস্থা দেখে কুমারের মনে স [illegible] বীতস্পৃহার ভাব আরও গভীর হল। সুবম্য প্রাসাদ কক্ষ শ্মশানতুল্য মনে হল তাঁর। অতঃপর অদ্য রাত্রেই তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করবেন, সিদ্ধান্ত করলেন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। ২৯ বছর বয়সে শোকার্ত মাতাপিতা, প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ও সদ্যোজাত শিশুর স্নেহজাল ছিন্ন করে কুমার অশ্ব কন্থকের পৃষ্ঠে আরোহণ করে গভীর রাতে প্রাসাদ হতে বেরিয়ে গেলেন তত্ত্ব-জ্ঞানের সন্ধানে। সঙ্গে ছিল এবারও অনুচর ছন্দক।

১। রাহুলো জাতো, বন্ধনো জাতো।

বুদ্ধের জীবনী

বৈশালীর পথে অনুপ্রিয় নামক গ্রামে কুমার বিদায় দেন অনুচর ছন্দককে। এবার পথ চলতে লাগলেন একাকী। চলতে চলতে পথে এক কাষায়বস্ত্রধারী কিবাতেব সঙ্গে দেখা হল কুমারের। আপনাব রাজবেশ তাকে দিয়ে কুমার নিলেন তাব বেশ। অনন্তব মস্তক মুণ্ডন কবে তিনি পবিধান করলেন কাষায় বস্ত্র। সত্যাশ্রয়ী গৌতম এখন হলেন ভিক্ষু।

ঘুবতে ঘুবতে তিনি এলেন রাজগৃহে। নগবের লোকেরা বিস্মিত হল নবীন সন্ন্যাসীব সৌম্য চেহারা দেখে। তাদেব মনে সন্ন্যাসীকে জানবার জন্য কৌতূহল জাগল। আশ্চর্যান্বিত হলেন মগধবাজ বিম্বিসাবও। উনি প্রকৃত সন্ন্যাসী না দেবতা তা জানবাব জন্য বাজা পাঠালেন অনুচবগণকে। সন্ন্যাসী ভিক্ষা নিযে খেতে বসেন পাণ্ডব পর্বতেব ছাযাতলে। বাজাকে এ কথা জানালে মগধবাজ বিম্বিসাব দেখা কবেন তাব সঙ্গে। তাঁব পবিচয জেনে বাজা তাঁকে ভোগবিলাসে বাস কবতে বলেন মগধে। তাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবেন সন্ন্যাসী। কাবণ ভোগ ও ঐশ্বর্যেব জন্য তিনি গৃহত্যাগ কবেন নি। তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ কবেছেন সম্যক্ জ্ঞান লাভেব জন্য। একথা জেনে বাজা তাঁকে অনুবোধ কবেন, বোধি-জ্ঞান লাভের পব তিনি যেন প্রথমে মগধবাজ্যে আসেন। সন্ন্যাসীও তাঁব অনুবোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঘুবতে ঘুবতে চলার পথে পৌছলেন ঋষি আলাড কালামেব আশ্রমে। তাঁব কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গৌতম শিখতে লাগলেন যোগবিধি। এটি বোধিলাভেব সহায়ক নয় জেনে তিনি ত্যাগ করেন কালামের আশ্রম।

এবার এলেন ঋষি রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রমে। সেখানেও তিনি শিখতে লাগলেন রুদ্রকের সাধনপ্রণালী। এতেও তুষ্ট হলেন না তিনি। এটিও তাঁর উদ্দেশ্যের অনুকূল নয় ভেবে তিনি ত্যাগ কবেন রুদ্রকেব আশ্রম।

এবার এসে পৌছলেন উরুবেলা গ্রামে। উরুবেলার বর্তমান নাম বুদ্ধগয়া। গয়া শহর হতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে। সেখানে দেখা হল বপ্র, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ মহানাম ও কৌণ্ডিন্য নামে পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তাঁরা পঞ্চবর্গীয় নামে খ্যাত। বোধিজ্ঞান লাভের জন্য গৌতম নিলেন কৃচ্ছ্রসাধন। ছ'বছর কঠোর সাধনায় তাঁর গৌরবর্ণ দেহ হয়ে গেল কৃষ্ণবর্ণ। কঙ্কালে পরিণত হল তাঁর দেহ। চক্ষু কোটরগত হল। কখনও কখনও অচৈতন্য হয়ে পডতেন গৌতম। অবশেষে এ কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর সম্বোধি লাভের অনুকূল নয় জেনে তিনি বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করেন এ সাধনা।

শরীর রক্ষার জন্য শুরু করলেন খেতে। গৌতমকে কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করে আহার গ্রহণ করতে দেখে তাঁর পূর্বসঙ্গী পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসীরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন অন্যত্র।

অতঃপর গৌতম এক অপূর্ব রমণীয় বনাঞ্চল ও নৈরঞ্জনা নদী (বর্তমান ফল্গু) দেখতে পেলেন। এটি ধ্যানের উপযুক্ত জায়গা মনে করে তিনি বাস করতে লাগলেন সেখানে।

কথিত আছে, সুজাতা নামে সোনানী গ্রামের এক শ্রেষ্ঠী কন্যা দেবতার নিকট মানসিক করেন যে, তাঁর যদি ধনী গৃহে বিয়ে হয় এবং প্রথমে পুত্রসন্তান হয়, তবে তিনি বৃক্ষদেবতাকে পূজা দেবেন। যথাকালে তাঁর দুই ইচ্ছাই পূর্ণ হল। তিনি পায়সান্ন রেঁধে বনদেবতাকে পূজা দেবেন মনে করে দাসীকে পাঠালেন গাছতলা পরিষ্কার করতে। দাসী সেখানে গৌতমকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখে তাঁকে দেবতা মনে করে সুজাতাকে এ কথা জানাল। সুজাতা তার কথায় বিশ্বাস করে পায়সান্ন নিয়ে গৌতমকে দেবতা ভেবে খেতে দিলেন। গৌতম আশীর্বাদ করলেন সুজাতাকে। ঊনপঞ্চাশ গ্রাসে তিনি তা খেলেন। আহার শেষ করে তিনি নৈরঞ্জনা নদী তীরে বটবৃক্ষের নীচে বসেন। অনতিবিলম্বে তিনি হলেন ধ্যানস্থ এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

—এখানে আমার শরীর শুকিয়ে যাক। আমার ত্বক, অস্থি ও মাংস এখানে বিলীন হোক। কিন্তু দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করে এ আসন হতে বিচলিত হব না।

তখন মার সিদ্ধার্থকে ধ্যানচ্যুত করবার জন্য সসৈন্য যাত্রা করল তার গিরিমেখলা হস্তীপৃষ্ঠে উঠে। বোধিসত্ত্বের শুভানুধ্যায়ী দেবতাগণ পালাল মারসৈন্য দেখে। বোধিমূলে একাকী বসে আছেন সিদ্ধার্থ। দশপারমিতায় সিদ্ধ সিদ্ধার্থ বিচলিত হলেন না একটুও। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎপ্রবাহ, অন্ধকার ও উত্তপ্ত ভস্ম সৃষ্টি করে মার ভয় দেখাল তাঁকে। কিন্তু সমস্তই বিফল হল। তখন মার সিদ্ধার্থের কাছে গিয়ে ত্যাগ করতে বলে এ আসন। জবাবে সিদ্ধার্থ বলেন, পারমিতা পূর্ণ করে এবং

পঞ্চ মহাদান করে তিনি লাভ করেছেন এ আসন। এই আসন তাঁরই প্রাপ্য, মারের নয়। মার রাগান্বিত হয়ে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করে, তাঁর দানের সাক্ষী কে? অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলেন, তাঁর দানের সচেতন সাক্ষী এখানে কেউ নেই। তাঁর বেশ্বান্তর জন্মের অসীম দানের সাক্ষী এ অচেতন বিশাল পৃথিবী। পৃথিবী তখন ঘোর গর্জন রবে সাড়া দিল। সেই মহাগর্জনে ভীত হয়ে পালাল সমস্ত মারসৈন্য। মার সসৈন্য পরাজিত হল। তখন তিনি লাভ করলেন বোধি বা পরম জ্ঞান। দেবতা, নাগ ও সুপর্ণগণ পূজা করল তাঁকে। বোধিজ্ঞান লাভ করে তিনি এ উদার বাণী উচ্চারণ করেন—

'অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্প্‌ুনং।
গহকাবক, দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্‌বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিতং,
বিসঙ্খরাগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা।'

—আমি দেহরূপ গৃহনির্মাতাকে খুঁজতে খুজতে বহু জন্মান্তর ধরে সংসারে ঘুরেছি কিন্তু দেখা পাইনি। বার বার সংসারে জন্ম নেওয়া দুঃখ। হে গৃহকারক, এবার তোমাকে দেখেছি। পুনবায় তুমি গৃহনির্মাণ করতে পারবে না। তোমার গৃহনির্মাণের উপকরণ বিনষ্ট হয়েছে। আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত) এবং তৃষ্ণার ক্ষয় হয়েছে।

এরূপে সিদ্ধার্থ ৩৫ বছর বয়সে বোধি বা সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করেন। পরিচিত হন তিনি বুদ্ধ নামে।

তারপর ধ্যানস্থ অবস্থায় আবার তাঁর মনে বিতর্ক জাগল যে, তাঁর দুরধিগম্য ধর্ম জনগণের মধ্যে প্রচার করবেন কিনা। কারণ তিনি ভাবলেন, রাগ দ্বেষযুক্ত মানুষ তাঁর ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। তখন বুদ্ধের এ মনোভাব জেনে ভগবান সহম্পতি ব্রহ্মা জগতের জনসাধারণের হিতার্থে ধর্ম প্রচারের জন্য অনুরোধ জানালেন বুদ্ধকে। ভগবান ধর্ম প্রচারে রাজী হলেন।

কার কাছে তাঁর নবলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রথম প্রচার করবেন—এরূপ ভেবে গৌতম তাঁর পূর্বাচার্য আলাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের কথা মনে করেন। কিন্তু ধ্যানযোগে তাঁরা ইহজগতে নেই জেনে তিনি আবার চিন্তা করেন তাঁর পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসীদের কথা। যোগবলে তিনি জানলেন, তাঁরা বাস করছেন বারাণসীর নিকটে ঋষিপত্তন

মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) । তাঁদের কাছে প্রথম তাঁর তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করবেন মনে করে উরুবেলা হতে তিনি যাত্রা করেন বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবের দিকে।

যথাসময়ে তিনি এসে পৌঁছলেন মৃগদাবে। পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসীরা গৌতমের উজ্জ্বল গৌরকান্তি দেখে সাধনাভ্রষ্ট ও বাহুল্যে প্রবৃত্ত মনে করে গৌতমকে অভ্যর্থনা না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। কিন্তু শ্রমণ গৌতম যতই তাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছেন, তাঁরা আব নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁরা গৌতমকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে বসবার জন্য আসন দেন। তিনি প্রথম তাঁদের কাছে তাঁর চতুরার্যসত্য, অষ্টাঙ্গিকমার্গ ইত্যাদি তত্ত্ব প্রচার করেন। এটিই ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে খ্যাত। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনে প্রীত হয়ে দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছে। এরূপে প্রবর্তিত হল ধর্মচক্র।

মৃগদাবে তথাগতের অবস্থানকালে বারাণসীর ক্ষমতাবান ঐশ্বর্যশালী জনৈক শ্রেষ্ঠীর একমাত্র সন্তান যশঃ সংসারের প্রাচুর্য, ভোগবিলাস, আমোদ ও প্রমোদে অনাসক্ত হয়ে গৃহ ছেড়ে তথাগতের কাছে যান। তাঁকে জানান জাগতিক ভোগবিলাস ও সংসারধর্মের প্রতি আপন বীতস্পৃহার কথা। তথাগত যশের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা ইত্যাদি ধর্মকথা বলে তাঁকে দীক্ষা দেন। অনন্তর যশের পিতামাতা ও স্ত্রী ভগবান বুদ্ধের ধর্মকথায় প্রীত হয়ে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নেন। যশের প্রব্রজ্যা লাভের কথা শুনে যশের চুয়ান্নজন বন্ধুও গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নেন বুদ্ধের কাছে। বুদ্ধের প্রব্রজিত শিষ্যসংখ্যা তখন হল ষাট জন। এরূপে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম বৌদ্ধসংঘ। তখন সংধর্মের অমোঘ বাণী জনগণের মধ্যে ছড়ানোর জন্য তাঁদের চারিদিকে তিনি পাঠাতে লাগলেন এ উপদেশ দিয়ে—

'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।'

—'হে ভিক্ষুগণ। তোমরা দিকে দিকে যাও, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যদের কল্যাণের জন্য। দুজন এক পথে যেও না। তোমরা ধর্ম প্রচার কর—যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ। অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত ও সুমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রচার কর।'

ভিক্ষুদের এরূপ উপদেশ দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে কালাতিপাত না করে বুদ্ধ নিজেও বেরুলেন ধর্মপ্রচারে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছলেন উরুবেলায়। সেখানে তখন জটিল সম্প্রদায়ের নায়ক কাশ্যপ ভ্রাতৃত্রয়—উরুবেলা কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ—বাস করতেন অনেক শিষ্য-মণ্ডলী নিয়ে। তথাগত সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে কাশ্যপ ভ্রাতৃত্রয় ও তাঁদের শিষ্যমণ্ডলীকে অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে মুগ্ধ করেন। বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে কাশ্যপ ভ্রাতৃত্রয় সশিষ্য বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নেন।

সশিষ্য বুদ্ধ এলেন রাজগৃহে। মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের মহিমার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে দীক্ষিত হন। বুদ্ধ ও শিষ্যদের রাজগৃহে বাস করার জন্য বেলুবন নামক উদ্যানে বিহার নির্মাণ করে তিনি বুদ্ধকে দান করেন। বিম্বিসারের বিখ্যাত রাজবৈদ্য জীবক বুদ্ধের গৃহীশিষ্য হলেন। সারাজীবন তিনি বুদ্ধ ও তাঁর সংঘের সেবা ও চিকিৎসা করেন। তিনিও তাঁর উদ্যান দান করেন বুদ্ধকে। এটিই জীবকের আম্রবন নামে খ্যাত।

রাজগৃহে বাস করতেন সঞ্জয় নামক পরিব্রাজক অনেক শিষ্য নিয়ে। শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন এ সঞ্জয়েরই শিষ্য। বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিৎ কোন একদিন ভিক্ষা করতে করতে উপস্থিত হন রাজগৃহে। শারিপুত্র অশ্বজিতের সৌম্য চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট এলেন। তাঁর আচার্য কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (অশ্বজিৎ) 'শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ গৌতম সম্যক্ সম্বুদ্ধ' বলে তাঁকে জানান। শারিপুত্র অশ্বজিৎকে বুদ্ধের ধর্মমত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন,—

'যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ।
তেসঞ্চ যো নিরোধো এবংবাদী মহাসমণো।'[১]

—যে সকল ধর্ম (বস্তু, ঘটনা) হেতু হতে উৎপন্ন, তাদের হেতু সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেছেন, ওদের নিরোধ আছে তাও বলেছেন। মহাশ্রমণের এ অভিমত।

অশ্বজিতের নিকট বুদ্ধের ধর্মের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব শুনে শারিপুত্র আনন্দিত হন। তিনি তাঁর বন্ধু মৌদ্গল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহের যষ্টিবনে যেখানে সশিষ্য

১। সংস্কৃত—

যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদৎ।
তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥

তথাগত বাস করছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে তাঁরা উভয়ে দীক্ষা নেন বুদ্ধের কাছে। অনন্তর বুদ্ধ নিজে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের প্রতিভা দেখে তাঁদের অগ্রশ্রাবক করে নেন।

শারিপুত্র-মৌদ্গল্যায়নের দীক্ষার পর বুদ্ধ রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যে অবস্থিত বহুপুত্রক চৈত্যে বাস করার সময়ে রাজগৃহের জনৈক ধনী গৃহপতি কাশ্যপকে ধর্মকথা বলে মুগ্ধ করলেন এবং তাঁকে দীক্ষা দেন। তিনি পরে মহাকাশ্যপ নামে পরিচিত হন।

শাক্যরাজ শুদ্ধোদন তথাগত রাজগৃহে এসেছেন জেনে তাঁকে কপিলাবস্তুতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠালেন তাঁর পুরোহিতপুত্র উদায়ীকে। পিতার অনুরোধে বুদ্ধ গেলেন কপিলাবস্তুতে। সেখানে তিনি সশিষ্য বাস করেন নিগ্রোধ আরামে। তিনি পিতা ও স্ত্রীকে ধর্মের তত্ত্বকথা বলে দীক্ষা দেন। বুদ্ধের আদেশে শারিপুত্র প্রব্রজ্যা দেন বুদ্ধের একমাত্র পুত্র রাহুলকে। তারপর আবার আনন্দ, অনিরুদ্ধ, ভদ্রিয়, নন্দ, দেবদত্ত, উপালি এবং আরও অনেক শাক্যবংশীয় পুত্ররা তাঁর সদ্ধর্মের বাণী শুনে দীক্ষা নেন তাঁর কাছে।

কপিলাবস্তু হতে ফিরে বুদ্ধ রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করেন। অন্য সময়ে অবশ্য নানাস্থানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। শ্রাবস্তীর সুদত্ত নামক জনৈক ঐশ্বর্যশালী শ্রেষ্ঠী কোন কাজে রাজগৃহে এলে বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে প্রীত হয়ে সুদত্ত তাকে শ্রাবস্তীতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানান।

সুদত্ত অচিরে বুদ্ধের গৃহীশিষ্য হন। তিনি আবার অনাথপিণ্ডদ নামেও পরিচিত। অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীতে ফিরে গিয়ে বুদ্ধের বাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে জেতরাজকুমারের একটি উদ্যান তাঁর পছন্দ হয়। উদ্যানটি ক্রয় করবার জন্য জেতরাজকুমারের সঙ্গে দেখা করেন অনাথপিণ্ডদ। এটি কেনবার প্রস্তাব করলে জেতরাজকুমার বলেন, সোনার মোহরে উদ্যানটি ঢেকে দিতে পারলে তিনি উদ্যানটি বিক্রয় করবেন। নতুবা কোনদিন এটি বিক্রয় করবেন না। এ কথা শুনে অনাথপিণ্ডদ গাড়ী গাড়ী সোনার মোহর এনে উদ্যানটিকে ঢেকে দিয়ে কিনে নিলেন জেতরাজকুমারের উদ্যান। অনাথপিণ্ডদ এ জেত উদ্যানে বিহারাদি নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। এটি জেতবন বিহার নামে খ্যাত। বুদ্ধের বাসের জন্য তিনি যে বিহারটি নির্মাণ করেন সেটি গন্ধকুটি নামে পরিচিত।

বুদ্ধের গৃহী স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে প্রধানা ছিলেন বিশাখা। সাকেতনগরবাসী শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় ছিলেন তার পিতা। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্র পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়। বিশাখার শ্বশুর নগ্ন শ্রমণদের ভক্ত ছিলেন। পরে বিশাখার প্রভাবে বুদ্ধভক্ত হন। বিশাখা বুদ্ধ ও সংঘের ব্যবহারের জন্য যে বিহার দান করেন সেটি মিগারমাতা প্রসাদ নামে খ্যাত।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে কোশলরাজ প্রসেনজিত বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করার জন্য মহামাত্যগণসহ যান জেতবন বিহারে। বুদ্ধ তখন তাঁকে সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফল সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বুদ্ধের কাছে ধর্মকথা শুনে তিনিও বুদ্ধেব একজন পরম ভক্ত হন।

লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাজধানী বৈশালীতে একসময়ে দেখা দিল ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। তাদের রক্ষা করবার জন্য বৈশালীনগরবাসী আহ্বান জানান ভগবান বুদ্ধকে। ভগবান সশিষ্য বৈশালী নগরে আসামাত্র শুরু হল ভীষণ বৃষ্টি। সমস্ত দেশ ডুবে গেল প্লাবনে। প্লাবনের স্রোতে পশু এবং মানুষেব গলিত মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ আবর্জনা ভেসে গেল। ফলে পরিষ্কার হল পথঘাট। জমিতে পড়ল নতুন পলি। শ্যামল শস্যে ভরে গেল বৈশালীর খেত-খামার। সমস্ত বৈশালী-বাসী প্রীত হলেন বুদ্ধের আগমনে। মহালি, মহানাম, অমাত্য নন্দক, ব্রাহ্মণ পিঙ্গিয়ানি ও অন্যান্য আরও অনেকে ভক্ত হলেন বুদ্ধের। ভগবান নিজে লিচ্ছবিদের সাতটি গুণের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেন তাঁর শিষ্যদের কাছে। ইহাই লিচ্ছবিদের সপ্ত অপরিহানিক ধর্ম নামে পরিচিত। ভগবান আরও বলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা সুদর্শনা নগর হতে উপবনযাত্রী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের দেবতাগণকে কখনও দেখনি। সম্পদ ও ঐশ্বর্যে সেই দেবতাগণের সমতুল্য লিচ্ছবিদের দেখে নয়ন সার্থক কর।'

লিচ্ছবিগণরাজ্যের রাজধানী বৈশালীর রূপলাবণ্যে অতুলনীয়া গণিকা আম্র-পালী যানে আরোহণ করে কোটিগ্রামে এলেন বুদ্ধকে দেখবার জন্য। আম্রপালী বুদ্ধের ধর্মকথায় প্রীত হয়ে আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন সশিষ্য বুদ্ধকে। বুদ্ধ তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। আম্রপালী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দেন মহাদান। পরে তিনি হন ভিক্ষুণী।

কৃশাগৌতমী নাম্নী শ্রাবস্তীর এক রমণীর ছেলে মারা গেলে নিজের ছেলের পুনর্জীবন লাভের আশায় এলেন বুদ্ধের কাছে। শোকাভিভূতা নারীকে সান্ত্বনা

ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য বুদ্ধ তাকে যে গৃহে কারো মৃত্যু হয়নি, সে গৃহ হতে একমুঠো সরিষা আনতে বললেন। মৃতপুত্রের জীবনলাভের আশায় তিনি সরিষা খুঁজতে গেলেন ঘরে ঘরে। কিন্তু এমন গৃহ খুঁজে পেলেন না, যেখানে কারো মৃত্যু হয় নি। তখন তাঁর চৈতন্য হল। বুদ্ধ তাকে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তিনি বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে হলেন গৃহীশিষ্যা। পরে তিনিও যোগ দেন ভিক্ষুণীসংঘে।

কোশলরাজের পুরোহিতপুত্র অঙ্গুলিমাল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন তক্ষশীলায়। তাঁর ধীশক্তিতে সহপাঠীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে মিথ্যা কথা লাগিয়ে গুরুর কাছে অভিযুক্ত করেন তাঁকে। গুরুও তাঁকে ত্যাগ করবার জন্য ছল করে সহস্র আঙুল সংগ্রহ করে গুরুদক্ষিণা দিতে বলেন। গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য বনের ধারে লুকিয়ে অনেক লোকহত্যা করে সংগ্রহ করেন ৯৯৯টি। সহস্র আঙুল পূরণের জন্য তাঁর প্রয়োজন আর একটি মাত্র আঙুল। মাতাকে হত্যা করে সহস্র আঙুল পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন অঙ্গুলিমাল। মাতাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে চললে বুদ্ধ করুণাপরবশ হয়ে এসে উপস্থিত হলেন অঙ্গুলিমালের সম্মুখে। তখন মাতার পবিবর্তে অন্য শিকার পেয়ে ছুটলেন বুদ্ধের পেছনে। অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে থামতে বলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, 'আমি তো থেমেই আছি; তুমি থাম।' অঙ্গুলিমাল অবশেষে শান্ত হলেন বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির বলে। বুদ্ধ তাঁকে অহিংসধর্ম সম্বন্ধে বলেন। বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে তিনি প্রব্রজ্যা নিলেন বুদ্ধের কাছে। যাঁকে রাজশক্তি দমন করতে পারেনি, বুদ্ধ তাঁকে নিজের মৈত্রী বলে শান্ত করলেন।

শাক্যগণ কপিলাবস্তুতে এবং কোলিয়গণ দেবদহে বাস করত। রোহিণী নদী উভয় রাজ্যের সীমা ছিল। রোহিণী নদীই সেচনের জল সরবরাহ করত। এই নদীর জল সরবরাহ নিয়ে বিবাদ হল দুই রাজ্যের লোকের মধ্যে। বচসার মধ্য দিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ করার জন্য উদ্যত হলে বুদ্ধ সময়োচিত হস্তক্ষেপ করে বিবাদের মীমাংসা করেন। বিবাদ মীমাংসাকালে ভগবান ঐক্যই জাতির শক্তি ও উন্নতির মূল বলে উপদেশ দেন।

অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্রোণকোটিবিশ এলেন বুদ্ধের কাছে। বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনে তিনিও দীক্ষিত হন তাঁর সদ্ধর্মে।

ভগবান ভগ্‌গদেশের সুংসুমারগিরিতে অবস্থানকালে কৌশাম্বীরাজপুত্র বোধি-রাজকুমার ভগবানের ধর্মকথায় প্রীত হয়ে দীক্ষা নেন বুদ্ধের কাছে। কৌশাম্বীরাজ উদেনের মহিষী শ্যামাবতী ছিলেন বুদ্ধের ভক্ত। কৌশাম্বীতে অবস্থানকালে

সংঘের বিনয়ধর ও ধর্মকথিকদের বিবাদের ফলে বুদ্ধ অতিষ্ঠ হয়ে পারিলিয়ক বনে বর্ষাবাস যাপন করেন। সেখানে বানর ও হাতী তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করে।

অবন্তীরাজের পুরোহিতপুত্র মহাকাত্যায়ন বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। অবন্তীরাজ চন্দ্রপ্রদ্যোতেরও ছিল বুদ্ধের ধর্মের প্রতি উদারদৃষ্টি। অবন্তীর শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্রোণকোটিকর্ণ মহাকাত্যায়নের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। অবশেষে তিনি বারাণসীতে এসে দেখা করেন বুদ্ধের সঙ্গে। শ্রোণকোটিকর্ণেব অনুরোধেই অপরান্ত-দেশের ভিক্ষুদেব জন্য বুদ্ধ বিনয়ের কয়েকটি নিয়মকানুনের কঠোরতা কিছুটা হ্রাস করেন।

মল্লরা ছিলেন বুদ্ধেব ভক্ত। মল্লবোজের প্রথম বুদ্ধের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না। মল্লসংস্থার আইনানুসারে বুদ্ধকে শ্রদ্ধা না করলে জরিমানা দিতে হবে সে ভয়ে তিনি এলেন বুদ্ধের কাছে। কিন্তু বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে তিনি অতীব প্রীত হলেন। তিনি অবশেষে হলেন বুদ্ধের পরমভক্ত। এই মল্লদের মধ্যে আবার দু'জন বিশিষ্ট মল্লপুত্র বৌদ্ধ সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন দর্ব মল্লপুত্র এবং আর একজন চুন্দ কর্মকারপুত্র। এমন কি বুদ্ধ নিজেই মল্লদের কুশীনগরকে পরিনির্বাণের স্থানরূপে মনোনয়ন করেন। তিনি আনন্দকে বলেন, 'পুরাকালে কুশীনগর রাজচক্রবর্তী মহাসুদর্শন রাজার রাজধানী ছিল।'

বুদ্ধ সশিষ্য ধর্মপ্রচারার্থে ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন স্থানে। ক্রমে ক্রমে গৃহীশিষ্য সংখ্যা ও সংঘে ভিক্ষুর সংখ্যা বাড়তে লাগল দিন দিন। মহাপ্রজাপতিব অনুরোধে ও আনন্দের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে ভিক্ষুণীসংঘ। আবার ক্রমশঃ ভিক্ষুণীর সংখ্যাও বেড়ে গেল এ সংঘে। এরূপে রাজা, মহামাত্য, শ্রেষ্ঠী, ধনাঢ্য গৃহপতি ও বহু পরিব্রাজক দীক্ষিত হন বুদ্ধের ধর্মে। কালক্রমে সুদূর তক্ষশীলার রাজা পুষ্করসাদি, ব্রাহ্মণপুরোহিত কূটদন্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সোনদণ্ড, পরিব্রাজক নিগ্রোধ আরও অনেক লোক দীক্ষা নেন বুদ্ধের কাছে। এরূপে উচ্চ নীচ বিভিন্ন স্তরের সহস্র সহস্র লোক দীক্ষিত হল এ বৌদ্ধধর্মে।

এরূপে ধর্মপ্রচার করতে করতে বৈশালীর কোটিগ্রাম ও নাদিকগ্রাম অতিক্রম করে বেলুবগ্রামে এলে তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়েন। শাস্তার পরিনির্বাণের সময় আসন্ন দেখে তাঁর শিষ্য আনন্দ সংঘ পরিচালনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন শাস্তার কাছে। উত্তরে শাস্তা আনন্দকে বলেন—

'অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞ্-ঞসরণা।'

—তোমরা নিজেরাই নিজেদের দ্বীপ বা আশ্রয়স্থল। নিজেরাই নিজেদের শরণ হয়ে বিহার কর। অন্য কারও শরণ নিও না।

তিনি আরও বললেন, যে ভিক্ষু তাঁর পরিনির্বাণের পর আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ হয়ে ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে বিহার করবে সেই ভিক্ষুই অন্ধকারের পরপ্রান্তে পৌঁছবে।

পরদিন শাস্তা এলেন বৈশালীর চাপাল চৈত্যে। সেখানে তিনি ভিক্ষুদিগকে এরূপ উপদেশ দেন—

'বয়ধম্মা সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ'।—'সকল বস্তুই বিনাশশীল, প্রমাদহীন হয়ে বিহার কর।' ইহাই ভগবানের শেষ বাণী।

পরদিন ভগবান শেষবারের মত বৈশালীনগরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তিনি আনন্দকে বৈশালী রমণীয় স্থান বলে প্রশংসা করেন। সেখান হতে তিনি এলেন ভণ্ডগ্রামে। পরে তিনি ভোগনগর অতিক্রম করে এলেন পাবায়। সেখানে তিনি কর্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করেন ভিক্ষুসংঘ নিয়ে। ভগবানের ধর্মদেশনায় কর্মকারপুত্র চুন্দ আনন্দিত হয়ে নিমন্ত্রণ করেন ভিক্ষুসংঘসহ ভগবানকে। ভগবান সশিষ্য চুন্দের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। চুন্দের প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে তিনি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হলেন। মারাত্মক যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন ভগবান। তিনি সেখান হতে যাত্রা করেন কুশীনগরের দিকে। তৃষ্ণার্ত হয়ে পানীয় জল চাইলেন ভগবান আনন্দের কাছে। আনন্দ জলের জন্য গেলেন ককুত্থা নদীতে। পাঁচশত গাড়ী পার হওয়ার ফলে নদীতে জল কর্দমাক্ত হল। কিন্তু জলের জন্য যে মাত্র আনন্দ নদীতে নামলেন, নদীর জল অতি নির্মল হয়ে গেল। আনন্দ পাত্র করে স্বচ্ছ জল নিয়ে ভগবানকে দিলেন। ভগবান এ জল পান করে পথ চলতে শুরু করেন।

ভগবান হিরণ্যবতী নদী পার হয়ে এসে পৌঁছলেন কুশীনগরের উপবর্তন নামে মল্লদের শালবনে। তিনি আনন্দকে জোড়া শালগাছের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তরদিকে মাথা করে শয্যা প্রস্তুত করতে বলেন। ইহাই তাঁর শেষ শয়ন। শালতরু পুষ্পে শোভিত হল। অন্তরীক্ষ হতে দিব্য মন্দার পুষ্প ও চন্দনচূর্ণ পড়ল ভগবানের দেহে। আনন্দ ভগবানের শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে পাখা করতে লাগলেন। মৃত্যু

সন্নিকট দেখে আনন্দ ভগবানের নিকট তথাগতের দেহাবশেষের ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তথাগত বললেন—

'অব্যাবটা তুম্হে, আনন্দ, হোথ তথাগতস্স সরীরপূজায়। ইঙ্ঘ তুম্হে, আনন্দ, সারত্থে ঘটথ অনুযুঞ্জথ ; সারত্থে অপ্পমত্তা আতাপিনো পহিতত্তা বিহরথ। সন্তানন্দ খত্তিয়পণ্ডিতা পি ব্রাহ্মণপণ্ডিতা পি গহপতিপণ্ডিতা পি তথাগতে অভিপ্পসন্না। তে তথাগতস্স সরীরপূজং করিস্সন্তি।'

—আনন্দ, তোমরা তথাগতের শরীর পূজার জন্য ব্যস্ত হইও না। সদর্থে প্রযুক্ত হও। সদর্থের অনুসরণ কর, সদর্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সংকল্প হও। আনন্দ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিরা তথাগতকে শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁরাই তথাগতের দেহাবশেষেব ব্যবস্থা করবেন।

যে গুরুকে আনন্দ এত ভালবাসতেন, এত ভক্তি ও সেবা করতেন, তাঁর অন্তিম দশা দেখে প্রিয় শিষ্য আনন্দ রোদন করতে লাগলেন। বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে বললেন—

অলং, আনন্দ, মা সোচি, মা পরিদেবি। ননু এতং, আনন্দ, ময়া পটিকচ্চেব অক্খাতং—সব্বেহেব পিয়েহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো।

—'আনন্দ, অধীর হইও না, রোদন করো না। যে সকল বস্তু আমাদের প্রিয় মনোজ্ঞ, তাদের ধর্মই এ যে আমরা তাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো—তা আগে কি বলিনি ?'

ভগবানের পরিনির্বাণে তথাগতের বাণী শেষ হয়ে গিয়েছে, শিষ্যরা গুরুহীন হয়েছে—এরূপ মনে করা উচিত নয়। কারণ ভগবান নিজেই শিষ্যদের কাছে তা বলেন—যো বো, আনন্দ, ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো, সো বো মমচ্চয়েন সত্থা'—আনন্দ, আমি যে তোমাদের ধর্ম ও বিনয়ের উপদেশ দিয়েছি ও বুঝিয়েছি—আমার অবর্তমানে তাই হবে তোমাদের উপদেষ্টা। অতঃপর তথাগত ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। রাত্রির তৃতীয় যামে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করেন।

আনন্দের নিকট তথাগতের পরিনির্বাণের খবর পেয়ে মল্লগণ শোকে অভিভূত হলেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য, মাল্য, গন্ধাদি দ্বারা ভগবানের দেহের পূজার্চনা করলেন মল্লগণ। মল্লগণের আটজন প্রধান নায়ক ভগবানের দেহকে নতুন বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত করে সুগন্ধ কাষ্ঠনির্মিত চিতায় তুলে দিলেন।

স্থবির কাশ্যপ তখন ছিলেন পাবায়। এক আজীবিক শ্রমণের মুখে তথাগতের মৃত্যুর খবর পেয়ে কাশ্যপ বহু ভিক্ষু নিয়ে এলেন কুশীনগরে তথাগতকে শেষবারের মত দেখবার জন্য।

ভিক্ষুরা তথাগতকে পরিনির্বাণ শয্যায় দেখে বাহু প্রসারিত করে কাঁদতে লাগলেন। তখন সুভদ্র নামক জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষু রোদনরত ভিক্ষুদিগকে বললেন—

'অলং, আবুসো, মা সোচিথ, মা পরিদেবিথ। সুমুত্তা ময়ং তেন মহাসমণেন। উপদ্দুতা চ হোম—ইদং বো কপ্পতি, ইদং বো ন কপ্পতী'তি। ইদানি পন ময়ং যং ইচ্ছিস্সাম তং করিস্সাম, যং ন ইচ্ছিস্সাম ন তং করিস্সাম।'

—"আয়ুষ্মানগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করো না, বিলাপ করো না। সেই মহাশ্রমণ হতে মুক্ত হয়ে—আমরা রক্ষা পেয়েছি। 'ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা তোমাদের উপযুক্ত নয়'—এরূপ বাক্যের দ্বারা আমরা নিপীড়িত হতাম। এখন আমরা যা ইচ্ছা করবো, যা ইচ্ছা নয় তা কববো না"। স্থবির কাশ্যপ সুভদ্রের কথা শুনে তাকে নিরস্ত করলেন এবং ভগবানের বাণী রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। তখন ভিক্ষুরা তথাগতের শরীরপূজা করেন। চারিজন মল্লপ্রধান তথাগতের চিতায় আগুন দিলেন।

মগধের রাজা অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদীপের একজন ব্রাহ্মণ এবং পাবা গ্রামের মল্লগণ ভগবান বুদ্ধের পূত দেহাবশেষের অংশ চাইলেন। মল্লরা কিন্তু অন্য কাকেও তা দিতে রাজী না হলে বিবাদ শুরু হয়। পরে দেহাবশেষ আট ভাগে ভাগ করে সকলকে এক ভাগ করে দেওয়া হল। পিপ্পলিবনের মোরিয়গণ বিলম্বে এসেছিলেন বলে তাঁরা দেহাবশেষের অংশ না পেয়ে শুধু চিতাভস্মই নিলেন।

জীবনের সুদীর্ঘ ৪৫ বছরকাল ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন ভগবান বুদ্ধ। জগতের হিতসাধনাই ছিল তার একান্ত কাম্য। তারপর ৮০ বছর বয়সে খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ সংঘ

সংঘ গৌতম বুদ্ধের একটি প্রকৃষ্ট অবদান। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের সময় ও তৎপূর্বে এরূপ সুসংগঠিত সংঘের পরিচয় বিশেষ মেলে না। বৌদ্ধ সাহিত্যে সংঘ (সংঘাচার্য), গণ (গণাচার্য) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ সংঘ যেমন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ ছিল, তেমন অন্য কোন সংঘের পরিচয় জানা যায় না। নানারূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ এরূপ সংঘ সৃষ্টি-ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

ষাট জন মাত্র ভিক্ষু নিয়ে উৎপত্তি হয়েছিল বুদ্ধের এ সংঘ। কিন্তু দলে দলে লোক যোগদান করায় সংঘ ক্রমশঃই বৃহৎ হতে লাগল। তখন আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে গোলযোগও সংঘের মধ্যে শুরু হল। বিভিন্ন অনাচারে সংঘ জীবন কলুষিত হতে লাগল। এই অব্যবস্থা ও অনাচারের প্রতিকার কল্পে বুদ্ধ কতকগুলো আজ্ঞা ও নিয়মকানুন সংঘের জন্য বিধান করেন। কোন কোন নিয়মে পরবর্তী সময়ে ভিক্ষুদের অসুবিধা সৃষ্টি করায় বুদ্ধ সেগুলোর আমূল পরিবর্তন করে নূতন নিয়ম প্রবর্তন করতেন কুণ্ঠিত হন নি। সংঘকে সৎপথে পরিচালনা করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সংঘের বিধিনিষেধে এত রদবদল। সংঘজীবনের এসব নিয়মকানুন ও বিধিব্যবস্থার কথা ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়-পিটকে বিশদভাবে পাওয়া যায়।

স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে উচ্চনীচ সকলেরই সংঘে প্রবেশের সমান অধিকার ছিল। জাতিবর্ণনির্বিশেষে ব্রাহ্মণ শারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন হতে নাপিত উপালি পর্যন্ত এ সংঘের সদস্য। প্রার্থীকে পূর্বে বুদ্ধ নিজেই শুধু 'এহি ভিক্খু' বা 'এথ ভিক্খবো' —এস ভিক্ষু বা এস ভিক্ষুরা বলে সংঘে সরাসরি প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এর মধ্যে কোন কঠোরতা ছিল না,—ছিল কেবল এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান।

এতে প্রার্থীদের দূর দূরান্তর স্থান হতে এসে বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুত্ব নিতে বড়ই কষ্ট হত। ভিক্ষুরাও তাঁর নিকটে তাদের আনতে বেশ কষ্ট পেতেন। কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুত্ব নেবার জন্য আসতে পথে মারা যান। এসব চিন্তা করে বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপর প্রার্থীদের ভিক্ষুত্ব দেবার ভার ছেড়ে দিলেন।

তখন হতে ভিক্ষুরা আবার নিজেদের ভার বহা ছাড়া অন্যদের ভার বহন করতে লাগলেন। আগে প্রার্থীদের বুদ্ধ ও ধর্মের আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষু হতে হত। এখন হতে আবার ভিক্ষুদের অর্থাৎ সংঘের আশ্রয় নেওয়া আরম্ভ হল। এরূপে সংঘের প্রতিষ্ঠা হল। ভিক্ষুরা দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন এবং দলে দলে লোক ভিক্ষু হয়ে সংঘে যোগ দিতে লাগলেন। বুদ্ধ নিজেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না। তিনিও নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করত লাগলেন এবং বহু লোক তাঁর ধর্মকথা শুনে নবধর্মে দীক্ষিত হল। এভাবে প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম অতিদ্রুত সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পালি মহাবগ্‌গপাঠে জানা যায় সারা মগধে এমন ঘর ছিলনা যেখান হতে কেউ ভিক্ষু হয়নি। সেখানে ঘরে ঘরে কান্নার রব উঠল। জনসাধারণ হতাশ হয়ে বলাবলি করতে লাগল—শ্রমণ গৌতম লোককে অপুত্রক করার জন্য, নারীর বৈধব্যের জন্য এবং বংশোচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন[১]। ভিক্ষায় বের হলে লোকে, এরূপে বিদ্রূপ করত। ভিক্ষুর সংখ্যা তথাপি বেড়ে উঠল। দলে দলে উচ্চ নীচ, যোগ্য অযোগ্য সকলেই প্রবেশ করায় সংঘ জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, দেখা দিল বিচ্যুতি। তাই সংঘ প্রবেশের নিয়মকানুনও হয়ে উঠল কঠোর। পা-কাটা, হাত-কাটা, নাক-কাটা, কান-কাটা, আঙুল-কাটা, কুব্জ, বামন, কাণা, কুণী, খোঁড়া, মূক, অন্ধ, বধির প্রভৃতি বিকলাঙ্গ কুষ্ঠ, ক্ষয়, কিলাশ, গণ্ড,অপস্মার প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্তদের অর্হৎঘাতক, মাতৃ-পিতৃঘাতক, সংঘভেদক, বুদ্ধের রক্তোৎপাদক, ভিক্ষুণীদূষক পাত্রচীবরহীন, মানবেতরজীব, চোর, রাজভৃত্য ও সৈনিক প্রভৃতিদের জন্য রুদ্ধ হল এ সংঘের প্রবেশদ্বার।

সংঘে প্রথম প্রবেশের সময় সকল প্রার্থীকেই যুক্ত করে বলতে হত :—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।

১। মহাবগ্‌গ, ১ম খঃ, ২৪, ৫—মনুস্সা উজ্ঝায়ন্তি খীয়ন্তি বিপাচেন্তি অপুত্তকায় পটিপন্নো সমণো গোতমো, বেধব্যায় পটিপন্নো সমণো গোতমো কুলূপচ্ছেদায় পটিপন্নো সমণো গোতমো।

তিতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
তিতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
তিতিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।

—আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি। আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি। আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। দ্বিতীয়বার আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি। দ্বিতীয়বার আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি। দ্বিতীয়বার আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। তৃতীয়বার আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি। তৃতীয়বার আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি। তৃতীয়বাব আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ব্যবস্থা ত্রিশরণ নামে খ্যাত। সংঘে প্রবেশের দুটি সোপান। সংঘে প্রথম প্রবেশের নাম প্রব্রজ্যা। প্রব্রজিতকে বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রমণ বলা হয়। পনর বছরের পূর্বে কেউ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারতো না। শ্রমণজীবন অতিবাহিত হওয়াব পর তাকে উপসম্পদা দেওয়া হত এবং তখনই হত তার পূর্ণ ভিক্ষুত্ব ও সংঘের সকল প্রকার অধিকার লাভ। কুড়ি বছরের পূর্বে কেউ উপসম্পদা লাভ করতে পারতো না। যদি কেউ প্রব্রজ্যা নিতে চাইতো তা হলে তাকে কোন অভিজ্ঞ ভিক্ষুকে উপাধ্যায় মনোনয়ন করে তারপর কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরে উত্তরাসঙ্গ দিয়ে এক কাঁধ আবৃত করে পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে যুক্ত করে তিনবার প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করতে হত। তখন উপাধ্যায় তাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যথোচিত উত্তর পেলে ত্রিশরণ ও দশশীল[১] সহ প্রব্রজ্যা

১। (ক) পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—প্রাণীহত্যা হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(খ) অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—অদত্ত গ্রহণ (চৌর্য) হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(গ) অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—অব্রহ্মচর্য হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(ঘ) মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—মিথ্যা কথা হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(ঙ) সুরা-মেরেয়-মেজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—সুরা, মেরেয় ও মত্তাদি প্রমাদের কারণ হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(চ) বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি—বিকালভোজন হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

দিতেন। প্রার্থী তখন হত শ্রমণ। তারপর উপাধ্যায় আবার তাকে চীবর (কাষায় বস্ত্র), পিণ্ড (ভিক্ষান্ন), শয়নাসন (বাসস্থান) ও ভৈষজ্য (ঔষধ) এ চারিটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। ইহাই ছিল প্রব্রজ্যাবিধি। শ্রমণরূপে জীবনযাপনের পর উপযুক্ত বয়স হলে তার হত উপসম্পদা। তখন উপাধ্যায় তাকে যেখানে কম পক্ষে দশ জন ভিক্ষু আছেন সেখানে সংঘেব নিকট উপস্থিত করে উপসম্পদার জন্য অনুরোধ জানাতেন। তারপর শ্রমণকে উত্তরাসংগ দিয়ে এক কাঁধ আবৃত করে ভিক্ষুদের বন্দনা করে পায়ের উপর ভর দিয়ে যুক্ত করে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হত। ভিক্ষু সংঘেব মধ্যে অভিজ্ঞ ভিক্ষু তাঁর নাম-ধাম, উপসম্পদার অন্তরায়কর বিষয় ও নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির কথাও জিজ্ঞাসা করতেন। এ সবেব যথোচিত উত্তব পেলে উপাধ্যায় শ্রমণকে সংঘে নেওয়ার কোন আপত্তি আছে কিনা এরূপ অনুবোধ জানাতেন। আপত্তি থাকলে সংঘ বলতেন এবং আপত্তি না থাকলে চুপ করে সম্মতি জানাতেন। এরূপে সংঘেব মতামত জানা যেত। সংঘের সম্মতি জানতে পারলে উপসম্পন্নকে তাঁব নিজেব ছায়া মাপতে, ঋতুব উল্লেখ করতে ও দিনের কত ভাগ কেটেছে তা নির্ধারণ করতে হোত। তারপর তাঁকে চারিটি আশ্রয় (নিস্‌সয়)[১] ও চারিটি অকরণীয়[২] আজীবন পালন করতে বলা হোত। অবশেষে তিনি তাঁর পূর্বনাম ত্যাগ করে ধর্মবংশ, ধর্মরক্ষিত

(ছ) নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি—নাচ, গান, বাজনা ও কৌতুকাদিদর্শন হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(জ) মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি—মালা গন্ধ বিলেপনাদি ধারণ ও বিভূষণ হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(ঝ) উচ্চাসয়নমহাসয়না বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি—উচ্চ শয্যা ও মহাশয্যা হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(ঞ) জাতরূপ-রজত-পটিগ্‌গহণা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি—সোনা-রূপা প্রতিগ্রহণ হতে বিরতি—এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১। চত্তারো নিস্‌সয়া : পিণ্ডিয়ালোপভোজনং, পংসুকূলচিবরং, রুক্‌খমূলসেনাসনং, পূতিমুত্তভেসজ্জং—ভিক্ষান্ন গ্রহণ, ছেঁড়া কাপড় পরা, গাছের তলায় শোয়া ও গোমূত্র ঔষধাদি সেবন।

২। মেথুনধম্ম, থেয্যসঙ্‌খাত, জীবিতবোরোপনা, উত্তরিমনুস্‌সধম্ম—অব্রহ্মচর্য, চৌর্য, প্রাণি-বধ ও অলৌকিক ধর্মারোপ।

ধর্মপাল ইত্যাদির যে কোন একটি নাম নিতেন। তখন তিনি লাভ করতেন সংঘের পূর্ণ অধিকার। ইহাই ছিল উপসম্পদাবিধি।

সংঘে শিক্ষার্থীদের জন্য দু'প্রকার শিক্ষাগুরুর উৎপত্তি হলো—উপাধ্যায় ও আচার্য। উপাধ্যাযের সঙ্গে যে শিক্ষার্থী থাকতো তাকে সদ্ধিবিহারিক বলা হয় এবং আচার্যের সঙ্গে যে থাকতো তাকে অন্তেবাসিক। তিব্বতী গ্রন্থ হতে দু'প্রকার উপাধ্যায ও পাঁচ প্রকাব আচাযের কথা জানা যায। এ দু'প্রকাব উপাধ্যায হল—

(ক) যিনি প্রব্রজ্যা দেন এবং

(খ) যিনি উপসম্পদা দেন।

পাঁচ প্রকাব আচার্য হন—

(ক) যিনি শ্রমণেব উপদেশ দাতা,

(খ) যিনি গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেন,

(গ) যিনি সংঘকর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন,

(ঘ) যিনি নিশ্রয দেন এবং

(ঙ) যিনি শাস্ত্র অধ্যয়নেব ব্যবস্থা কবেন।

ভিক্ষুবা যাতে বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন কবতে পারেন সেজন্য বুদ্ধ প্রতি উপোসথ দিবসে সংঘে প্রাতিমোক্ষসূত্র পাঠের ব্যবস্থা কবেন। ভিক্ষুবা চতুর্দশীতে না হয় পঞ্চদশীতে বিহারের নির্বাচিত সীমাব মধ্যে সম্মিলিত হয়ে প্রাতিমোক্ষসূত্র পড়তেন। তাছাড়া চতুর্দশীতে ও অষ্টমীতে আবার ভিক্ষুবা মিলিত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। অব্রহ্মচর্য, চৌর্য, নরহত্যা ও নিজের উপর যে কোন অলৌকিক শক্তির আরোপ—এ চারিটি গুরুতর অপরাধের যে কোন একটিতে ভিক্ষু দোষী সাব্যস্থ হলে সংঘ হতে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। এ চারিটিই হল পরাজিক অপরাধ। প্রতিমোক্ষসূত্র পাঠে ভিক্ষুদের আরও অনেক অপরাধ ও শাস্তির কথা জানা যায়:—

সঙ্ঘাদিশেষ—মোট তেরটি। এ গুলির মধ্যে ১—৫টি ব্যভিচার বিষয়ক, ৬—৭ কুটির নির্মাণ বিষয়ক, ৮—৯ অমূলক অভিযোগ বিষয়ক, ১০—১১ সংঘভেদ বিষয়ক ও ১২—১৩ ভিক্ষুদের একগু যেমি ও সদুপদেশ না শোনা। এগুলির মধ্যে নয়টি প্রথম লঙ্ঘনে ও চারিটি তিনবাব নিষেধ সত্ত্বেও ব্যতিক্রমে অপরাধ হয়। এ অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হলে ভিক্ষুকে গোঁড়াতে ও শেষে সংঘের আশ্রয় নিতে

হত মুক্তি লাভেব জন্য। তাই এর নাম হয়েছে সঙ্ঘাদিশেষ। এ অপরাধে ভিক্ষুকে পরিবাস ও মানত্ত দণ্ড ভোগ করতে হোত। এ সময়ে সে তার সংঘের অনেকগুলি অধিকার হারাতো ও সংঘ হতে আলাদা বাস করতো। ভিক্ষু যতদিন তার দোষ গোপন করে রাখতো ততদিন পযন্ত পরিবাস ভোগ কবতো। তারপর ছয় দিনের জন্য সে মানত্ত দণ্ড পেতো। মানত্ত ভোগের পর তাকে আবার সংঘে নেওযা হোত—একে বলা হয় অব্ভান।

অনিয়ত—মোট দুটি। ভিক্ষুব ভিক্ষুণীব প্রতি গর্হিত আচবণমূলক অপবাধ। এখানে অবস্থা পযালোচনা কবে অপরাধ ঠিক কবা হোত—সেজন্য এব নাম অনিযত। পাবাজিক, সঙ্ঘাদিশেষ ও পাচিত্তিয—এ তিনটি অপবাধেব যে কোন একটিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত কবে দণ্ড দেওযা হোত।

নৈসর্গিয় প্রায়শ্চিত্তিক—মোট ত্রিশটি। এগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত—চীবব-বর্গ, মেষলোমবর্গ ও পাত্রবর্গ। এগুলিব মধ্যে ২৬টি চীবব, পশমী কাপড, পাত্র, ঔষধ ইত্যাদি গ্রহণ বিষযক ও আব চাবটি সোনা, রূপা গ্রহণ ও বেচাকেনা ইত্যাদি বিষযক। এ অপবাধে ভিক্ষুকে সেই সেই জিনিষ পরিত্যাগ কবে প্রাযশ্চিত্ত কবতে হয।

প্রায়শ্চিত্তিক—মোট বিরানব্বইটি। নয়টি বর্গে বিভক্ত—মৃষাবাদবর্গ, ভূত-গ্রামবর্গ, ভিক্ষুণী-উপদেশবর্গ, ভোজনবর্গ, অচেলকবর্গ, সুরাপানবর্গ, সপ্রাণক বর্গ, সহধর্মিকবর্গ ও রত্নবর্গ। এগুলির বর্গ বিভাগে কোন সামঞ্জস্য নেই। সম্ভবতঃ অবস্থা দেখেই এ নিয়মগুলির বিধান করা হয়। এ অপরাধে ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

প্রতিদেশনীয়—মোট চারটি। এগুলি খাদ্য বা ভোজ্য বিষয়ক অপরাধ। এ অপরাধে দোষী ভিক্ষুকে ভিক্ষুদের সম্মুখে নিজের অপবাধ স্বীকার করতে হয়।

প্রাতিমোক্ষে এ সব অপরাধগুলি গুরুত্ব অনুসারে সন্নিবিষ্ট। পারাজিক সর্বাপেক্ষা গুরু অপরাধ বলে প্রথমেই নির্দিষ্ট এবং প্রতিদেশনীয় সর্বাপেক্ষা লঘু অপরাধ বলে শেষে স্থান পেয়েছে।

এ অপরাধগুলো ছাডাও পালি সুত্তবিভঙ্গ, মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ হতে ভিক্ষুদের আরও অনেক লঘু অপরাধ ও শাস্তির কথা জানা যায়—

দুক্কত—কর্ম সম্বন্ধে লঘু অপবাধ।

দুর্ভাষিত—বাক্য সম্বন্ধে লঘু অপরাধ।

স্থূলাত্যয়—সংঘ সম্বন্ধে লঘু অপরাধ।

এ তিনটি অপরাধে দোষী ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করলে মুক্তি লাভ করে।

তর্জনীয়কর্ম—যদি কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর সংগে ঝগড়া করে, মিছামিছি কথা বলে ও সংঘে অবৈধ প্রশ্ন তোলে তার এ অপরাধ হয়। এ অপরাধে দোষী ভিক্ষুকে সংঘের অনেকগুলি অধিকার হারাতে হয়। সে শ্রমণকে উপসম্পদা ও নিস্সয় (আশ্রয়) দিতে পারে না। তাকে ভিক্ষু নিজের কোন কাজে লাগাতে পারে না। সে ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারে না। সে উপোসথ প্রবারণাদি ক্রিয়াকর্মে যোগ দিতে পারে না। তার সংঘে ভোট দিবার অধিকার থাকে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে সে সংঘের সব কাজেই অনুপস্থিত ভিক্ষু বলে গণ্য হয়। যদি সে তার চরিত্র সংশোধন করে ও সংঘকে দণ্ড প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানায় তাকে আবার সংঘে লওয়া হয়।

নিশ্রয়কর্ম—যদি কোন ভিক্ষু গৃহী সংসর্গে আসে বা তাদের সহিত অবাধ মেলামেশা করে এবং সেজন্য ভিক্ষুরা যদি তাকে পরিবাস, মানত্ত ইত্যাদি দণ্ড বার বার দিয়ে উত্যক্ত হয়ে উঠে, সংঘ তখন তাকে নিশ্রয়কর্ম দণ্ড দেন। তখন তাকে অন্য ভিক্ষুর অধীনে থেকে তাঁর উপদেশ মত চলতে হোত ও ত্রিপিটকাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে হোত। এই অপরাধে দোষী ভিক্ষু সংঘের সব অধিকারই হারায়। কার্যতঃ তাকে শ্রমণ-পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যদি সে অসংগত আচরণ পরিহার করে তাকে পুনরায় সংঘে.নেওয়া হোত।

প্রব্রাজনীয় কর্ম—যদি কোন ভিক্ষু কুলদূষক ও নাচগান বাজনা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে পাপাচরণ করে তখন তাকে প্রব্রাজনীয় দণ্ড দেওয়া হয়। এ অপরাধে ভিক্ষুকে বিহার ত্যাগ করতে হোত। তাকে সংঘে পুনরায় নেওয়া হোত। এর বিধি তর্জনীয় ও নিশ্রয় কর্মের মত।

প্রতিসারনীয় কর্ম—যদি কোন ভিক্ষু গৃহীর প্রতি অভদ্র আচরণ করে ও তার সম্মুখে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—এই ত্রিরত্নের নিন্দা করে তখন তাকে প্রতিসারণীয় দণ্ড দেওয়া হয়। এ অপরাধে দোষী ভিক্ষু গৃহীর নিকট অপরাধ মার্জনার জন্য অনুরোধ জানাতো। সংঘে আবার তাকে নেওয়া হোত। এর বিধিও তর্জনীয় ও নিশ্রয়কর্মের মত।

উৎক্ষেপনীয় কর্ম—যদি কোন ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার না করে বা নীতিগর্হিত মতবাদ পরিহার না করে, তখন তাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড দেওয়া হত। এ অপরাধে দোষী ভিক্ষুকে অন্য ভিক্ষুর সহিত বাস করতে বা ভোজন করতে বা অবাধ মেলামেশা করতে দেওয়া হোত না। তাকে আবার সংঘে নেওয়া হোত। এর নিয়ম-কানুনও তর্জনীয়ও নিশ্রয় কর্মের মত।

পরিবাস—যদি কোন ভিক্ষু সংঘাদিশেষ অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হয়, তখন তাকে পরিবাস দণ্ড দেওয়া হয়। দোষী ভিক্ষু তার দোষ যতদিন গোপন করে রাখে ততদিন পর্যন্ত তাকে পরিবাস দণ্ড ভোগ কবতে হয়। পরিবাস তিন প্রকাবেব—প্রতিচ্ছন্ন, সুদ্ধন্ত ও সমোধান।

মানত্ত—পবিবাস দণ্ড ভোগেব পর দোষী ভিক্ষুকে মানত্ত দণ্ড ভোগ কবতে হয়। মানত্ত দণ্ডেব নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল ছ'দিন মাত্র।

মহাবগ্‌গে **প্রতিকর্ষণা, নিঃসারণা** ও **অবসারণা** অপরাধের উল্লেখ আছে। কিন্তু এদের বিবরণ বিশেষ কিছু মেলে না।

গণতন্ত্রের আদর্শে গঠিত ছিল এই সংঘ। প্রত্যেক ভিক্ষুই সংঘের সদস্য ছিলেন এবং প্রতিটি কাজেই তাঁদের মতামত দেওয়ার অধিকার ছিল। মতানৈক্য হলে অধিকাংশ ভিক্ষুর মতানুসারেই তার নিষ্পত্তি হত এবং সংঘের মধ্যে কোন বিষয়ে ভিক্ষুদেব মত গ্রহণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত শলাকা বা টিকিট। সকল ভিক্ষুকে উপস্থিত থাকতে হত। এমন কি অনুপস্থিত ভিক্ষুরও মতামত অন্যের দ্বাবা প্রেরণ কবতে হত। মোট কথা, সংঘের সব কাজই অধিকাংশ ভিক্ষুর মতেই স্থির হত। সংঘের বিরোধ মীমাংসার জন্য বিনয়পিটকেব প্রাতিমোক্ষসূত্রে সাত প্রকাব রীতির উল্লেখ দেখা যায়, যথা ঃ—

(ক) **সম্মুখবিনয়** (সম্মুখাবিনয়)—অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়েরই সমক্ষে বিবাদ নিষ্পত্তি হত বলে এর নাম সম্মুখবিনয়।

(খ) **স্মৃতিবিনয়** (সতিবিনয়)—যে ভিক্ষু বলেন তার সম্পূর্ণ স্মবণ আছে, তিনি কোন দোষ করেন নাই—তার সম্বন্ধে বিচার।

(গ) **অমূঢ়বিনয়** (অমূল্‌হবিনয়)—যে ভিক্ষু পূর্বে উন্মত্ত হয়েছিলেন কিন্তু এখন তাঁর উন্মত্তাবস্থা নাই—তার সম্বন্ধে বিচার।

(ঘ) **প্রতিজ্ঞাকরণবিনয়** (পটিঞ্‌ঞায়বিনয়)—যে ভিক্ষু তাঁর নিজের দোষ স্বীকার করেন তাঁর সম্বন্ধে বিচার।

(ঙ) **যদ্ভুয়সিকাবিনয়** (যেভুয্যসিকাবিনয়)—সংঘে যে সকল ভিক্ষু উপস্থিত হন তাদের অধিকাংশের মতে বিচার। এই মতামত সংগ্রহের জন্য শলাকা ব্যবহারের রীতি ছিল।

(চ) **তৎস্বপাপীয়সিকাবিনয়** ('তস্‌সপাপিয্যসিকাবিনয়)—দুরাচার ভিক্ষুর সম্বন্ধে বিচার।

(ছ) **তৃণবস্তারকবিনয়** (তিণবত্থারকবিনয়)—দুর্গন্ধ হতে নিষ্কৃতি পাওযাব জন্য মলকে যেমন তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় সেরূপ ভিক্ষুসংঘের কলহবিবাদ অনেক সময় চাপা দেওয়া হত। এভাবে কলহবিবাদ মিটবার রীতিকে বলা হয় তৃণবস্তারকবিনয়।

এ সংঘ আবার ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) একটি রত্ন বলে পূজিত। তাই এর শাসন লঙ্ঘন করা হতো না। সংঘে লোকের প্রবেশ যেমন সহজ ছিল তেমনি সহজ ছিল সংঘ ত্যাগ করাও। যে কোন সময় ভিক্ষুজীবন ত্যাগ করে সংসারে ফিরে আসা চলতো। সংঘের আবার আর একটি ভাগ ছিল ভিক্ষুণী সংঘ।

পালি চুল্লবগ্‌গ হতে জানা যায় ভগবান বুদ্ধ যখন কপিলাবস্তু নগরের নিগ্রোধ আরামে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর বিমাতা তথা মাসীমা মহাপ্রজাবতী গৌতমী নারীজাতিকে তাঁর সংঘে প্রবেশাধিকাব দেওয়ার জন্য সানুনয় অনুরোধ করেন। কিন্তু বুদ্ধ এই প্রস্তাব তখনি প্রত্যাখ্যান করেন। এতে মহাপ্রজাবতী গৌতমী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কান্নাকাটি করতে কবতে ফিরে গেলেন। এখান হতে পরে বুদ্ধ বৈশালী নগরে এসে মহাবন-কূটাগার-শালায় বাস করছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে গৌতমী মস্তক মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পবে বহু শাক্য নারীদের সহিত দ্রুত-পদে এখানে উপস্থিত হন। দীর্ঘ পথ চলার দরুণ তিনি ক্লান্ত হলেন, তার পা ফুলে গেল ও ধূলায় ধূসরিত হল তাঁর দেহ। এখানে এসে কূটাগার-শালার ফটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য,আনন্দ তাঁর এ অবস্থা দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। গৌতমীর সব কথা শুনে তিনি নারীদের সংঘে প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেওয়ার জন্য বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, নারীদের সংঘে স্থান দেওয়া সমীচীন হবে না। এতে সদ্ধর্মের হবে অন্তরায় ও সংঘ হবে কলুষিত। নারীরা সংঘে স্থান না পেলে সংঘের আয়ুকাল হতো হাজার বছর কিন্তু সংঘে স্থান পেলে এর আয়ুকাল হবে পাঁচ'শো বছর। কিন্তু শেষে আনন্দের আকুতিতে ও প্রজাবতী গৌতমীর অবস্থা দেখে,

তিনি স্ত্রীজাতিকে সংঘে প্রবেশাধিকার দেন এবং ভিক্ষুণীদের জন্য আটটি বিশেষ নিয়ম বিধান করেন ঃ

(ক) এক'শ বছর উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুণীকেও একদিনের উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুকে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হতো।

(খ) যেখানে কোন ভিক্ষু নাই, সেখানে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস যাপন করতে পারতেন না।

(গ) ভিক্ষুণীকে প্রতিপক্ষে উপোসথের তারিখ ও উপদেশের সময় ভিক্ষুর নিকট জানতে হতো।

(ঘ) বর্ষার পর প্রবারণা পালনের বিষয় ভিক্ষুসংঘেব নিকট ভিক্ষুণীকে প্রকাশ করতে হতো।

(ঙ) ভিক্ষুণী অপবাধ করলে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের নিকট মানত্ত ব্রত নিতে হত।

(চ) ভিক্ষুণীকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করতে হত।

(ছ) ভিক্ষুণী ভিক্ষুর কখনই নিন্দা করতে পারতেন না।

(জ) ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে পারতেন। কিন্তু ভিক্ষুণীরা কখনও ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে পারতেন না।

দ্রষ্টব্য :—(ক) বস্সসতুপসম্পন্নায় ভিক্খুনিয়া তদহুসম্পন্নস্স ভিক্খুনো অভিবাদনং পচ্চুট্ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচিকম্মং কাতব্বং।

(খ) ন ভিক্খুনিয়া অভিক্খুকে আবাসে বস্সং বসিতব্বং।

(গ) অন্বদ্ধমাসং ভিক্খুনিয়া ভিক্খুসঙ্ঘতো দ্বে ধম্মা পচ্চাসিংসিতব্বা উপোসথপুচ্ছকং চ ওবাদূপসকংমনং।

(ঘ) বস্সং বুত্থায় ভিক্খুনিয়া উভতোসঙ্ঘে তীহি ঠানেহি পবারেতব্বং দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায বা।

(ঙ) গরুধম্মং অজ্ঝাপন্নায় ভিক্খুনিয়া উভতোসঙ্ঘে পক্খমানত্তং চরিতব্বং।

(চ) দ্বে বস্সানি ছসু ধম্মেসু সিক্খিতসিক্খায় সিক্খমানায় উভতোসঙ্ঘে উপসম্পদা পরিয়েসিতব্বা।

(ছ) ন ভিক্খুনিয়া কেনচি পরিয়ায়েন ভিক্খু অক্কোসিতব্বো পরিভাসিতব্বো।

(জ) অজ্জতগ্গে ওবটো ভিক্খুনীনং ভিক্খুসু বচনপথো, অনোবটো ভিক্খুনং ভিক্খুনীসু বচনপথো।

এগুলো পালি শাস্ত্রে অষ্ট গুরুধর্ম বা আটটি গুরুতর অপরাধ নামে খ্যাত। দেখা যায় উপদেশ নেওয়া হতে আরম্ভ করে সব বিষয়েই ভিক্ষুণীরা ছিলেন ভিক্ষুদের উপর নির্ভরশীল।

বুদ্ধের অনুমতি পেয়ে মহাপ্রজাবতী গৌতমী ভিক্ষুণী হলেন এবং বুদ্ধের সদুপদেশ শুনে অর্হত্ব লাভ করেন। গৌতমীর সাথে যে বহু শাক্য-নারী বৈশালীতে এসেছিলেন, তারাও ভিক্ষুণী হয়ে যথাসময়ে অর্হত্ব পেলেন। দলে দলে তখন রমণীরা ভিক্ষুণী হয়ে সংঘে যোগ দেন। এরূপে প্রতিষ্ঠা হল ভিক্ষুণী সংঘ। এ সংঘের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য আবার অনেক আইন কানুন লিপিবদ্ধ হল। বিনয়পিটক ও ধম্মপদ-অট্ঠকথায় এসবের বিবরণ মেলে।

পূর্বেই বলেছি বুদ্ধ নারীদের সংঘে প্রবেশাধিকার দিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। ভিক্ষুদের ও জনসাধারণের সহিত ভিক্ষুণীদের অবাধ মেলামেশায় কালক্রমে নানা দুর্নীতির সৃষ্টি হয়। পালি সুত্তবিভঙ্গ ও চুল্লবগ্‌গে এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ভিক্ষুণীদের সম্বন্ধে বুদ্ধের আশঙ্কা ও ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ আকার ধারণ করেছিল তার আরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব

পূর্বে বলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধ ছ'বছর কঠোর সাধনার পর বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং এ সত্য জগতের হিতের জন্য প্রচার করেন। তাঁর এ অমোঘ বাণী জনসাধারণের মনে এনেছিল অপূর্ব সাড়া। ত্রিপিটক গ্রন্থে এ সত্য বা তাঁব সার্থক শিক্ষা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ জটিল ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। কেবল উচ্চ সাধকেরাই এটি উপলব্ধি করতে পারেন। পরবর্তীকালে এ দুরধিগম্য তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধির জন্য বহু টীকা বা ভাষ্য রচিত হয়। এ গ্রন্থগুলি বুদ্ধের চিন্তাধারাকে জনসাধারণের নিকট পরিচিত করে তোলে।

ভগবান তথাগতের চিন্তাধারার এখানে একটু আলোচনা করা হচ্ছে। বারাণসীর মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) তাঁর পূর্বপরিচিত পাঁচজন (পঞ্চবর্গীয়) ভিক্ষুদের[১] তিনি যে উপদেশ দেন তা ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র নামে সুপরিচিত। এতে চারিটি গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও নিরোধগামী মার্গ। এগুলো আর্যসত্য বা শ্রেষ্ঠসত্য নামে খ্যাত। চতুরাযসত্যে যে সাধকের জ্ঞান লাভ হয়েছে তাকে বলা হয় আর্য। পালি সাহিত্য হতে নির্বাণ লাভের চারিটি স্তরের কথা জানা যায়, যথা—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্ব। যিনি নির্বাণ লাভের জন্য সাধনার স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছেন তাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন। যাকে নির্বাণ লাভের জন্য ইহজগতে আর একবার মাত্র জন্ম নিতে হয়—তাকে সকৃদাগামী বলা হয়। যাকে নির্বাণ লাভের জন্য আর জন্ম নিতে হয় না তাকে অনাগামী আখ্যা দেওয়া হয়। 'যিনি পরম পদ নির্বাণ লাভ করেন তিনি হন অর্হৎ। ভগবান বুদ্ধ এ চতুরার্যসত্যের ব্যাখ্যা বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশদভাবে করেছেন। তিনি বলেন, জীবন দুঃখময়। জাগতিক সুখ দুঃখ সবই ক্ষণস্থায়ী সুতরাং এরা ক্লেশদায়ক। তাই বার বার তিনি বলেছেন প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করাই দুঃখ। পুনর্জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের উৎপত্তির কারণ।

১। দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১৮

পুনর্জন্ম রোধ করলে হয় দুঃখের অবসান। সুতরাং নির্বাণ উপলব্ধি করে পুনর্জন্ম রোধই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয় সত্য অর্থাৎ সমুদয় সত্য বুদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা কার্যকারণনীতি হতে উদ্ভূত। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সবই পরিবর্তনশীল। অতএব জীবের দুঃখ কারণসম্ভূত। পূর্বেই বলা হয়েছে তথাগতের মতে বার বার পুনর্জন্মই দুঃখ। পুনর্জন্মেব আবার কারণ হচ্ছে সাংসারিক জীবনের প্রতি আসক্তি। এ আসক্তি আসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন—এ ছ'টি ইন্দ্রিয় হতে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। এ জ্ঞানের অভাবেই জগতে বস্তুর প্রতি আসক্তি আসে। আসক্তির দরুণ আমাদের দৃষ্টি বিপর্যয় হয়। যাকে দর্শনে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান। সুতরাং অবিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞানেব অভাবই দুঃখের উৎপত্তির কারণ। তৃতীয় বা নিরোধ সত্য দ্বিতীয় বা দুঃখ কারণসম্ভূত হতে অনুমান করা হয়। দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায় পুনর্জন্ম নিরোধ। যাকে বৌদ্ধদর্শনে বলা হয় নির্বাণ। চতুর্থ সত্য বা মার্গসত্যেব জ্ঞান যখন লাভ হয়, তখন দুঃখ উপলব্ধির কারণ সমূহের জ্ঞান হয়। ত্রিপিটকে এ সত্যের যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায়। চতুর্থ আর্যসত্য—মধ্যম মার্গ বলে কথিত। অসংযত ভোগ বা কঠোর তপস্যা উভয়ই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। প্রকৃত সাধক এ'দুটি পন্থা পরিহার করেন। মধ্যম মার্গই বৌদ্ধ সাহিত্যে আবার আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে কথিত। আটটি অঙ্গ আছে বলে অষ্টাঙ্গিক বলা হয়। অঙ্গ অর্থ হচ্ছে করণ, উপকরণ প্রভৃতি। এ আটটি অঙ্গ বা সাধনার উপায়, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে চতুরার্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান। রূপ, শব্দ, গন্ধ, বস, স্পর্শ ও কামগুণ পরিহার করা এবং মৈত্রীভাব ও করুণা ভাব উৎপাদন করাই সম্যক্ সঙ্কল্প। মিথ্যাকথা, কটুভাষণ, মর্মচ্ছেদী বাক্য ও নিবর্থক আলাপ হতে বিরত থাকাই সম্যক বাক্য। জীবহত্যা, চৌর্য ও ব্যভিচার হতে বিরতি সম্যক্ কর্ম। অসদুপায়ে জীবনযাপন না করে সৎজীবিকার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই সম্যক্ জীবিকা। অনুৎপন্ন পাপ পরিহার ও কুশলের উৎপাদন এবং উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধি সম্যক্ প্রচেষ্টা। কায় ও মনের ধর্মসমূহ সর্বদা স্মরণ রাখাই সম্যক্ স্মৃতি। চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি।

সম্যক্ সমাধি মনের চঞ্চলতা দূর করে। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি ভেদে এ মার্গ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। এ অষ্টাঙ্গিকমার্গের অনুশীলনে জীবের তৃষ্ণা ও অবিদ্যা বিদূরিত হয় এবং পরিশেষে নির্বাণ উপলব্ধি করা যায়। সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভের এটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

চতুরার্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র। দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বানসুত্তে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—'চতুন্নং ভিকখবে অরিয়সচ্চানং অননুবোধা অপ্পটিবেধা এব-মিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ'—চারি আর্যসত্যের জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবের জন্য আমাকে ও তোমাদিগকে জন্ম হতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করতে হয়েছে। এ সত্যের অনুপলব্ধির জন্যই জীব সংসারে বারবার আনাগোনা করে এবং অশেষ দুঃখ ভোগ করে। চতুরার্যসত্যের যে ব্যাখ্যা আগে দেওয়া হলো—এ ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রে মেলে। এ সত্যের আরেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চিকিৎসা শাস্ত্রে। যোগসূত্রেও আবার চতরার্য-সত্যের আভাস মেলে। রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য—এ চারিটি হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল সূত্র। যোগসূত্রে আছে সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। এ হতে বেশ বোঝা যায় চতুরার্যসত্য হচ্ছে সমস্ত পার্থিব বস্তুকে বা কোন সত্যকে চাব ভাগে পরীক্ষা করার একটি ধারামাত্র। সুতরাং দুঃখ এ কথাটির বদলে আমরা যে কোন জিনিষ নিতে পারি এবং তাকে চার ভাগে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। মোট কথা, কোন বস্তুকে চারটি দৃষ্টিকোণ হতে পবীক্ষা করাই এ সত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ভারতের দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই আত্মাব অস্তিত্ব স্বীকার কবেন। গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রচার করলেন অনাত্মবাদ। আত্মা নিত্য, ধ্রুব ও অপরিবর্তনশীল—ইহা অন্ধবিশ্বাস। তিনি বলেন জীব—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এ পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। যেমন রথ বলতে চক্র, ধ্বজ, রশ্মি, প্রতলি, আসন ইত্যাদির সমষ্টিকে বোঝায়। দীপশিখা বলতে বিভিন্ন কালের দীপশিখার সমষ্টিকে বোঝায়। সেরূপ এ পাঁচটি স্কন্ধের সংমিশ্রণে আত্মবোধ উৎপন্ন হয়। উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে আত্মা নামে কোন সৎ বস্তু পাওয়া যায় না। এগুলি অনিত্য ও পরিবর্তনশীল—সুতরাং সর্ববিধ ক্লেশের কারণ। ভারতের অন্যান্য ধর্মমতের প্রভেদ এই আত্মবাদে। বুদ্ধ কর্মবাদে অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্মের কর্ম গত বা ভবিষ্যৎ জন্মের কর্মের সহিত

ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কর্ম একদিকে যেমন সদ্য ফল প্রসব করে অন্যদিকে তেমনি জীবের ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করে। জগতের সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী—কোন বস্তুই দুই মুহূর্তের জন্য এক নহে—যে মুহূর্তেই যার উৎপত্তি পর মুহূর্তেই তার বিনাশ। মানুষ যেমন বীজ বপন করে তার ফলও পায় তেমন। মানুষের মধ্যে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সবল, কেহ দুর্বল, কেহ দুষ্প্রজ্ঞ, কেহ প্রজ্ঞাবান—এই নানাবিধ ভেদের কারণ হচ্ছে ঐ কর্মই। আবার বৃক্ষাদির দিকে যদি তাকানো যায়—তাহলে দেখা যাবে—সব বৃক্ষই সমান নয়। কোনটির ফল তিক্ত, কোনটির লোণা, কোনটির বা মধুর। মানুষের ভিতর যেমন কর্মবীজের ভেদ, বৃক্ষের মধ্যে তেমনি মূলবীজের ভেদ—এসব পার্থক্যের কারণ। ভগবান বুদ্ধ কর্মের উপর জোর দিয়ে বলেন—

—কম্মস্সকোম্হি, কম্মদায়াদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্সামি—

কর্মই আমার সুহৃৎ, কর্মই আমার উত্তরাধিকারী, কর্মই আমার গতি, কর্মই, আমার বন্ধু, কর্মই আমার আশ্রয়, কল্যাণ বা পাপ যে কর্মই আমি করি সেটির উত্তরাধিকারী হবো। বৌদ্ধধর্মে কর্মের যতটা প্রাধান্য দেখা যায় ততটা আর কোথাও না।

প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণনীতি ভগবান বুদ্ধের ভারতীয় দর্শনে একটি সার্থক অবদান। প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের ধাতুগত অর্থ—একটির উপর নির্ভর করে আর একটির উৎপত্তি। পালিশাস্ত্রে ইহার অর্থ করা হয়েছে—ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্সুপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি[১]—এটা হলে এটা হয়, এটার উৎপত্তি হতে এটার উৎপত্তি। ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়তা, তথতা, অবিতথতা ও ইদপ্রত্যয়তা বলেও ইহা খ্যাত। নাগার্জুনের মাধ্যমিকসূত্রের চন্দ্রকীর্তি বিরচিত প্রসন্নপদা নামক ভাষ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্রব্য মাত্রেই তার উৎপত্তির জন্য কতকগুলি কারণ সমষ্টির উপর নির্ভর করে। উৎপন্ন দ্রব্যের যখন নিজের স্বতন্ত্র উৎপত্তির কোন ক্ষমতা থাকে না তার তখন সত্বাও থাকে না। সুতরাং ইহা অশাশ্বত ও দুঃখের কারণ। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণনীতির আবার বারটি অঙ্গ বা পদ—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ,

---

১। অস্মিন্ সতিদং ভবতি, অস্যোৎপাদাৎ ইদমুৎপদ্যতে।

ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরাব্যাধিমরণশোকাদি। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দূরীকরণে দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদনয়কে চক্রাকারে দেখান হয়। এই নয়ের বারটি পদের কোনটিকে আদি বা অন্ত বলা চলে না। চক্রের যে কোন পদ হতে আরম্ভ করলে এর কাজ লক্ষ্য হয়। এ নীতি আবার চার ভাগে বিভক্ত—চারিটি সংক্ষেপ, ত্রিকাল, বিংশতি আকার ও ত্রিসন্ধি। চারিটি সংক্ষেপ—অবিদ্যা ও সংস্কার একটি সংক্ষেপ। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা একটি সংক্ষেপ। তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব একটি সংক্ষেপ। জন্মমরণাদি একটি সংক্ষেপ। ত্রিকাল—অবিদ্যাও সংস্কার অতীতকালীয়। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব বর্তমানকালীয়। জন্মমবণাদি ভবিষ্যৎকালীয়। বিংশতি আকার—অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব অতীতকালীয় কর্মবর্ত। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা বর্তমান-কালীয় বিপাকবর্ত। তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার বর্তমান কর্মবর্ত। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা ভবিষ্যং বিপাকবর্ত। ত্রিসন্ধি—সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন ও স্পর্শ একসন্ধি। বেদনা ও তৃষ্ণা এক সন্ধি। ভব ও জন্ম এক সন্ধি। সুত্তপিটকের মজ্ঝিমনিকায়ে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—যো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্‌সতি সো ধম্মং পস্‌সতি, যো ধম্মং পস্‌সতি সো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্‌সতি—যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন তিনি ধর্মকে দেখেন। যিনি ধর্মকে দেখেন তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন। অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। আবার ধর্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব জানা যায়। প্রতীত্যসমুৎ-পাদে ও ধর্মে কোন প্রভেদ নাই। দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধ প্রদর্শনই এ নীতির বৈশিষ্ট্য। এটি বৌদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র চাবিকাটি। পরবর্তীকালে দার্শনিক-প্রবর নাগার্জুনের সমগ্র দর্শনই এই নীতির উপর স্থাপিত হয়।

গৌতমবুদ্ধ সর্বদা তাঁর শিষ্যদের আত্মনির্ভর হতে, জ্ঞানসঞ্চয় করতে ও সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাব দেখাতে উপদেশ দিতেন। তাঁর উচ্চ আদর্শ, বিশ্বজনীন প্রেম, সহনশীলতা ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান—একদিন বিশ্ববাসীকে যুগপৎ সচকিত ও আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর এই বাণী কলহে উন্মত্ত দেশবাসীর অন্তরে চিরশান্তি ও সুখ আবার ফিরিয়ে আনবে।

বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট উপদেশাবলী : ভগবান বুদ্ধের দেশনাবলী পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। এখানে তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। আশা করা যায় তা থেকে তথাগতের মতবাদের একটা মোটামুটি ধারণা করা যাবে।

সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা,
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং।

—সর্বপ্রকার পাপ হতে নিবৃত্তি, পুণ্যানুষ্ঠান, আপনচিত্তের বিশোধন—এই-ই বুদ্ধগণের অনুশাসন বা শিক্ষা।—এই গাথাটিতে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের ধর্মবীজ।

যং করোতি নরো কম্মং কল্যাণং যদি পাপকং,
তস্‌স তস্‌সেব দায়াদো যং যং কম্মং পকুব্বতি।

—মানুষ সৎ বা অসৎ যে কর্ম করে তাকে সেই সেই কর্মের ফলভোগ করতে হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব কর্মফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে কৃত কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।

ধম্মো হবে রক্‌খতি ধম্মচারিং
ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহাতি,
এসানিসংসো ধম্মো সুচিণ্ণে
ন দুগ্‌গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী
নহি ধম্মো অধম্মো চ উভো সমবিপাকিনো,
অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাপেতি সুগতিং।

—ধর্মাচারণকারীকে ধর্মই রক্ষা করে আর সুচরিত ধর্ম সুখ দেয়। সুচরিত ধর্মের ফলে ধর্মাচরণকারী কখন দুঃখ পায় না—এ হচ্ছে ধর্মের ফল। ধর্ম ও অধর্ম সমান ফলদায়ক নহে। অধর্ম নরক ভোগ করায় আর ধর্ম স্বর্গ সুখ দেয়।

ধর্মাচরণের ফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যিনি সর্বদা ধর্মসাধনায় নিমগ্ন থাকেন তাঁর ধর্ম হতে কখন পতন হতে পারে না—তাঁকে আর দুঃখ যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয় না।

তমেব বাচং ভাসেয্য যায়ত্তানং ন তাপয়ে,
পরে চ ন বিহিংসেয্য সা বে বাচা সুভাসিতা।

পিয়বাচমেব ভাসেয্য যা বাচা পটিনন্দিতা,
যং অনাদায় পাপানি পরেসং ভাসতে পিয়ং ॥

—যা নিজেকে পীড়া দেয় না সেরূপ বাক্য বলবে, যা অপরকে কষ্ট দেয় না সেই বাক্যই উত্তম। যা সকলকে আনন্দ দেয় সেরূপ বাক্য প্রয়োগ করবে—যে বাক্য অপরের অনিষ্টদায়ক না হয়ে প্রিয় হয় সেরূপ বাক্য বলবে।

মধুর ও মৈত্রীপূর্ণ বাক্যের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—মধুরভাষী সকলের প্রিয় হয়।

ন দীঘমাযুং লভতে ধনেন
ন চাপি বিত্তেন জরং বিহন্তি,
অপ্পং হি তং জীবিতমাহু ধীরা,
অস্‌সসতং বিপরিণামধম্মং।

--টাকা কড়িব দ্বারা কেউ দীর্ঘায়ু লাভ কবতে পারে না, সম্পত্তির দ্বারা কেউ বার্ধক্য ধ্বংস করতে পারে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন—জীবন ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—সর্বং অনিত্যম্, সর্বং অনাত্মং, সর্বং ক্ষণিকম্। এর মধ্যেই মূল বুদ্ধবচনের সম্যক্ সন্ধান মেলে।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং।

—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দানের দ্বারা জয় করবে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।

এখানে ক্রোধ পরিহারের কথা বলা হয়েছে, কারণ ক্রোধ মানুষের অশেষ অনিষ্ট সাধন করে।

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো।

কখনও শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা দমন করা যায় না। মৈত্রীর দ্বারাই শত্রুতা উপশম করা যায়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

মৈত্রীর দ্বারা শত্রুতা দমন করা যায়—শত্রুতা দ্বারা নহে।

সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি
সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,
সব্বং রতিং ধম্মরতী জিনাতি
তণ্হক্‌খয়ো সব্বদুক্‌খং জিনাতি।

—ধর্মদান সর্ব দানকে পরাজিত করে, ধর্মরস সর্ব রসকে পরাভূত করে, ধর্মরতি সর্বরতিকে জয় করে, তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখকে পরাভূত করে।

এখানে ধর্মদানের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সর্বপ্রকার দান অপেক্ষা ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ।

যো পাণভূতানি অহেঠয়ং চরং,
পরূপবাদা ন করোতি পাপং।
ভীরুং পসংসন্তি ন তত্থ সূরং,
ভয়া হি সন্তো ন করোন্তি পাপং।

—যিনি প্রাণীদের প্রতি অহিংস হইয়া বিচরণ করেন, পরনিন্দা ভয়ে যিনি পাপ কাজ করেন না—সেই ধর্মভীরু ও সাহসী ব্যক্তিই প্রশংসার যোগ্য। কখনও পাপ ভয়ে সাধুরা পাপাচরণ করেন না।

—সৎ পুরুষেরা সর্বদাই পাপ কাজ হতে বিরত থাকেন।

কম্মং বিজ্জা চ ধম্মো চ সীলং জীবিতমুত্তমং।
এতেন মচ্চা সুজ্ঝন্তি, ন গোত্তেন ধনেন চ॥

—কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম, শীল ও সৎ জীবন দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করা যায়—গোত্র বা ধনের দ্বারা নহে।

সৎ জীবন ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যায় না।

অত্তান'ব কতং পাপং অত্তনা সংকিলিস্সতি,
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনা'ব বিসুজ্ঝতি,
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাঞ্‌ঞো অঞ্‌ঞং বিসোধয়ে।

—নিজের কৃত পাপে নিজেই সংক্লিষ্ট হয়। নিজে পাপ না করলে নিজেই বিশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি। কেহ কাহাকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।

পাপ বা পুণ্য কাজ নিজের উপরই নির্ভর করে।

মাতাপিতু উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

—মাতা পিতার সেবা, স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন এবং শান্তিপূর্ণ জীবিকা—ইহাই সর্বোত্তম মঙ্গল।

সেবা ও উত্তম জীবিকাই মঙ্গল।

দিট্‌ঠা বা যে বা অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

—দৃষ্ট, অদৃষ্ট, দূরবাসী, সমীপবাসী—যারা জন্মেছে, যারা জন্মিবে সকল সত্ত্বই সুখী হউক।

মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

—মাতা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে তাব জীবন দিয়ে বক্ষা কবে, সেরূপ সকল প্রাণীব প্রতি মৈত্রীভাব উৎপাদন করতে হয়।

উক্ত দুটি শ্লোকে প্রাণীদের প্রতি অপাব মৈত্রীভাবেব কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে,
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স,
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্‌পদেসো,
যত্থট্‌ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা।

—অন্তরীক্ষে, সমুদ্রে কিংবা পর্বতগুহায় জগতে এমন কোন স্থান নেই, যেখানে গেলে পাপের ফল হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

জগতেব কোন স্থানই পাপীকে রক্ষা কবতে পারে না।

পোরাণমেতং অতুল, নে'তং অজ্জতনামিব,
নিন্দন্তি, তুণ্‌হিমাসীনং নিন্দন্তি বহুভাণিনং,
মিতভাণিনম্পি নিন্দন্তি নত্থি লোকে অনিন্দিতো।

—হে অতুল, ইহা (নিন্দ-প্রশংসা) অতি প্রাচীন প্রথা। ইহা শুধু আধুনিক নহে। লোকে তুষ্ণীভূতকে নিন্দা করে, বহুভাষীকে নিন্দা করে, আবার পরিমিত ভাষীকেও নিন্দা করে। জগতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেহ নেই।

জগতে নিন্দাব হাত হতে কেহ রক্ষা পায না।

ভজন্তি সেবন্তি চ কারণত্থা
নিক্কাবণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা,
অত্তট্ঠপ্‌ঞ্‌ঞা অসুচী মনুস্‌সা,
একো চবে খগ্‌গবিসাণকপ্পো।

—উদ্দেশ্য নিযে মানুষ অন্যেব সেবা ও স্তব কবে। উদ্দেশ্যহীন মিত্র আজকাল দুর্লভ। মানুষ স্বার্থপব ও দোষযুক্ত। সুতবাং গণ্ডাবের মত একাকী বিচবণ কবাই শ্রেয।

এটি পালি সুত্তনিপাতেব খগ্‌গবিসাণসুত্তেব একটি গাথা। অনেকেব মতে এই সূত্রটির অনুপ্রেবণায কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলবে'—এ গানটি রচনা কবেন।

মধু'ব মঞ্‌ঞতী বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতী পাপং অথ বালো দুকখং নিগচ্ছতি।

যতক্ষণ পাপ পবিপক্ক না হয ততক্ষণ মূর্খেবা উহাকে মধুব বলে মনে কবে। কিন্তু যখন পাপ পবিপক্ক হয তখন তাবা দুঃখ পায।

পেমতো জাযতে সোকো পেমতো জাযতে ভযং,
পেমতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভযং।

প্রেম হতে শোক উৎপন্ন হয। প্রেম হতে ভয জন্মে। যিনি প্রেম হতে মুক্ত, তাঁর কোন শোক থাকে না, তাঁর কেমন কবে ভয থাকবে?

উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

উত্থিত হওযা উচিত। প্রমত্ত হওযা উচিত নহে। ধর্মাচবণ কবাই কর্তব্য। ধর্মাচরণকারী ইহলোকে ও পবলোকে সুখে থাকে।

বযধম্মা সংখারা, অপ্‌পমাদেন সম্পাদেথ।

—যা কিছু সংস্কৃত বা সৃষ্ট তা ব্যয় ধর্মের অধীন অর্থাৎ অনিত্য। অপ্রমত্ত হয়ে কাজ কর।

এটিই ভগবান বুদ্ধের শেষ উপদেশ বলে জানা যায।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের প্রসার

সমসাময়িক রাজন্য ও জাতিবর্গ—রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায় প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য ভিন্ন কোন ধর্মই জগতে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারে না—একথা অনস্বীকার্য। আর বৌদ্ধধর্মের এতো প্রচার ও প্রসারের মূলেও এই রাজশক্তির আশ্রয় ও সহায়তা। ধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধদেব যে সব রাজন্যবর্গের সক্রিয় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এখানে তাঁদেরই বিশেষ কয়েক জনের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

(১) **বিম্বিসার**—মগধরাজ্যের ইনি একজন প্রখ্যাত রাজা। বোধিলাভের দ্বিতীয় বছরে বুদ্ধদেব যখন মগধবাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন বিম্বিসার তাঁকে যথোচিতভাবে সম্বর্ধিত করেন। মগধরাজ বিম্বিসার ভগবানের নবলব্ধ ধর্মবাণী শ্রবণের জন্য প্রার্থনা করলে তথাগত রাজাকে দান, শীল ও স্বর্গ সম্বন্ধে সরলভাবে শিক্ষা দেন এবং চতুবার্যসত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতির উপদেশ দেন। এইভাবে মগধরাজ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তথাগত বুদ্ধের চরণাশ্রিত হন। সংঘের কল্যাণার্থে ও বাজা বিম্বিসাবের অনুপ্রেরণায় তথাগত নানারূপ নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ কবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভিক্ষুদের উপোসথ ব্রত উল্লেখ করা যেতে পাবে। কথিত আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ প্রত্যেক পক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতিতে সম্মিলিত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা এ সমস্ত ধর্মালোচনা শুনে সে সব সম্প্রদায়ের আচার্যদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁদের ধর্মে দীক্ষিত হত। রাজা বিম্বিসার এটি লক্ষ্য করে ভিক্ষুদেরও ঐ সব তিথিতে ধর্মালোচনার সুবিধাদানের জন্য ভগবান তথাগতের নিকট অনুমতি চান। ভগবান তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং ভিক্ষুদের জন্য উপোসথের ব্যবস্থা করেন। রাজার নির্দেশে এই বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হন বৈদ্যরাজ জীবক। এভাবে তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নানারূপ সুযোগ সুবিধার মধ্যে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতেন। তাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় বিম্বিসারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ত্বরান্বিত হয়েছিল।

(২) **অজাতশত্রু**—ইনি মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র ও বুদ্ধদেবের সমসাময়িকদের মধ্যে কনিষ্ঠ। কথিত আছে, দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতাকে কৌশলে হত্যা করেন। বুদ্ধদেবের ৭২ বছর বয়সের সময়ে তিনি রাজ-সিংহাসনে বসেন। প্রথমে তিনি বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন—অবশ্য এই বিরোধিতার মূল কারণ বুদ্ধেব শ্যালক দেবদত্ত। ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েও বুদ্ধের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থাকতেন এবং অজাতশত্রু সেই বিরুদ্ধতাচারণে সহায়তা করতেন। আসল কথা, রাজা দেবদত্তের প্ররোচনাতেই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পিতা বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অনুতাপের তুষানল তাঁর চিত্তকে দগ্ধ করায় তিনি অশান্ত হয়ে ওঠেন। তবে বৈদ্যরাজ জীবকের পরামর্শে তিনি আশ্রয় নেন মহামানব তথাগতের—প্রার্থনা করেন ধর্মোপদেশ, দীক্ষিত হন বৌদ্ধধর্মে। এ ভাবে বুদ্ধদেবের মহাপবিনির্বাণের এক বছর পূর্বেই তিনি হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেবের এক প্রধান ভক্ত। আর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম সংগীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রেখে যান এক অবিস্মরণীয় নাম।

(৩) **প্রসেনজিৎ**—কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন বুদ্ধের সমবয়সী। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করায় তিনি অশেষ গর্ব অনুভব করতেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকে তিনি এই ধর্মেব প্রতি এমন বিশ্বাসী ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এই ধর্মের প্রসারে অন্যতম সহায় হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ও পারিবারিক প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সময়েই তিনি বুদ্ধেব উপদেশ নিতেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের জন্য তিনি রাজাকারাম নামে একটি বিহার নির্মাণ করান। সুত্তপিটকের মজ্ঝিমনিকায় হতে জানা যায় শেষ বয়সে রাজা প্রসেনজিৎ সদ্ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হন। বৌদ্ধধর্মেব প্রতি সহানুভূতি ও সহায়তা বিষয়ে তাঁর স্থান বিম্বিসারের পরেই।

(৪) **প্রদ্যোত**—ইনি ছিলেন অবন্তীব রাজা। এঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। মহাকাত্যায়নের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি এ ধর্মের প্রতি গভীর আস্থাবান হন। এইভাবে অবন্তী বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে যে সমস্ত প্রখ্যাত ভিক্ষু বাস করতেন তাঁদের মধ্যে অভয়কুমার, ঋষিদত্ত, ধর্মপাল ও মহাকাত্যায়ন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) **উদয়ন**—ইনি কৌশম্বীর রাজা। রাজা উদয়ন প্রথমে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ধর্মের ঘোর বিরোধী থাকলেও শেষে তিনিই হয়ে ওঠেন বুদ্ধের পরম ভক্ত। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবার পর তিনি নিজ প্রাসাদে ভিক্ষুদের প্রত্যহ ভোজনের ব্যবস্থা করেন এবং এ সব বিষয়ে তাঁর বদান্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংযুক্ত-নিকায় হতে জানা যায় রাজা উদয়ন ভিক্ষু পিণ্ডোলভরদ্বাজের ধর্মোপদেশে মুগ্ধ হয়ে এই ধর্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহ ও শ্রাবস্তীর পরেই কৌশম্বীর স্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে জানা যায়। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায়ও কয়েকটি বৌদ্ধবিহার এখানে নির্মিত হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধদেব অনেক সময় এখানে বসবাস করে জন-সাধারণকে ধর্মোপদেশ দিতেন। কৌশম্বীতে অবস্থানকালে সংঘের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তিনি যে সমস্ত নিয়ম-কানুন বেঁধে দেন তার মধ্যে প্রত্যেক ভিক্ষুর অবশ্য পঠনীয় প্রাতিমোক্ষসূত্রের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখযোগ্য।

রাজা প্রদ্যোত ও উদযন সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তা হলেও এ দু'জনের বৌদ্ধধর্মেব ও সংঘের প্রতি কার্যকলাপ পূর্বকথিত রাজাদের তুলনায় অতি নগণ্য নহে। তাদের এই ধর্মগ্রহণ ধর্মপ্রসারে যে বিশেষ সহায়তা করে তাতে কোন সন্দেহই নাই।

এখন কয়েকটি প্রধান প্রধান জাতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে—যাদের কাছে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মের উন্নতি ও প্রসারে প্রভূত সহায়তা পেয়েছিলেন।

(১) **শাক্য**—শাক্যরা ছিলেন বুদ্ধের জ্ঞাতি অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভক্ত। তাই প্রথমে তাঁরা ছিলেন এই ধর্মের ঘোর বিরোধী। বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব যখন তাঁর জন্মভূমি পরিদর্শনে যান শাক্যরা প্রথমে তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে ভুলে যান। তারপব দিন তাঁর শিষ্যরা ভিক্ষার্থে বাহির হলে ভিক্ষা দিতেও অসম্মত হন। এ ছাড়াও জানা যায় কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেবের রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান না হওয়ায় অবশেষে ভরণ্ডু কালামের আশ্রমে তার ব্যবস্থা করতে হয়। বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতি শাক্যদের যে কিরূপ মনোভাব ছিল তা এ থেকেই বেশ বোঝা যায়। শাক্যদের তাঁর ধর্মগ্রহণ করাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করে বুদ্ধদেব এই শাক্যদের বশে আনেন এবং তখনি তাঁরা নেন এই ধর্মে দীক্ষা। তাঁদের মধ্যে আনন্দ, ভদ্রিয়, কিম্বিল ও উপালি প্রভৃতি কয়েকজন বুদ্ধের প্রধান শিষ্যও হয়েছিলেন। অনেক শাক্য রমণীও সংঘে ভিক্ষুণী হয়ে যোগ দেন। পূর্বেই

বলা হয়েছে সংঘে প্রবেশার্থীকে প্রথমে চার মাস পরিবাস পালন করতে হয়, অর্থাৎ চার মাস সব বিষয়ে পরীক্ষাধীন থাকতে হয়। তারপর প্রবেশের অনুমতি মেলে। কিন্তু বুদ্ধের স্বজাতি হওয়ায় শাক্যরা একেবারেই সংঘে যোগ দিতেন।

(২) **লিচ্ছবী**—এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভক্ত। লিচ্ছবীর রাজধানী বৈশালী বুদ্ধেব জীবনের সহিত বেশ ভালভাবে জড়িত। তিনি বহুবার এ নগবী পবিদর্শন কবেছেন এবং মুকুটাগারশালা বিহাবে অবস্থান করতেন। সেকালে বৈশালী জৈনধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানে নিগ্রর্ন্থনাথপুত্রের বেশ একটু প্রতিপত্তি থাকায় বুদ্ধদেবকে ধর্মপ্রচাবে বাধা পেতে হযেছিল। এতো বিরোধিতা সত্বেও তিনি তাঁর অমোঘ বাণীর দ্বাবা লিচ্ছবীদের মন ও হৃদয় জয় করেন এবং এমন কি সামবিক কর্মচারী সীহ বুদ্ধেব দেশনায় মুগ্ধ হয়ে নিগ্রর্ন্থনাথপুত্রের শিষ্যত্ব ত্যাগ করে এই নব ধর্মে দীক্ষিত হন। আব এতে নাথপুত্রের শিষ্যদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওযাব বহু লিচ্ছবী যুবক ক্রমশঃ বুদ্ধের ধর্মমত গ্রহণ কবেন। তাবপর উষ্ট্রদ্ধ তাঁব অনুচববর্গেব সহিত বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে মোহিত হন। ভক্তিব নিদর্শনস্বরূপ লিচ্ছবীবা আবাব মহাবন-কুটাগারশালা, গোশৃঙ্গশালাবন প্রভৃতি কয়েকটি চৈত্য বুদ্ধেব হস্তে অর্পণ করেন। প্রখ্যাত পালি ভাষ্যকাব বুদ্ধঘোষেব মতে এ চৈত্যগুলি ছিল যক্ষ চৈত্য এবং এখানে যক্ষদেরই পূজা হত। কিন্তু পবে এগুলিই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাসেব জন্য বিহারে রূপান্তরিত হয়। গোশৃঙ্গশালাবন ছিল বুদ্ধেব অত্যন্ত প্রিয় বিহাব। এ স্থান থেকে তিনি অনেক সময় উপদেশ দিতেন। শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন এই বিহারে অনেক সময় ধ্যানে কাটাতেন। পালি নিকায়গ্রন্থে লিচ্ছবীদেব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে তেমন কিছু উল্লেখ নাই। অবশ্য কয়েকটি বিশিষ্ট লিচ্ছবীর নাম যেমন মহালি, মহানাম, উগ্রগৃহপতি, নন্দক প্রভৃতিব এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আবার গণিকা আম্রপালী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। আর ভিক্ষুণী সংঘের প্রথম প্রতিষ্ঠা—এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও এখানেই ঘটে। এ ছাড়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের সংযমেব জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত নিয়ম উদ্ভাবন করেন এবং ভিক্ষুদের অবশ্য পঠনীয় পাতিমোক্‌খ গ্রন্থের দশটি সূত্র এখানে লিপিবদ্ধ করেন।

(৩) **মল্ল**—মল্লেরা প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্মের পোষকতা না করে বিরোধিতা করতেন। কুশীনগর ও পাবা—মল্লদের দুটি প্রধান নগর। বুদ্ধদেবের একবার কুশীনগর পরিদর্শন উপলক্ষে মল্লনায়কগণ আদেশ জারী করেন কোন মল্ল বুদ্ধদেবের

অভ্যর্থনায় যোগদান না করলে তার পাঁচ শ' কার্ষাপণ জরিমানা হবে। এ থেকে বোঝা যায় মল্লদের মধ্যে একটা দল ছিল যারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিরোধী ছিল। বিশিষ্ট মল্লনায়ক মল্ল রোজ প্রথমে অন্য ধর্মের ভক্ত হলেও পরে বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশ শুনে তাঁর ধর্মেই দীক্ষা নেন। তারপর অন্যান্য মল্লনেতা যেমন দর্ব মল্লপুত্র, চুন্দ কর্মকারপুত্র, পুকুর্ষ, খণ্ডসুমন, ভদ্রক, রাশিয় প্রভৃতিও এই বৌদ্ধধর্মেই দীক্ষিত হন। কিন্তু দর্ব মল্লপুত্র ও চুন্দক বৌদ্ধ সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। পালি নিকায়গ্রন্থ হতে জানা যায় বুদ্ধদেব কুশীনগর ও পাবায় মল্লদের বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেন। পাবার মল্লরা প্রসিদ্ধ উব্ভটক চৈত্যটি নির্মাণ করে অভিষেকার্থ বুদ্ধদেবকে আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব সেখানে তাঁর শিষ্যদের সাথে এক রাত কাটান এবং তাঁর এক অন্যতম শিষ্য শারিপুত্র এখানে সংগীতিসুত্ত পাঠ কবেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মল্লরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই মল্লদের কুশীনগর বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের স্থান।

(৪) **ভর্গ (ভগ্‌গ)**—ভর্গ (ভগ্‌গ) জাতির মধ্যেও বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম প্রচাব কবতে পেবেছিলেন। এই ভর্গদের বাজধানী ছিল সুংসুমাব গিবি। বুদ্ধদেব কয়েকবার প্রচারকার্যের জন্য এই ভর্গে আসেন। তাঁব অমৃতময় বাণী শুনে ভর্গদের যে কযেকজন নায়ক বুদ্ধদেবেব শরণ নিলেন তাঁদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—নকুলপিতা, নকুলমাতা ও বোধিরাজকুমার। বোধিরাজকুমার রাজা উদয়নের পুত্র ছিলেন। ভর্গদের মধ্যে আরও কয়েকজন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য নিকায়গ্রন্থে এঁদেব সম্বন্ধে তেমন কিছু খবর মেলে না। ভর্গদেশে অবস্থানকালে বুদ্ধ বেশীব ভাগ সময়ে সুংসুমারভেসকলাবনমৃগদাব বিহারে বাস করতেন। সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থ পাঠে জানা যায় বুদ্ধদেব নকুলপিতা ও নকুলমাতার উপরোধে গৃহীদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভর্গদের উপদেশ দেন। মজ্ঝিমনিকায় গ্রন্থ হতে আবার জানা যায় বুদ্ধদেব বোধিকুমারের নব নির্মিত কোকনদপ্রাসাদে অবস্থান করে তাঁকে সদ্ধর্মে দীক্ষা দেন। পাতিমোক্‌খসুত্তের কয়েকটি ছোটখাট নিয়মও এখানে লিপিবদ্ধ হয়।

(৫) **কোলিয়**—বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মপ্রচাবে ভর্গদের চেয়ে কোলিয়দের মধ্যে অধিকতর কৃতকার্য হন। কোলিয়দের বসতি শাক্যদের কাছাকাছি ছিল এবং তাছাড়া তাঁরা বুদ্ধের মা ও স্ত্রী সম্পর্কে আত্মীয়ও ছিলেন। শাক্য ও কোলীয়দের মধ্যে একবার নদীর জল নিয়ে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠলে বুদ্ধের মধ্যস্থতায়

তা মিটে যায়। এই দু'দলের অনেকে বুদ্ধের উপদেশ শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সদ্ধর্মে দীক্ষিত হন। পুন্নগোবতিক ও সেনিয়কুক্কুরবতিক নামক দু'জন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীও বুদ্ধের ভক্ত হলেন—তাঁদের যদিও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে অগাধ বিশ্বাস ছিল। অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থ হতে জানা যায় ককুধকোলিয়পুত্র স্থবির মৌদ্‌গল্যায়নের সদ্ধিবিহারিক বা শিক্ষানবীশ ছিলেন। কোলিয়ধীতা সুপ্পবাসা ছিলেন সংঘের একজন বিশিষ্ট দায়িকা। লিচ্ছবী মহালির স্ত্রী সুপ্পবাসা বুদ্ধের আর একজন শিষ্যা ও সংঘের পরমহিতৈষিণী রমণী ছিলেন। তাঁর বাসস্থান সজ্জনেলে বুদ্ধদেব বহুবার গিয়ে ধর্মোপদেশ দেন এবং তার ফলে সেখানকার অনেকে সংসার জীবন ত্যাগ করে সংঘে যোগ দেন।

পূর্বে যে সব জাতির কথা বলা হল এ ছাড়াও দীঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ-সুত্তন্তে কয়েকটি জাতির কথা জানা যায়—যাঁরা বুদ্ধদেবের পুতাস্থির অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যের বিষয় কম জানা গেলেও এ থেকেই বোঝা যায় তথাগতের প্রতি তাঁদের কী গভীর শ্রদ্ধা।

বুদ্ধের পরবর্তীকালের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা—এবাব বুদ্ধেব মহাপরিনির্বাণের পর যে সকল রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি ও বিস্তারে সর্বতোভাবে সহায়তা কবেন তাঁদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হচ্ছে।

শিশুনাগ যুগ—কালাশোক ছিলেন শিশুনাগের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের এক শ' বছর পরে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীতে দ্বিতীয় সংগীতির অধিবেশন হয় এবং বিশেষ করে এই জন্যই তিনি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এই সংগীতির ফলেই বৌদ্ধশাসনে আসে এক বিপ্লব। উৎপত্তি হয় ধর্মে এক নতুন মতবাদের। কালক্রমে আবার একে একে আঠারটির অধিক সম্প্রদায় বা শাখার উৎপত্তি হয়। বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গের দ্বাদশ অধ্যায়ে এই সংগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু রাজা কালাশোকের কোন নাম নেই।

মৌর্যযুগ—প্রাক্‌ অশোক যুগের বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে খুব অল্প কথাই জানা যায়। মহারাজ অশোকের সময় হতেই এ ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞানলাভের সুযোগ হয়। কথিত আছে, পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক তাঁর শত ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিষেকের ন'বছর পর তিনি কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু

যুদ্ধক্ষেত্রের এই শোণিত ধারাই তাঁর জীবনে আনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। যুদ্ধদ্বারা দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে তিনি প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আর বৌদ্ধসংঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তিনি এই ধর্মে অনুরক্ত হন এবং এর একনিষ্ঠ সেবক হয়ে পড়েন। আগে বিহারযাত্রা ছিল সকল রাজাদের ঐশ্বর্যের নিদর্শন। তার পরিবর্তে তিনি প্রবর্তন করেন ধর্মযাত্রা। অশোকের ধর্ম ছিল সরল ও উদার—আদর্শ জীবন ও পুণ্যানুষ্ঠানের উপরই তিনি জোর দেন। তাঁর মতে এগুলিই এজগতে ও পরজগতে সুখ আনে। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচাবী নিযুক্ত করে তাঁদের সাহায্যে দেশে দেশে ও নগরে নগরে এই ধমের অমোঘ বাণী প্রচারের ব্যবস্থা কবেন।

জনসাধারণের নৈতিক উন্নতিব জন্য ও ছিল তাঁর অকুণ্ঠ প্রয়াস। লোকশিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্যে রাজ্যের সর্বত্র সদ্ধর্মেব অনুশাসনগুলি পর্বতগাত্রে, প্রস্তর-স্তম্ভে, গুহায় খোদিত করান। ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে এগুলিব গুরুত্ব বোঝা যায়। দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি ৩৩টি মাত্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। গুরুজনে ভক্তি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দাসদাসীর প্রতি সদ্ব্যবহাব, জীবে দয়া, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও দবিদ্রে দান, জীবনে পবিত্রতা, সত্যবাদিতা ও দানশীলতা ছিল অশোকের ধর্মের সারমর্ম। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল উদারতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর সাম্রাজ্যে সব সম্প্রদায়ের লোকই নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করত আর তিনি সর্ব সম্প্রদায়ের লোককেই অকুণ্ঠচিত্তে দান করতেন। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আজীবিক সম্প্রদায়ের জন্য গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে তাঁর বহু ব্যয়ে কয়েকটি পর্বতগুহা নির্মাণ। প্রবাদ আছে, রাজা অশোক বুদ্ধদেবের দেহধাতুর উপর ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করান। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল জনসাধারণকে সদ্ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা।

রাজ্যাভিষেকের কয়েক বছর পরে রাজা অশোক এই ধর্মের একজন পরম ভক্ত হন। সংঘে ভিক্ষুদের মতানৈক্যের জন্য পাটলিপুত্রে তিনি এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। এই ধর্মসভাই ইতিহাসে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি নামে পরিচিত। এভাবে রাজার প্রচেষ্টায় মতানৈক্যের অবসান ঘটলে তিনি ধর্ম-প্রচারের জন্য ভিক্ষুদের নতুন প্রেরণা দেন। সবশেষে তিনি এই সদ্ধর্ম প্রচারার্থে বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করেন। তাঁর এই ধর্মপ্রচার কেবল ভারতের

বিভিন্নস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুদূর এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশেওপ্রচারকার্য চলেছিল। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বাণী প্রচারার্থে প্রেরিত হন। এইরূপে রাজার ঐকান্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম দেশবিদেশে প্রচারিত হয় এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পবিণত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে রাজা অশোকের নাম তাই চিরস্মরণীয়।

শুঙ্গযুগ—দিব্যাবদান গ্রন্থপাঠে জানা যায় শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধধর্মের স্তূপ, বিহার প্রভৃতি ধ্বংস করেন এবং প্রত্যেক ভিক্ষুর কর্তিত মুণ্ডের জন্য ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন। শুঙ্গেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষপাতী থাকায় এই সময় হতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান ও বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে। কিন্তু কোন দলিলদস্তাবেজ হতে এমন কিছু জানা যায় না যাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় শুঙ্গেবা বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন। বরং চৈত্য ও শিলালিপি থেকে প্রমাণ করা যায় যে, শুঙ্গযুগেও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় হয়। এই সময় সুপরিচিত ভারুত ও সাঁচীস্তূপ প্রভৃতির নির্মাণ সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধিরই পরিচয় দেয়। ভারুত শিলালিপি থেকে জানা যায় এখানকাব রাজপরিবার ও জনগণ এই স্তূপে দান করতেন। সাঁচী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ এবং লৌরিয়া নন্দনগড শুঙ্গযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

ইন্দো-গ্রীক যুগ—উত্তর পশ্চিম ভারত ও আফগানিস্থানেব রাজাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজা মিনান্দার বৌদ্ধসংঘের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তাঁব ধর্মানুরাগ ও ধর্মপ্রচারের উদ্যম ও অধ্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিলিন্দপঞ্‌হ নামক বিখ্যাত পালিগ্রন্থে রাজা মিনান্দাব মিলিন্দ নামে খ্যাত। এই গ্রন্থ হতে জানা যায় তিনি নাগসেনের নিকট সদ্ধর্মের জটিল তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা শুনেন এবং প্রীত হয়ে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য তিনি একটি গৃহ নির্মাণ করে ভিক্ষু নাগসেনকে দান করেন। রাজা মিলিন্দের মুদ্রায় ধর্মচক্রের ছাপ মেলে। মিলিন্দের সময় ভারতে অনেক গ্রীক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা আবার সদ্ধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। ধর্মরক্ষিত নামে একজন গ্রীক বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপর অপরান্ত প্রদেশে প্রচারের কাজ ন্যস্ত হলো। তাঁর প্রচেষ্টায় ও অঞ্চলের বহু লোক বৌদ্ধধর্মের ভক্ত হল। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বহু মূর্তি ও ভাস্কর্যের

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি গ্রীক শিল্পীদের হস্তস্পর্শ। এ ভাস্কর্য ইন্দোগ্রীক শিল্প নামে খ্যাত।

কুষাণযুগ—মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। কিন্তু শুঙ্গবংশের সময় হোতে একটু ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠল কুষাণ যুগে। রাজা কণিষ্ক এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী। রাজা অশোকের মত ইতিহাসে তিনি একজন সদ্ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক বলে পরিচিত। রাজা কণিষ্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্যের জন্য গুরু পার্শ্বকেব পবামর্শে জলন্ধরে এক মহাসভা আহ্বান করেন। ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি নামে পরিচিত। সভায় ত্রিপিটকের মূল-সূত্রগুলি স্থিরীকৃত হল। তারপব রচিত হল সংকলিত শাস্ত্রের ওপর বিভাষা বা টীকাগ্রন্থ। এইখানে উৎপত্তি হল আর একটা নতুন ধর্মমতের। এই মতের আখ্যা হল মহাযান। এ নতুন ধর্মমত বা মহাযান বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির পর্যায়ের নির্দেশ করে। রাজা কণিষ্ক মহাযান মত সমর্থন করলেন। রাজত-রংগিণী গ্রন্থপাঠে জানা যায় রাজা কণিষ্ক অনেকগুলি স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করান। এমন কি ভিক্ষুদের বসবাসেব জন্য পেশোয়াবের প্রসিদ্ধ কণিষ্ক মহাবিহারটিও নির্মিত হল। রাজা বেশ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অশ্বঘোষ, পার্শ্ব, বসুমিত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যগণ তাঁর যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কবেন। মধ্য-এশিয়া ও চীনদেশে সদ্ধর্ম প্রচারার্থেও ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হল। এরূপে ভারতের বাহিরেও সদ্ধর্ম প্রসার লাভ করল। কণিষ্কের মুদ্রায় অনেক ধর্মের দেবদেবীদের মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় তাঁব উদাব ধর্ম মতবাদেব।

গুপ্তযুগ—গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হয়। গুপ্তরাজাবা ব্রাহ্মণ্যধর্মেব পৃষ্টপোষক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মবিষয়ে উদারতা ছিল। এজন্য তাদেব সময়ে বৌদ্ধধর্ম একেবারে মৃতকল্প হয়ে ওঠেনি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি এ ধর্ম সঞ্জীবিত ও গতিশীল ছিল। লিপিমালা ও পর্যটকদের বিবরণী থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম যে সকল গুপ্ত রাজাদের আনুকূল্য লাভ করেছিল তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজার বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে :—

(১) **সমুদ্রগুপ্ত**—তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভক্ত। কিন্তু সকল ধর্মের প্রতি তাঁর উদারতা ছিল। তিনি সিংহরাজ মেঘবর্ণকে একটি বৌদ্ধ বিহার

নির্মাণে অনুমতি দেন। এ থেকে বোঝা যায় তাঁর ধর্ম বিষয়ে উদারতা। তিনি আবার বেশ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুকে তিনি তাঁর অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন।

(২) **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত**—তিনি ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সুযোগ্য পুত্র। ধর্মে বৈষ্ণব ও পরমভাগবত ছিলেন—তাঁর ধর্মান্ধতা ছিল না। এজন্য সব ধর্মই বৈষ্ণব-ধর্মের পাশাপাশি ক্রিয়াশীল ছিল। সাঁচীতে প্রাপ্ত লিপি হতে জানা যায় আম্রকার্দব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কর্মচারী ঈশ্বরবাসক নামে একটি গ্রাম ও কিছু মুদ্রা আর্যসংঘে অর্থাৎ কাকনাদবোট বৌদ্ধবিহারে (সাঁচীর) ভিক্ষুদের আহার ও প্রদীপ জ্বালানোর জন্য দান করেন। উদয়গিরি শিলালিপি হতে জানা যায় রাজসচিব বীরসেন-শাব দেবতা শম্ভুর (শিবের) মন্দিরের জন্য একটি গুহা খনন করান। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়ানের বিবরণীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় পাঞ্জাব ও বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতির এবং মথুরাতে ও জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। এখানে তিনি অনেক বৌদ্ধ ভক্ত ও কুড়িটির অধিক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেখতে পান। আবার পাটলিপুত্র নগরে দু'টি বৌদ্ধ বিহার—একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান সম্প্রদায়ের লক্ষ্য করেন। এ দু'টি বিহারে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। জ্ঞান ও ধর্মসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সেখানে বহু বিদ্যার্থী আসত।

(৩) **প্রথম কুমারগুপ্ত**—তিনি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মঙ্কুয়ার প্রস্তরবর্তি-শিলালিপি হতে জানা যায় ভিক্ষু বুদ্ধমিত্র সকল অশুভ নিবারণের জন্য একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আবার সাঁচীর প্রস্তর শিলালিপিতেও দেখা যায় মনসিদ্ধের পত্নী উপাসিকা হরিস্বামিনী কাকনাদবোট বিহারে ভিক্ষুসংঘের একটি নতুন ভিক্ষুকে প্রত্যহ আহারের জন্য কিছু মুদ্রা দান করেন। এহতে প্রমাণ হয় সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

গুপ্তযুগ ভারতের শিল্পের ইতিহাসে একটি গৌরবময় যুগ। এ সময়ে বহু বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য, বিহার নির্মিত হয়। মথুরা, সারনাথ, নালন্দা, অজন্তা, বাগ প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ শিল্পরসিকদের এগুলির শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ ও মোহিত করে। বৌদ্ধধর্ম এযুগে রাজধর্ম ছিল না। কিন্তু গুপ্তরাজদের যে সকল

ধর্মের প্রতি উদারতা ও শ্রদ্ধাশীলতার জন্য বৌদ্ধধর্মের সাধারণ গতি রুদ্ধ হয়নি।

বর্দ্ধনযুগ—রাজা কণিষ্কের ছ'শ বছর পরে বৌদ্ধধর্ম আবার একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক পেল। সদ্ধর্ম আবার নতুন জীবন লাভ করল। তিনি হচ্ছেন রাজা হর্ষবদ্ধন। রাজা শিবের উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মমত ছিল উদার। তিনি বিদ্বান ও বিদ্বোৎসাহী ছিলেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট প্রভৃতি কবি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। রত্নাবলী, নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক তাঁর রচিত। তাঁর পিতা শিবের উপাসক ছিলেন এবং জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নী বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সকল ধর্মে তাঁর সমান পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শৈবদের জন্য মন্দির এবং বৌদ্ধদের জন্য বিহার নির্মাণ করান। পরবর্তী জীবনে তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সম্রাট অশোকের মত রাজা হর্ষবর্দ্ধন ও চিকিৎসালয়, অতিথিশালা ও রাজপথ নির্মাণ করান। রাজ্যের সর্বত্র পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি করান প্রজাদের সুখের জন্য। তাঁর আদেশে আবার রাজ্য মধ্যে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ হয় ও বহু বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভারতে আসেন। তিনি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করে বহু বৌদ্ধ বিহাব দেখেন এবং অনেক মূল্যবান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুলিপি করেন। হিউয়েন সাঙ-এর সম্বর্দ্ধনার্থ হর্ষবর্দ্ধন কম্বোজে একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে বহু করদরাজা, বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈন ও ব্রাহ্মণ সমবেত হন। সভায় একটি বৃহৎ স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হয়। তারপর ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি আলোচনার পর সম্মেলন সমাপ্ত হয়। উৎসবের পর রাজা হিউয়েন-সাঙকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়াগে আসেন। এখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোক এখানে সমবেত হত। এখানে বুদ্ধমূর্তির পূজা হত এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের দান দেওয়া হত। তারপর সূর্য ও শিবের মূর্তির পূজা হত।

রাজা হর্ষবর্দ্ধন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। সে যুগে নালন্দা ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বহু বিদ্যার্থী ভারতের ও এশিয়ার নানা স্থান হতে আসত। শিক্ষার্থীদের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা ছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করতেন। হিউয়েন-সাঙ এর

বিবরণী পাঠে জানা যায় রাজা নালন্দায় একটি বিহার ও পিতলের মন্দির নির্মাণ করান। আরও জানা যায় রাজার প্রথমে হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। এরূপে দেখা যায় রাজা হর্ষবর্দ্ধনের অনুপ্রেরণায় ম্রিয়মান বৌদ্ধধর্ম কিছুদিন সঞ্জীবিত হল। জীবনে জাগল তার নব চেতনা ও অভ্যুদয়।

পালযুগ—রাজা হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবের পর বৌদ্ধধর্মের আরম্ভ হল দুর্দিন। শতাধিক বছরের উপরও থাকতে হল ম্রিয়মান হয়ে। কিন্তু এরূপে ম্রিয়মান হয়ে পড়লেও তার সত্বার কিছু কিছু চিহ্ন উত্তর ভারত ও কাশ্মীরে পাওয়া যায়। পালরাজাদের আবির্ভাবে আবাব পেল নতুন অনুপ্রেরণা—উঠল সজীব হয়ে। তার হৃতগৌবব ও সমৃদ্ধি ফিরে পেল। যে সকল পালরাজাদেব পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা লাভ করেছিল তাঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে এখানে একটু বলা হচ্ছে।

(১) **গোপাল**—তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসের জন্য তিনি নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করান। বহু বৌদ্ধ আচাযরা তাঁর বেশ আনুকূল্য পেতেন।

(২) **ধর্মপাল**—তিনি ছিলেন গোপালের পুত্র। তিনি মুক্তহস্তে বৌদ্ধসংঘে দান করতেন। প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলার বৌদ্ধবিহার তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিব্বতেব প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বুতোনের মতে ওদন্তপুবী মহাবিহার রাজা ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, তিব্বতের প্রসিদ্ধ সম্যে (Sam-ye) মহাবিহার এ মহাবিহারের আদর্শে নির্মিত। সোমপুরী মহাবিহারও তাঁর প্রতিষ্ঠিত। বিখ্যাত মনীষী হরিভদ্রের আবির্ভাব তাঁর রাজত্বকালে। তাঁর সময়ে আবার বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। রাজা নিজে বৌদ্ধভক্ত হলেও সকল ধর্মের প্রতি তার উদারতা ছিল। ব্রাহ্মণ্য দেবতার পূজার জন্য তিনি কিছু জমি দান করেন। ব্রাহ্মণ গার্গকে আবার সচিব নিযুক্ত করেন।

(৩) **দেবপাল**—তিনিও ছিলেন তাঁর পিতার ন্যায় বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজত্বকালে শৈলেন্দ্রবংশের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করান। রাজা দেবপাল তাঁর অনুরোধে বিহারটি সংরক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন। তাঁর সময়ে বিক্রমশীলা ও সোমপুরী বিহার দুটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঘোস্রাওয়া (Goshrawa) শিলালিপি

হতে নালন্দা মহাবিহার ও সদ্ধর্মের সমৃদ্ধির জন্য রাজার প্রচেষ্টার কথা জানা যায়।

সুতরাং দেখা যায় পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে নতুন শক্তি লাভ করল—যেন ফিরে পেল তার যৌবনশক্তি। ভারতের অন্যান্য স্থানে তার যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল তা থেকে এরূপে এখানে রক্ষা পেল। পালরাজাদেব অনেকেই বৌদ্ধ ভক্ত ছিলেন ও সদ্ধর্মেব পুনরুত্থানের জন্য প্রবল উদ্যম করেন। জানা যায়, পালবাজাদেব সরকারী দলিলদস্তাবেজগুলি বুদ্ধ বন্দনা করে আরম্ভ হত। পালরাজাদের আমলে আবার ত্রৈকুট, দেবীকোট, পণ্ডিত, ফুল্লহরি, পট্টিকেরক, বিক্রমপুরী, জগদ্দল বিহাবগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এযুগে তান্ত্রিক মতবাদ প্রভাবান্বিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। এ তন্ত্রবাদই পরবর্তীকালে তিব্বতে প্রসার লাভ কবে। পালবাজাবাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মেব শেষ পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁদের তিরোভাবেব সাথে অবসান হল রাজকীয় আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা। বৌদ্ধধর্মেব জীবনে আবাব দেখা দিল ঘোব বিপর্যয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধ সম্প্রদায়

ভগবান বুদ্ধ তাঁর কোন উপদেশ লিপিবদ্ধ করে যাননি। গুরুশিষ্যের মুখপরম্পরায় এ সকল উক্তি প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ বৈদিক গ্রন্থ সমূহের মত বুদ্ধবচন রক্ষা করা দূরের কথা, এমন কি তার ভাষ্য সম্বন্ধেও কোন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তে ভগবান বুদ্ধ তাঁর উপদেশের যথেচ্ছ ব্যাখ্যার আশঙ্কা করেন, এবং চারভাবে তাঁর বাণীর সত্য নিরূপণের জন্য শিষ্যদের উপদেশ দেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর মহাপরিনির্বাণের অল্পদিনের মধ্যেই সত্যে পরিণত হয় এবং তাঁর ধর্মমত কালের গতিতে যথেচ্ছ ব্যাখ্যাত হয়ে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এরূপে বুদ্ধের তিরোভাবের কয়েক শ' বছরের মধ্যে সংঘে আঠারোর ও অধিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। অবশ্য এ সমস্ত নানা দল সৃষ্টিতে ধর্মের উন্নতি ও প্রসার ঘটে। ধর্মপ্রচারার্থে এ সমস্ত বিভিন্ন দলগুলি পবম উৎসাহে দেশদেশান্তরে যাত্রা করেন। তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত সময়ভেদব্যূহচক্র, নিকায়ভেদবিভঙ্গব্যাখ্যান, সময়ভেদোপরচনচক্রেনিকায়ভেদোপদেশনসংগ্রহনাম এবং কথাবত্থু, মিলিন্দপঞ্‌হ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ হতে এ সকল সম্প্রদায়েব মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা যায়। গ্রন্থগুলির মধ্যে সময়ভেদব্যূহচক্রই এ বিষয়ের সর্বপ্রকার প্রামাণ্য গ্রন্থ। সম্প্রদায়গুলির আবির্ভাবকাল এখনও সঠিক নির্ণীত হয়নি। মিলিন্দপঞ্‌হের ইংরেজী অনুবাদেব মুখবন্ধে স্যুয়েজন আড ও মিসেস্ রীস্ ডেভিডস্ এব সম্ভাব্য তাবিখ অনুমান করেছেন। কিন্তু এখনও তা সর্বতোভাবে সমর্থন পায়নি।

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের এক শ' বছর পবে বৈশালীর বৃজিপুত্র (বজ্জিপুত্ত) নিজেদের আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম করে সংঘে প্রথম ভেদ আনেন। বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গ নামক গ্রন্থ ও সিংহলী ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় বৈশালীতে দ্বিতীয় সংগীতি আহূত হয় বৈশালীর ভিক্ষুদের দশটি বিনয়বিরুদ্ধ আচারের আলাপ আলোচনার জন্য। তাতে যে সকল বিষয় নিয়ে ভেদ হয়েছিল পালিতে তাকে বলে দসবত্থু, সংস্কৃত দশবস্তু। যে দশটি বিষয় নিয়ে ভেদের সূত্রপাত হয় সেগুলো হচ্ছে :—

(ক) **সিঙ্গিলোণকপ্প**—দরকার অনুসারে ব্যবহারের জন্য শিংত্র নোণ রাখা অর্থাৎ খাদ্যবস্তু সঞ্চয় রাখা।

(খ) **দ্বঙ্গুলকপ্প**—দু আঙুল ছায়া সরে গেলে ভিক্ষুদের ভোজন অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পর আহার করা। বেলা বারটার আগে ভিক্ষুদের আহার শেষ করতে হয়।

(গ) **গামন্তরকপ্প**—ভিক্ষুদের একই দিনে নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে আহার করা অর্থাৎ দু'বার খাওয়া।

(ঘ) **আবাসকপ্প**—এক সীমার ভিক্ষুদের বিভিন্ন স্থানে উপোসথ পালন। এক সীমার মধ্যে অবস্থিত সকল ভিক্ষুকে এক জায়গায় উপোসথ ব্রত পালন করতে হয়।

(ঙ) **অনুমতিকপ্প**—ভিক্ষুদের সম্মতি পরে পাওয়া যাবে—এ মনে করে কাজ করা।

(চ) **আচিন্নকপ্প**—নজির দেখিয়ে অর্থাৎ পূর্বাপর চলতি মতে কাজ করা।

(ছ) **অমথিতকপ্প**—আমওয়া দই খাওয়া অর্থাৎ যে দই মওয়ে ঘোল করা হয়নি তা খাওয়া।

(জ) **জলোগিপাতু**—তাড়ি হওয়ার আগে সেই ঝাঁজাল রস পানীয় বলে পান করা।

(ঝ) **অদসকনিসীদন**—ঝালরহীন আসনে বসা। যে আসনে ঝালর নেই সেই আসনে বসা।

(ঞ) **জাতরূপরজত**—সোনারূপা গ্রহণ করা।

বসুমিত্র, বিনীতদেব প্রমুখ আচার্যদের তিব্বতী ও চীনা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসমূহে সংগীতির ভিন্ন কারণ পাওয়া যায়। সংঘনায়ক দার্শনিকপ্রবর মহাদেবের প্রচারিত পাঁচ প্রকার মতবাদেই[১] ভিক্ষুসংঘে মতানৈক্য হয় এবং এ বিষয়গুলির নিষ্পত্তির জন্য দ্বিতীয় সংগীতি আহূত হয়।

১। (ক) অর্হৎ অজ্ঞাতসারে পাপ করতে পারেন।
(খ) তিনি যে অর্হৎ তা তিনি না জানতেও পারেন।
(গ) মতবাদ সম্বন্ধে অর্হৎ-এর সন্দেহ থাকতে পারে।
(ঘ) গুরু ছাড়া কেউ অর্হৎ হতে পারেন না।
(ঙ) ধ্যানস্থ অবস্থায় হঠাৎ হা-কষ্ট! হা-কষ্ট!—এরূপ বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণের দ্বারা সত্য উপলব্ধি হয়।

দ্বিতীয় সংগীতির কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের মহাপবিনির্বাণেব এক শ' বছর পবে সংঘে যে ভয়ানক মতভেদ দেখা দেয সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। একদল ভিক্ষু অনেক বিষযেই রক্ষণশীল ভিক্ষুদেব মতানুযাযী চলতেন না এবং সংঘেব নিযমকানুন ও ভিক্ষুদেব আচাব ব্যবহাবও পালন কবতেন না। এরূপে বৌদ্ধসংঘে যে গোলযোগ বাঁধে তাব চূড়ান্ত নিষ্পত্তিব জন্য এক মহাসভা হয। সেই সভায বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ নিন্দিত ও অপবাধী বলে সাব্যস্ত হলেন। সকলেই বৃজিপুত্র ভিক্ষুদেব বিরুদ্ধে মত দেওযায প্রাচীনপন্থী বা বক্ষণশীলদেব মতবাদই যথার্থ বলে গৃহীত হয। এভাবে পবাজিত হযে বৃজিপুত্র ভিক্ষুবা অসহ্য অপমানে ও ক্রোধে সভা ত্যাগ কবেন। কিন্তু তাঁবা এতে নিরস্ত না হযে ক্রমশঃ দলে ভাবী হযে অল্পদিনেব মধ্যেই বৈশালীব উপকণ্ঠে মহাবনেব কূটাগাবশালায আবও একটি মহাসভা আহ্বান কবেন। দশ হাজাবেবও অধিক ভিক্ষু এতে যোগ দেন। বাস্তবিকই ইহা একটি ভিক্ষুদেব বিবাট সভা। ইতিহাসে ইহাই মহাসংগীতি নামে খ্যাত। এ মহাসংগীতিতে যোগ দেওযায তাঁদেব নাম হয মহাসাংঘিক। আব প্রাচীনপন্থী ভিক্ষুবা থেববাদী বা স্থবিববাদী নামে অভিহিত হলেন। এ ভাবে তুচ্ছ কথাই স ঘে আনল ভেদ। সৃষ্টি হল দু'টি শাখা বা সম্প্রদাযেব। এ দু'টি হতেহ আবাব ক্রমে ক্রমে অনেক শাখা প্রশাখাব উদ্ভব হল।

সকলেবই মতে মহাসাংঘিকবাই সংঘে প্রথম ভেদ আনেন। তাঁবাই কিছুদিনেব মধ্যে প্রবল হযে বিপুল উৎসাহে নিজেদেব মতবাদ প্রচার কবতে থাকেন। এরূপে পবিণত হল এক বিরাট সম্প্রদায। এ সম্প্রদাযই মহাযান সম্প্রদাযেব প্রথম গোড়া পত্তন কবেন। কালক্রমে মহাসাংঘিকদেব সাতটি এবং স্থবিববাদীদেব এগাবটি শাখাব উদ্ভব হল। মোট আঠারটি দলে বিভক্ত হযে ভিক্ষুবা ব্যতিব্যস্ত হযে উঠলেন। মহাসাংঘিক হতে উদ্ভব হল—(ক) একব্যবহারিক, (খ) চৈত্যিক (চৈত্যক), (গ) কৌকুট্টিক (গোকুলিক), (ঘ) বহুশ্রুতীয, (ঙ) প্রজ্ঞপ্তিবাদী, (চ) পূর্বশৈল এবং (ছ) অপরশৈল।

শাখাগুলির মধ্যে চৈত্যবাদ (লোকত্তর) ও শৈল সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠেন এবং দক্ষিণ ভাবতে খুব প্রভাব বিস্তার করেন। স্থবিরবাদীদের যে এগারটি শাখার উদ্ভব হল তাদের নাম—মহীশাসক, বাৎসীপুত্রীয, সাম্মিতীয, ষন্নগারিক, ভদ্রযানীয, ধর্মোত্তরীয়, সর্বাস্তিবাদ, ধর্মগুপ্তক, কাশ্যপীয়,

হৈমবত এবং সংক্রান্তিক। এগুলির মধ্যে ধর্মোত্তরীয়, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ ও সাম্মিতীয় শাখাগুলির সম্বন্ধ খুব নিকটতর। এ সম্প্রদায়গুলি স্বল্পকালের মধ্যে সংঘে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। সম্প্রদায়গুলির ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় এগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি উপশাখা ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে না পেরে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সংগে মিশে যায়। সকল সম্প্রদায়ের আলোচনা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সেজন্য এখানে শুধু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়ের বিষয় আলোচনা করা হল।

(ক) **স্থবিরবাদ (থেরবাদ)**—এ সম্প্রদায়টি প্রাচীন ও মূল সম্প্রদায়। বিশ্লেষণমূলক ধর্মোপদেশের জন্য এঁদের বিভজ্যবাদও বলা হয়। ভগবান বুদ্ধের আদি ধর্মমতগুলি তাদের পালি গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁরা ছিলেন প্রাচীন-পন্থী এবং পালি ছিল তাঁদের সাহিত্যের ভাষা। এঁদের সংকলিত ধর্ম সাহিত্যকে ত্রিপিটক বলা হয়। বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক—এ তিনটি ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধ নির্দেশিত আচার ব্যবহার তাঁরা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তাঁরা মনে করতেন বুদ্ধ একজন মানুষ। নিজের উদ্যমে তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেন। অবশ্য মানবীয় দৌর্বল্য ও ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু আলৌকিক শক্তি ছিল তাঁর অশেষ। নিকায়গ্রন্থের অনেক সূত্রে তাঁকে দেবাতিদেব বলা হয়েছে। স্থবিরবাদীরা (থেরবাদীরা) বলেন, বুদ্ধের ধর্মমত অতি সরল। পাপ কাজ না করা, কুশল কাজ করা এবং চিত্ত শুদ্ধি রাখা—এ সম্প্রদায়ের মতবাদের মর্মকথা। এগুলি সম্যক্‌ভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন। শীল বা সদাচার ধর্ম জীবনের মূল ভিত্তি। শীল বা সদাচার বলতে সাধারণতঃ দশ শীল বা দশ শিক্ষাপদকে বোঝায়। পূর্বেই বলেছি এগুলো হচ্ছে:—প্রাণীহত্যা, চৌর্য, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, সুরাপান, বিকাল-ভোজন, নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ, মালাসুগন্ধদ্রব্যাদি ব্যবহার, উচ্চাসন ব্যবহার, ও সোনারূপা গ্রহণ ইত্যাদি হতে বিরত থাকা। উক্ত শীলসমূহের মধ্যে পাঁচটি বৌদ্ধ গৃহীদের পালনীয়। সৎ গৃহীরা আবার আটটি শীল প্রতিপালন করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর দশটি শীলই পালনীয়। দশটি অকুশল কর্মপথ হতে বিরতি অর্থেও শীল বা সদাচারসমূহকে কখনও কখনও বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি হল—প্রাণীহত্যা, চৌর্য, ব্যভিচার,

মিথ্যা-ভাষণ, পরুষবাক্য, পিশুনবাক্য, সংভিন্নপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি। সমাধি হল চিত্তের একাগ্রতা।

চল্লিশটি কর্মস্থান[১] বা সমাধির আলম্বনের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে সমাধি লাভ হয়। প্রজ্ঞা অবিদ্যারূপ অন্ধকার দূর করে। প্রজ্ঞার অনুশীলনে আর্যসত্যে ও প্রতীত্যসমুৎপাদে জ্ঞানলাভ হয়।

এঁদের মতবাদেও কোন জটিলতা নেই—তা খুবই সরল। জগতে সব কিছুই অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম। সকল জীব ও বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশধর্মী। সব সংস্কৃত ধর্মেরই উৎপত্তি নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধ হতে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চ স্কন্ধকে সংস্কৃত বলা হয়। যার উৎপাদ ও বিনাশ আছে তাকেই সংস্কৃত ধর্ম বলা হয়। জাতি, জরা ও মরণ—এ তিনটি সংস্কৃত ধর্মের লক্ষণ। স্থবিরবাদীদের মতে মধ্যম মার্গই প্রকৃত পন্থা। অসংযত ভোগ ও কঠোর তপস্যা উভয়ই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য'[২]। প্রকৃত সাধক এ দু'টি পন্থা সর্বদা পরিহার করেন। মধ্যম পন্থাই আবার আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ। চতুরার্যসত্য, অষ্টাঙ্গিকমার্গ, অনাত্মবাদ, কর্মবাদ ও প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতির উপর এঁরা বিশেষ জোর দেন। এঁদের চরম আদর্শ হল অর্হত্ব। অপরের কথা চিন্তা না করে নিজের সিদ্ধি লাভের জন্যই সকলে ব্যস্ত।

১। দশকৃৎস্ন—পৃথিবীকৃৎস্ন, আপকৃৎস্ন, তেজকৃৎস্ন বায়ুকৃৎস্ন, নীলকৃৎস্ন, পীতকৃৎস্ন, লোহিতকৃৎস্ন, অবদাতকৃৎস্ন, আকাশকৃৎস্ন ও আলোককৃৎস্ন।

দশ অশুভ—উর্ধ্মাতক, বিনীলক, পুযপূর্ণ, ছিদ্রীকৃত, বিখাদিত, বিক্ষিপ্ত, কৌর্তিত-বিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত, কীটপূর্ণ ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট।

দশ অনুস্মৃতি—বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, কায়গতানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি ও আনাপানানুস্মৃতি।

চারি অপ্রমেয়—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

একসংজ্ঞা—আহার্য দ্রব্যের ঘৃণাকর পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞানই একসংজ্ঞা।

একব্যবস্থান—দেহস্থ কঠিন, তরল, উষ্ণ ও বায়বীয়—এ চারি ধাতুর বিষয় জ্ঞান।

চারি অরূপাবচর—আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন।

২। মহাবগ্গ (১ম, পি. টি. এস, পৃঃ ১০)—কামেসুকামসুখল্লিকানুযোগো অত্তকিলমথানুযোগো।

আচার্য অনুরুদ্ধ পরবর্তীকালে (৮-১২ শতাব্দী) তাঁর রচিত নৈতিক ও মনস্তাত্বিক অভিধম্মথসংগহ নামক এ সম্প্রদায়ের অভিধর্মের সারগ্রন্থে চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ—এঁদের এ চারটি চরম পদার্থের আলোচনা করেছেন। চিত্ত ৮৯ প্রকার (১২১ প্রকার বা), চৈতসিক ৫২ প্রকার, রূপ ২৮ প্রকার ও নির্বাণ ১ প্রকার। নির্বাণ সব বকম পার্থিব দুঃখ, বাসনা ও মোহমুক্ত অবস্থা। ইহা অনির্বচনীয়—কথায় প্রকাশ করা যায় না।

(খ) **মহীশাসক**—পালি মতে এ সম্প্রদায়টির উৎপত্তি হয় বাৎসীপুত্র সম্প্রদায়ের সংগে থেরবাদ সম্প্রদায়ের মিলন হতে। মহীশাসক থেকে আবার সর্বাস্তিবাদের উৎপত্তি হল। কিন্তু খ্যাতনামা লেখক বসুমিত্র এ মতের সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন সর্বাস্তিবাদ থেকে মহীশাসকের উৎপত্তি। জানা যায় এ সম্প্রদায়টির প্রভাব সিংহলেও বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। স্থবিরবাদীদের মত মহীশাসকেরা বিশ্বাস করতেন অর্হতদের ধর্ম জীবনে চ্যুতির কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু স্রোতাপন্নের[১] চ্যুতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আজীবিকেরা কখনও অলৌকিক শক্তি লাভ করতে পারেন না। বুদ্ধ একজন সাধারণ মানুষ। অর্হতেরা এরূপ কোন সৎকাজ করেন না যা পার্থিব সুখ দেয়। কামধাতু লোকে সাধারণ লোকেরা রাগ ও প্রতিঘ (ক্রোধ) বিনাশ করতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে সংস্কারের ধ্বংস হয়। ইন্দ্রিয়ের উপদানগুলি, চিত্ত ও চৈতসিক পরিবর্তনশীল। বুদ্ধকে দান দেওয়ার চেয়ে সংঘকে দান দেওয়াই অধিক শুভ ফলদায়ক। যেহেতু বুদ্ধ সংঘেবই অন্তর্ভুক্ত। এঁরা বুদ্ধের চেয়ে সংঘেরই গুরুত্ব বেশী মনে করেন। আর্যাষ্টাঙ্গিকমার্গের মধ্যে এঁদের মতে সম্যক্‌বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ জীবিকা—এ তিনটি উপায় এ মার্গের অঙ্গ নয়—কারণ এগুলি শীল বিষয়ক। সর্বাস্তিবাদের মত এঁরাও অতীত, অনাগত ও অন্তরাভাবের অস্তিত্ব মানতেন। স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনের সূক্ষ্ম বীজরূপে অস্তিত্বেরও আবার বিশ্বাস করতেন।

এ সম্প্রদায়ের আবার দু'টি ভাগ হয়। একটি পূর্বমহীশাসক ও অপরটিকে

১। আধ্যাত্মিক জীবনে সাধকের চারটি শুদ্ধ অবস্থা। যথা—স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব।

উত্তরমহীশাসক বলা যেতে পারে। প্রথমটির সহিত স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের ও দ্বিতীয়ের সাথে সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মতবাদে বেশ সাদৃশ্য আছে।

(গ) **হৈমবত**—সম্প্রদায়টির নাম হতে জানা যায় এর উৎপত্তি হয হিমালয় প্রদেশে। পণ্ডিত প্রবব বসুমিত্রের অষ্টাদশনিকায়সংগ্রহ নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় হৈমবতের উৎপত্তি হয় স্থবিরবাদ থেকে। কিন্তু খ্যাতনামা আচার্যদ্বয ভগ্‌গ ও বিনীতদেবের মতে এ সম্প্রদাযটি মহাসাংঘিক সম্প্রদাযেব শাখামাত্র। সিংহলেব ইতিবৃত্ত হতে জানা যায় হৈমবত সম্প্রদাযেব উৎপত্তি সংঘেব আঠাবটি সম্প্রদাযেব আবির্ভাবের অনেক পরে। সর্বাস্তিবাদেব মত এঁবাও বিশ্বাস কবতেন বোধি-সত্ত্বদেব কোন অসাধাবণ বৈশিষ্ট্য নাই। বোধিসত্ত্বেবা সাধাবণ মানুষ। মাতৃগর্ভে প্রবেশেব সময তাঁদেব বাগ বা কাম কিছুই থাকে না। এঁদেব মতে পবিত্র সংযত জীবন যাপন কবতে দেবতাবাও পাবেন না। অর্হতদেব অজ্ঞান ও সন্দেহ থাকে। তাঁবাও লোভের বশবর্তী হন। তীর্থিকেবা[১] আলৌকিক জ্ঞান লাভ কবতে পাবেন না। অর্হতেবা অপরেব সাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। ধ্যানাবস্থায় হঠাৎ বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চাবণে সত্য উপলব্ধি হয। এ সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত সর্বাস্তিবাদেব মতবাদেব প্রধানতঃ বেশ সাদৃশ্য আছে।

(ঘ) **বাৎসীপুত্রীয়**—বৌদ্ধসম্প্রদাযগুলিব মধ্যে এ সম্প্রদায়টি বিশিষ্ট মতবাদেব জন্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। বাৎসীপুত্রীয়দেব অবন্তীক আখ্যা দেওয়া হয়। অনেক সময় বাৎসীপুত্রীয়সম্মিতীযও বলা হয।

জীবের পুদ্‌গল নামক একটি সৎবস্তুব অস্তিত্বে এঁবা বিশ্বাস কবেন। এঁদেব মতে পুদ্‌গল ভিন্ন জীবেব পুনর্জন্ম হয় না। পুদ্‌গলটি বর্ণানাতীত ও অপবিবর্তিত।

আচার্য বসুবন্ধু তাঁর অভিধর্মকোষ গ্রন্থে ও দার্শনিক নাগার্জুন তাঁব মধ্যমকবৃত্তিতে এ মতবাদের খণ্ডন কবতে যথেষ্ট প্রযাস কবেছেন। পুদ্‌গল ও স্কন্ধ এক—অভিন্ন নহে। স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুব সমষ্টিকে সাময়িকভাবে পুদ্‌গল বলা হয়। কতকগুলি সংস্কার কোন কোন সময বর্তমান থাকে কতকগুলি আবার প্রতিমুহূর্তে বিনষ্ট হয়। পুদ্গল ছাড়া ধর্মসমূহেব অবস্থান্তব হয না। পঞ্চবিজ্ঞান রাগ বা বিরাগ আনতে পারে না। সাম্মিতীয়শাস্ত্র বা সাম্মিতীয়নিকায়শাস্ত্র এ সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সর্বাস্তিবাদের মত এঁরাও বিশ্বাস করতেন

১। বৌদ্ধ সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য সব সম্প্রদায়ের লোককে তীর্থিক বলা হয়।

অর্হতদের পতন আছে এবং আজীবিকেরা অলৌকিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। জীবের অন্তরাভাবেও এঁদের বিশ্বাস। মহীশাসক সম্প্রদায়ের মত এ সম্প্রদায় ও আর্যাষ্টাঙ্গিকমার্গের পাঁচটিমাত্র মার্গে বিশ্বাস করতেন। সারনাথে আবিষ্কৃত গুপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় সারানাথ এ সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কথিত আছে, রাজা হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী এ সম্প্রদায়টির বিশেষ পোষকতা করতেন।

(ঙ) **ধর্মগুপ্তিক**—সম্প্রদায়টি মহীশাসকের শাখা। কিন্তু নিয়মকানুনের ব্যাপারে সম্প্রদায়টি মহীশাসক হতে একটু ভিন্ন। এঁদের শাস্ত্র পাঠে জানা যায় ধর্মগুপ্তিয়েরা সংঘ ও স্তূপে দানকে পুণ্যার্জনের প্রকৃত পন্থা মনে কবতেন। অর্হতরা অনাশ্রব ও বীতরাগ। আজীবিকেরা অলৌকিক জ্ঞান লাভ করেন না। সাধকেবা বোধিজ্ঞান অতর্কিতভাবে লাভ করেন। শ্রাবকযান ও বুদ্ধযান—উভয় যানের লক্ষ্য বিমুক্তি কিন্তু এদের মার্গ ভিন্ন। অধ্যাপক জুলস্কি (Przyluski) মনে করেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে এ সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। মধ্য-এশিয়া ও চীনদেশে ধর্মগুপ্তিয়েরা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নিজেদের আবার ত্রিপিটক—সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম ছিল। চীনদেশের বৌদ্ধবিহারে ধর্মগুপ্তিয় প্রতিমোক্ষের পঠন ও পাঠনের প্রচলন ছিল। মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত এ সম্প্রদায়ের মতবাদের মুখ্যতঃ সাদৃশ্য আছে।

(চ) **কাশ্যপীয়**—এটি সর্বাস্তিবাদের একটি শাখা। কিন্তু স্থবিরবাদের সহিত এ মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কাশ্যপীয়দের স্থাবিরীয় সংধর্মবর্ষক বা সুবর্ষক বলা হত। এঁদের মতে অর্হতদের ক্ষয়জ্ঞান ও উৎপাদজ্ঞান আছে। এঁরা বীতরাগ। প্রত্যেক মুহূর্তে সংস্কারের ক্ষয় হয়। অতীত কর্মের ফলে সংস্কারের উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যতের কর্মফলে নহে। বিপাক ফল আছে। পালি কথাবথু গ্রন্থে এঁদের মতবাদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কাশ্যপীয়েরা সর্বাস্তিবাদ ও বিভজ্যবাদের একটা সমন্বয় করেন। ধর্মগুপ্তিয়দের মত এঁদের ও ত্রিপিটক ছিল।

(ছ) **সৌত্রান্তিক (সংক্রান্তিক)**—পালি কিংবদন্তী হতে জানা যায় সংক্রান্তিক সম্প্রদায় কাশ্যপীয় সম্প্রদায়ের একটি শাখা এবং সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় সংক্রান্তিকের শাখা। কিন্তু খ্যাতনামা লেখক বসুমিত্রের মতে এ দু'টি সম্প্রদায়

১। চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোতবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান ও কায়বিজ্ঞান।

এক ও অভিন্ন। সংক্রান্তিক নাম হতে জানা যায় এ সম্প্রদায়টি সংক্রান্তিতে বিশ্বাস করতেন অর্থাৎ সত্ত্বের দেহান্তর প্রাপ্তিতে। জীবের পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে একটি স্কন্ধেরই দেহান্তর ঘটে। কাশ্যপীয়দেব মতে এটি প্রকৃত পুদ্‌গল। মহাসাংঘিকদের মতে এটি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান যা সারা দেহে ব্যাপ্ত থাকে। যোগাচার সম্প্রদায়েব আলয়বিজ্ঞানের সহিত এব সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ এ সম্প্রদায়টি তার সূক্ষ্ম বিজ্ঞানতত্ত্ব মহাসাংঘিক থেকে নেন। পরবর্তীকালে এ থেকে যোগাচার সম্প্রদায়ের আলয়বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সৌত্রান্তিকদের মতে অর্হতদের দেহ পবিত্র, কারণ এটি জ্ঞান হতে উদ্ভূত। আয মার্গ ছাড়া স্কন্ধের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। মানুষেব মধ্যে বুদ্ধ হবার শক্তি নিহিত আছে। একই সময়ে আবাব অনেক বুদ্ধের আবির্ভাব হতে পাবে না। অসংস্কৃত ধর্মের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। সম্প্রদায়টি হীনযানে ও মহাযান মতবাদেব সমন্বয় করেন। সুবিখ্যাত দার্শনিক বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ গ্রন্থে এ মতবাদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

(জ) **সর্বাস্তিবাদ**—এটি স্থবিরবাদেব একটি বড় শাখা। সম্প্রদায়টিকে আবার হেতুবাদ ও মুরুন্তক বলা হোত। কেহ কেহ মনে কবেন এটি হতে চারিটি শাখার উদ্ভব হয়। অনেকেব মতে আবার এটি সাতটি শাখায় বিভক্ত হয়। অধ্যাপক যমকামি সোজেনেব মতে সবাস্তিবাদ বৈভাষিক সম্প্রদায়েব শাখা হলেও এটি পরবর্তীকালে বৈভাষিক নামে পরিচিত হয়। এ সম্প্রদায়টির মত খণ্ডনে আবার কয়েকটি মতবাদের উদ্ভব হয়। এর দার্শনিক দৃষ্টিভংগি অতি গভীর। দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্যই এটি নৈয়ায়িক, দার্শনিক ও ভাষ্যকারদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা লাভ করে। এ মতবাদকে পূর্বপক্ষ করে দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর সূক্ষ্ম শূন্যতাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা ছাড়া মহাযান সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড ধাক্কাও একে সামলাতে হয়েছিল। সম্রাট কনিষ্ক এ সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়তেন। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত শুনে তিনি খুব হতবুদ্ধি হন। এ মতবাদগুলোর সমন্বয়ের জন্য তিনি একটি বৌদ্ধ সংগীতির আহ্বান করেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে এটি চতুর্থ সংগীতি নামে পরিচিত। জানা যায় এ সংগীতিতে বিনয়, সূত্র ও অভিধর্মের গ্রন্থগুলি তামার পাতে খোদাই করে একটি স্তূপে রাখা হয়। দুঃখের বিষয় এগুলি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। সম্প্রদায়টি খৃষ্টপূর্ব যুগে ও তার পরেও সমগ্র উত্তর ভারতে খুব প্রতিপত্তি লাভ করে।

তিব্বত, মধ্য-এশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশেও এ সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচারিত হয়। অনেকের ধারণা সর্বাস্তিবাদ মহাযানের একটি বড় শাখা। এঁদের সাহিত্য ও দর্শনের সব গ্রন্থই সংস্কৃতে লেখা। আর মহাযানের লোকেরাই কেবল সংস্কৃতে লিখিত। তাই মনে হয় এঁরা মহাযান দলভুক্ত। এঁদের সাহিত্য অধুনা লুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য। চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ থেকে এবং মধ্য-এশিয়া, নেপাল ও সম্প্রতি গিল্‌গীটে (কাশ্মীর) যে সব খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে এবং ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, অভিধর্মকোষ, মধ্যমকবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থের উক্তি হতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এঁরা হীনযান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সংস্কৃত ছিল এদের সাহিত্যের মাধ্যম। কথিত আছে, বসুবন্ধু যখন হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তখন সংস্কৃতে অভিধর্মকোষ নামক সকল সম্প্রদায়ের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখেন। যমকামি সোজেন, সিলভ্যা লেভি, লা ভালে পুঁসে, সেট্‌বাসকি, রোসেনবার্গ এবং আরও অনেক পণ্ডিত এঁদের ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন আলোচনা করেছেন। এ সব লেখা হতে জানা যায় এঁরা হীনযান দলের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের পালি ত্রিপিটকের মত সংস্কৃতেও ত্রিপিটক ছিল। এর খণ্ডিত পুঁথি কিছু পাওয়া গেছে। এদের কতকগুলি আবার প্রকাশিতও হয়েছে।

এ সম্প্রদায়টির মতে ধর্মমাত্রই ত্রিকালসৎ অর্থাৎ ধর্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীত—এই তিনকালের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এরা মনে করেন অতীত ও ভবিষ্যতের উপকরণগুলি বর্তমানে নিহিত থাকে। অতীত বর্তমানের মূল ও ভবিষ্যতের ফল। ধর্মের ত্রিকাল অস্তিত্বরূপ অর্থেই সর্বাস্তিবাদ। সর্বাস্তিবাদ আচার্যদের মধ্যে সংস্কৃত ধর্মের ত্রিকালসৎ ব্যাখ্যাতে কিছু মতানৈক্য আছে। এ বিষয়ে চারটি মত দেখা যায়। পালি কথাবথু গ্রন্থে সর্বাস্তিবাদ শব্দের অর্থ ও সম্প্রদায়টির দার্শনিক মতবাদের প্রচুর আলোচনা আছে। অনুমান করা যায় ত্রিকালবাদ মতের সাথে এর বেশ যোগাযোগ আছে। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধাচার্যদের মধ্যে কেন ন্যায়, ব্যাকরণ, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রের আচার্যদের মধ্যেও এ ত্রিকালবাদের উপর বাক্-বিতণ্ডা হয়। সাংখ্যের সংকার্যবাদের সহিত সর্বাস্তিবাদ মতবাদের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সর্বাস্তিবাদ মতে অর্হতদের চ্যুতি আছে। সব অর্হতেরা অনুৎপাদ জ্ঞান লাভ করতে পারেন না। এঁরা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের অধীন ও অতীত কর্মের ফল ভোগ করেন। স্রোতাপন্নের চ্যুতি নেই। আজীবিকেরাও

অলৌকিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। জীবের অন্তরাভাবে এঁদের বিশ্বাস আছে। সাধারণ মানুষ রাগ ও প্রতিঘ (ক্রোধ) ধ্বংস করতে পারে। কতকগুলি দেবতা ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারেন। চিত্ত ও চৈতসিক ধর্মের আলম্বন আছে। অব্যাকৃত ধর্ম বলে কিছু ধর্ম আছে। সৎকাজ জন্মের হেতু হতে পারে। এঁরা আবার ৭৫টি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এর মধ্যে ৭২টি দ্রব্য অনিত্য এবং তিনটি—আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নিত্য। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বও সংস্কৃত। সমাহিত অবস্থায় সাধক কথা বলতে পারেন। সমাহিত অবস্থায় কেউ মারা যান না।

(ঝ) **মহাসাংঘিক**—আগেই বলা হয়েছে সংঘে প্রথম ভেদ আনেন মহাসাংঘিকেরা। পরবর্তী কালে এ সম্প্রদায় হতে আবার কতকগুলি শাখার উদ্ভব হয়। প্রথম সংগীতিতে যে সূত্র-বিনয়পিটক সংকলিত হয় তার মধ্যে অনেক গ্রন্থই বুদ্ধবচন বলে এঁরা স্বীকার করেন না। যথেচ্ছভাবে অনেক সূত্র-বিনয়ের নিয়ম এঁরা বুদ্ধবচন বলে চালিয়ে দেন। কথিত আছে, মহাসাংঘিকেরা প্রাকৃত ভাষায় তাঁদের ত্রিপিটক সংকলিত করেন। বিনীতদেব (খৃঃ অষ্টম শত) মনে করেন প্রাকৃত ছিল তাঁদের সাহিত্যের ভাষা। বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিয়ং চুয়াং-এর বৃত্তান্ত হতে জানা যায় মহাসাংঘিকদের বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম, প্রকীর্ণক এবং ধারণী—এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ত্রিপিটক ছিল।

অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপি হতেও এদের ত্রিপিটকেরও অস্তিত্ব জানা যায়। এ সংগ্রহকে বলা হয় আচার্যবাদ (আচরিয়বাদ) সংকলন এবং প্রথম সংগীতের সংগ্রহের আখ্যা দেওয়া হয়েছে স্থবিরবাদ (থেরবাদ) সংকলন। মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। আজ পর্যন্ত একখানি মাত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে—সেখানা মহাবস্তু-অবদান। অধ্যাপক সেনার্ট গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে প্রকাশ করেছেন [১]। বুদ্ধদেবের জীবনীই এর প্রধান বিষয়বস্তু। গ্রন্থটির ভাষা মিশ্র সংস্কৃত—এটিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতও বলা হয়। এই ভাষার উপর এখন যথেষ্ট গবেষণা চলছে। সম্প্রতি অধ্যাপক ফ্রেঙ্কলিন এড গারটন এ ভাষার একখানি ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেছেন।

তাঁদের নতুন নিয়মকানুন চালাতে স্থবিরবাদীদের নিকট তাঁরা বিশেষ বাধা পান। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং একটা প্রবল সম্প্রদায়ে পরিণত

১। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্প্রতি প্রথম খণ্ডটি সমূল বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

হন। চৈনিক পর্যটক ইট্‌সিং-এর বিবরণী পাঠে জানা যায় তিনি ভারত ভ্রমণ-কালে মহাসাংঘিকদলের অনেক ভিক্ষুদের মগধ, লাট ও পূর্বসিন্ধুতে দেখতে পান। মহাসাংঘিকেরা তাঁদের ধর্মমত নিয়ে মগধেই আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা মথুরা, বোম্বাই এবং আফগানিস্থানেও প্রবল হয়ে ওঠেন। তবে ভারতের দক্ষিণ ভাগে গুণ্টুর ও কৃষ্ণা জিলাতে এ সম্প্রদায়টি বিশেষ প্রসার লাভ করেন।

মহাসাংঘিকরা স্থবিরবাদীদের মত চতুবার্যসত্য, অষ্টাঙ্গিকমার্গ, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, স্কন্ধের অনিত্যতা, অনাত্মবাদ, বোধিপক্ষীয় ধর্ম, বোধ্যঙ্গ প্রভৃতির গূঢ় সত্য স্বীকার করেন। তাঁদের মতে বুদ্ধেরা লোকোত্তর। তাঁদের কোন আস্রব অর্থাৎ আসক্তি নেই। তাঁদের অপবিমিত দেহ ও শক্তি। তাঁরা নিবন্তব সমাধি-মগ্ন থাকেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা কবলেও তাঁদেব সচেতনতা থাকে না—মুহূর্তেই তাঁরা লয় হয়ে যান। মহাপরিনির্বাণ কাল পর্যন্ত বুদ্ধদেবের ক্ষয় জ্ঞান ও লোকোত্তর জ্ঞান থাকে। এ চিন্তাধারা থেকে পরবর্তীকালে মহাযানের ত্রিকায় মতবাদের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধেরা সাধাবণ মানুষের মতো জন্মান না। স্রোতাপন্নের ধর্মজীবনে চ্যুতির সম্ভাবনা আছে কিন্তু অর্হতের এ সম্ভাবনা নেই। স্রোতাপন্ন চিত্ত চৈতসিকের দ্বারা নিজের স্বভাব জানতে পারেন। চিত্ত সভাবতঃই নির্মল। এটি আগন্তুক দোষে দুষ্ট হয়। এ মত থেকে পরবর্তীকালে যোগাচারদের আলয়বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। সত্যোপলব্ধি ক্রমশঃ নয়—হঠাৎ ঘটে। মহাবস্তু, কথাবত্থু, বসুমিত্র এবং ভব্য ও বিনীতদেবের গ্রন্থে এ সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রচুর আলোচনা মেলে।

(ঞ) **বহুশ্রুতীয়**—অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালিপি থেকে জানা যায় বহুশ্রুতীয় মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের পরবর্তী শাখা। সম্প্রদায়গুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন বহুশ্রুত অর্থাৎ বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য। সেজন্য এর নাম রাখা হয় বহুশ্রুতীয়। হরিবর্মনের সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র বহুশ্রতীয় সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। মহাসাংঘিকের শাখা হলেও সম্প্রদায়টির মতবাদের সংগে সর্বাস্তিবাদ মতবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শৈল সম্প্রদায়ের মতবাদের সঙ্গেও এর কয়েকটি বিষয়ে মিল দেখা যায়। বহুশ্রুতীয়েরা বলেন বুদ্ধ আনিত্য, দুঃখ, শূন্য ও নির্বাণ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছেন তা লোকোত্তর। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপদেশগুলি লৌকিক। সংঘ পার্থিব নিয়মকানুনের অতীত। সংঘভেদকারী মহাদেবের

পাঁচটি মতবাদও এঁরা সমর্থন করতেন। মহাযানীদের মতে এঁদেরও সত্য দু'প্রকার পরমার্থ ও সংবৃতি।

বুদ্ধের দশ বল[১] ও বিশেষ শক্তিতে এঁরা আবার বিশ্বাস করতেন। বর্তমানের অস্তিত্ব আছে—কিন্তু অতীত ও অনাগতের এরূপ কোন অস্তিত্ব নেই। আচার্য পরমার্থের মতে এ সম্প্রদায়টি হীনযান ও মহাযানের মতবাদের সমন্বয় করতে প্রয়াস করেছেন ও বুদ্ধের উপদেশাবলীকে নীতার্থ (গভীর) ও নেয়ার্থ (লঘু)—এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

(ট) **প্রজ্ঞপ্তিবাদ**—আচার্য বিনীতদেব ও ভিক্ষুবর্ষাগ্রপরিপৃচ্ছা গ্রন্থ হতে জানা যায় এ সম্প্রদায়টির মহাসাংঘিক সম্প্রদায় হতে উদ্ভব হয়। আচার্য পরমার্থ মনে করেন এ সম্প্রদায়টির উৎপত্তি বহুশ্রুতীয় সম্প্রদায়ের অনেক পরে। বহুশ্রুতীয় হতে পার্থক্য করার জন্য তারা নিজেদের বহুশ্রুতীয়-বিভজ্যবাদী বলতো। এঁদের মতে স্কন্ধ ও দুঃখ সহগামী নহে। দ্বাদশায়তন অবাস্তব। মার্গলাভ বা মৃত্যু কর্মের উপর নির্ভর করে। মার্গলাভের পর কোন চ্যুতি হয় না। কর্ম বিপাকের হেতু। বিপাক হেতু আবার বিপাকের ফল। এ সম্প্রদায়ের মতবাদ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মতবাদের চেয়ে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে।

(ঠ) **চৈত্যবাদ**—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য মহাদেব এ সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অবশ্য ইনি দ্বিতীয় সঙ্গীতির মহাদেব নন। ইনি পাহাড়ের উপর একটি চৈত্যে বাস করতেন। এ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের নাম হয় চৈত্যবাদ। অনেকেই মনে করেন এই সম্প্রদায় চৈত্যের পূজা করতো—সেজন্য চৈত্যবাদ আখ্যা পায়। এ সম্প্রদায়টিকে আবার লোকোত্তরবাদ সম্প্রদায়ও বলা হয়। অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপিতে এ সম্প্রদায়টির উল্লেখ আছে। এ সম্প্রদায় হতে পরে শৈল বা অন্ধ্রক[২] সম্প্রদায়ে উৎপত্তি হয়।

চৈত্যবাদীরা সাধারণতঃ মহাসাংঘিক ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন। এঁদের মতে চৈত্য নির্মাণ, চৈত্যপূজা ও চৈত্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করাতেও পুণ্য হয়। এরূপে

১। স্থানাস্থানজ্ঞান, কর্মবিপাকজ্ঞান, নানাধিমুক্তিজ্ঞান, নানাধাতুজ্ঞান, ইন্দ্রিয়বরাবরজ্ঞান সর্বত্রগামনী প্রতিপৎজ্ঞান, সর্বধ্যানবিমোক্ষসমাধিসমাপত্তি সংক্লেশব্যবদানব্যুত্থানজ্ঞান, পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান, চ্যুত্যুৎপত্তিজ্ঞান ও আশ্রবজ্ঞান—মহাব্যুৎপত্তি (সকাকি), পৃঃ ৯, ১০।

২। অন্ধ্র সাম্রাজ্যে এর কেন্দ্র ছিল সেজন্য অন্ধ্রক বলা হয়।

চৈত্যে পুষ্পদান, মাল্যদান ও গন্ধদান বিশেষ হিতকর। দানে মানুষও পুণ্য লাভ করে এবং এই পুণ্য জ্ঞাতি ও বন্ধুদের হিতার্থে নিয়োগ করা যায়। এই ভক্তিবাদ বৌদ্ধধর্মকে বৌদ্ধসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় করে তোলে। বুদ্ধেরা রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি হতে মুক্ত। তাঁরা দশ বলের জন্য অর্হতের চেয়েও উচ্চতর। সম্যক্ দৃষ্টি লাভ করেও ভিক্ষু দ্বেষমুক্ত নয়—তাই তাঁর জীবহত্যায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নির্বাণ অমৃতপদ।

এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলির বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৩০০ বছরের ভিতর উৎপত্তি হয়। এই সব সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকগুলি তাদের মতবাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পেরে কালক্রমে অন্য সম্প্রদায়ের সংগে মিশে যায়। মাত্র চারটি সম্প্রদায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সংঘে প্রতিষ্ঠা পায় এবং প্রভাব বিস্তার করে। এ চারিটি সম্প্রদায় হচ্ছে—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক , মাধ্যমিক ও যোগাচার। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় প্রাচীনপন্থী বা হীনযান সম্প্রদায়ের সর্বাস্তিবাদের শাখা। সেজন্য সম্প্রদায় দু'টির মতবাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। মাধ্যমিক ও যোগাচার আবার উদারপন্থী বা মহাযানের শাখা। এ দু'টি মতবাদেরও আবার সাদৃশ্য আছে। মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে সম্প্রদায়গুলির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন বৈভাষিকেরা বিভাষা শাস্ত্র হতে নিজেদের মতবাদ গড়ে তোলেন। সেজন্য আখ্যা পান বৈভাষিক। সূত্রগ্রন্থ প্রামাণ্যে হল· সৌত্রান্তিক, মধ্যম পন্থা অবলম্বনে মাধ্যমিক, যোগ ও আচারের প্রাধান্যে যোগাচার।

বৈভাষিক—এ চারিটি মতবাদের মধ্যে বৈভাষিক মতই হল মূল মত। পূর্বেই বলেছি অপরাপর মতবাদগুলি এ সম্প্রদায়ের মতবাদের আংশিক খণ্ডনে উৎপত্তি—তাই এ শাখাটির কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের সংস্কৃত বিরচিত জ্ঞানপ্রস্থান, প্রকরণপাদ, বিজ্ঞানকায়, ধর্মস্কন্ধ, প্রজ্ঞাপ্তিশাস্ত্র, ধাতুকায় ও সঙ্গীতিপর্যায়—এই সাতখানি অভিধর্মগ্রন্থই[১] বৈভাষিকদের শাস্ত্র। এগুলির উপর আবার অনেক বিভাষা (টীকা) রচিত হয়। পূর্বে বলা হয়েছে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে এই সম্প্রদায়টির উৎপত্তি এবং বিভাষা থেকে বৈভাষিক নামের সৃষ্টি হয়। বৈভাষিকেরা

১। থেরবাদীদের অভিধর্মগ্রন্থ—ধর্মসংগণি, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক ও পট্‌ঠান।

অস্তিবাদী (realist)। তাঁদেব মতে মন ও তদতিরিক্ত সবই সত্য। বাহ্য বস্তুসমূহেব জ্ঞান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এখানেই বৈভাষিকদের সংগে সৌত্রান্তিকদের মতের পার্থক্য। কাবণ সৌত্রান্তিকদেব মতে বাহ্য বস্তু অনুমান সিদ্ধ। নির্বাণ আনন্দময়। সর্বাস্তিবাদেব মতো এ মতেও ৭৫টি ধর্মেব অস্তিত্ব স্বীকৃত হয। ধর্মসমূহ সাস্রব (মলযুক্ত) ও অনাস্রব (মলহীন)। সাস্রব ধর্ম সংস্কৃতধর্ম নামে পবিচিত। অনাস্রব ধর্ম অসংস্কৃত ধর্ম নামে পবিচিত। সংস্কৃত ধর্ম হেতুসমূহ হতে উদ্ভূত [১]। অসংস্কৃত ধর্ম অহেতুক। সংস্কৃত ধর্মেব সংখ্যা ৭২টি এবং অসংস্কৃতেব সংখ্যা ৩টি। ৭২টি সংস্কৃত ধর্মকে আবাব ৪ ভাগে ভাগ কবা হয। আত্মা বা পুদ্‌গলেব অস্তিত্ব নেই। স্কন্ধ ও মহাভূতেব সমবাযে জীবেব উৎপত্তি। প্রতীত্যসমুৎপাদেব পূর্বাপূর্ব ও সহকাবিত্ব দুই মতেই স্বীকৃত।

সৌত্রান্তিক—এ সম্প্রদাযটিব উৎপত্তি বৈভাষিক সম্প্রদাযেব কিছু পবে। এব প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কুমাবলাত ও তাঁব শিষ্য হবিবর্ম (খৃঃ দ্বিতীয শত)। হবিবর্মনেব সত্যসিদ্ধশাস্ত্র এ সম্প্রদাযেব প্রামাণ্য গ্রন্থ। পূর্বে বলা হযেছে সূত্র গ্রন্থ প্রামাণ্য বলে স্বীকার কবাতে নাম হল সৌত্রান্তিক। বৈভাষিকেব মতো এ বাও মন ও তদ তিবিক্ত সবই সত্য বলে স্বীকাব কবেন। এ মতে বাহ্যবস্তু অনুমান সিদ্ধ। পুদগল শূন্যতা ও ধর্মশূন্যতা—এই দু'টিই সৌত্রান্তিকদেব মূল সূত্র। এঁবা সংবৃতি ও পরমার্থসত্য—এ দু'টি সত্য স্বীকাব কবেন। অনিত্যতাই ধর্মসমূহেব লক্ষণ। ধর্মসমূহ শূন্যস্বভাববিশিষ্ট ও অলীক মাত্র। নির্বাণ অবস্তুক মাত্র। এ মত আবাব সর্ববৈনাশিক নামে ও পবিচিত।

মাধ্যমিক—মহাযানেব একটি প্রধান মতবাদ। পূর্বে বলা হযেছে মধ্যম পন্থা অনুসবণ কবতেন বলে এঁদের বলা হয মাধ্যমিক। বাবাণসীতে বুদ্ধ যে প্রথম মত প্রচার করেন তাতে তিনি মধ্যম পথের কথা বলেছেন। সেখানে তিনি সুখভোগ ও কঠোর দৈহিক ক্লেশ দুই-ই নিন্দনীয ও পবিত্যাজ্য—এ দুটিব মধ্যম পন্থা অবলম্বন

১। এখানে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্রের শ্লোকটি—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ।
তেসঞ্চ যো নিরোধো এবংবাদী মহাসমণো॥

সংস্কৃত — যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতঃ।
অবদত্তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ—আর ও পৃঃ ২২।

ধর্মসমূহ হেতু হতে উদ্ভূত। তথাগত (বুদ্ধদেব) তাদের হেতু ও নিরোধের উপায় বলেছেন।

করাই সমীচীন। কিন্তু এটিই মাধ্যমিকদের মধ্যম পন্থা নহে। তাঁদের মতে অস্তি-নাস্তি, নিত্য-অনিত্য,আত্মা-অনাত্মা প্রভৃতি কোনটার দ্বারা মধ্যম পন্থা ব্যাখ্যা করা যায় না [১]। অস্তি বললে বস্তুর শাশ্বত এবং নাস্তি বললে বস্তুর অশাশ্বতকে স্বীকার করা হয়। তাই অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব এর কোনটাই বলা চলে না—এটা আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্তমাত্র (relative)। বারাণসীতে বুদ্ধ যে মধ্যম প্রতিপদেব ব্যাখ্যা দেন সেটা নৈতিক অর্থে বোঝা হয়। কিন্তু মাধ্যমিকদেব যে ব্যাখ্যা সেটা অধ্যাত্মিক (metaphysical)।

খ্যাতনামা দার্শনিক নাগার্জুন মাধ্যমিক মতবাদেব প্রবর্তক। তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নাগার্জুনের পর যে সব আচার্য মাধ্যমিক মতের আলোচনা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আর্যদেব (৩য় শতক), বুদ্ধপালিত (৫ম শতক), ভাববিবেক (৫ম শতক), চন্দ্রকীর্তি (৬ষ্ঠ শতক) ও শান্তিদেব (৭ম শতক)। নাগার্জুন এই মতবাদের উপর অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন। তাদেব মধ্যে মাধ্যমিককাবিকাই মাধ্যমিক দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মাধ্যমিক দর্শনেব প্রকৃষ্ট পবিচয মেলে। শূন্যতাই দর্শনের মূল সূত্র। শূন্যতা ও সংসাব বা নির্বাণেব কোন ভেদ নাই। নিগুণ ব্রহ্মণের সাথে আবার শূন্যতাব বেশ সাদৃশ্য আছে। শূন্যতা মাধ্যমিক দর্শনেব মূল সূত্র বলে একে আবাব শূন্যবাদ আখ্যা দেওযা হয। মাধ্যমিক মতে সত্য দু'প্রকারের—সংবৃতি ও পরমার্থ। সংবৃতি অর্থ অজ্ঞান বা মোহ। একে ব্যবহারিক সত্যও বলা হয়। পবমার্থ হচ্ছে লোকত্তর জ্ঞান। সংবৃতি উপায় এবং পরমার্থ পরিণাম। সংবৃতির দৃষ্টিভঙ্গীতে লক্ষ্য করলে প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ জাগতিক কার্যকারণ কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিভঙ্গীতে এটি নির্বাণ বা শূন্যতা।

খৃষ্টীয় ৫ম শতক মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের আবার দু'টি ভাগ হয়—প্রাসঙ্গিক ও স্বাতন্ত্র্য। আচার্য বুদ্ধপালিত প্রাসঙ্গিক মতবাদের এবং ভাববিবেক স্বাতন্ত্র্য মতবাদের প্রবর্তক।

চীনদেশের চিয়েনতাই (T'ien-tai) ও সানলুন (Sanlun) বৌদ্ধসম্প্রদায় দু'টি মাধ্যমিকের শাখা বলে জানা যায়।

---

(১) অস্তীতি শাশ্বতগ্রাহো নাস্তীতুচ্ছেদদর্শণম্।
শাশ্বতোচ্ছেদনির্মুক্তং তত্ত্বং সৌগতসম্মতম্॥

যোগাচার—মহাযানের আরেকটি প্রধান শাখা। খৃষ্টীয় ৩য় শতকে আচার্য মৈত্রেয় বা মৈত্রনাথ এ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। অসঙ্গ (৪র্থ শতক), বসুবন্ধু (৪র্থ শতক), স্থিরমতি (৫ম শতক), দিঙ্‌নাগ (৫ম শতক), ধর্মপাল (৭ম শতক), ধর্মকীর্তি (৭ম শতক), শান্তরক্ষিত (৮ম শতক), কমলশীল (৮ম শতক) প্রভৃতি যোগাচারের উল্লেখযোগ্য আচার্য। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু এই দুই ভায়ের সময়ে সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রভাবশালী হয়। অসঙ্গ এ সম্প্রদায়টির যোগাচার নাম দেন এবং বসুবন্ধু এর নাম দেন বিজ্ঞানবাদ বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাবাদ।

পূর্বেই বলা হয়েছে সম্প্রদায়টি বোধি লাভের জন্য যোগ মার্গের উপর জোর দেন এজন্য একে বলা হয় যোগাচার। এ মতে বোধিসত্ত্বকে বোধিজ্ঞানের জন্য দশটি ভূমি অতিক্রম করতে হয়। দশটি ভূমিকে বলা হয় দশভূমি। ভূমি অর্থ সাধন মার্গের স্তর। দশটি সাধন মার্গের ভূমি অতিক্রম করলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব পান। বিজ্ঞান, চিত্ত বা মনই একমাত্র সত্য [১]। আর সবই মিথ্যা। বিজ্ঞান মাত্রতাই পারমার্থিক সত্য। বিজ্ঞান দু'প্রকার—প্রকৃতি বিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াই প্রকৃতি বিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞান জ্ঞানসমষ্টি সকল ধর্মের বীজস্বরূপ। একে তথাগতগর্ভ বলা হয়। লঙ্কাবতারসূত্র ও শান্ত-রক্ষিতের তত্ত্ব সংগ্রহ এ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। আচার্য বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতাসিদ্ধি বিজ্ঞানবাদের সম্যক পরিচয় দেয়। যোগাচারের মতে দুটি নৈরাত্ম্য—পুদগলনৈরাত্ম্য ও ধর্মনৈরাত্ম্য। পুদগল নৈরাত্ম্যের জ্ঞান ক্লেশাবরণের নিরাকরণ এবং ধর্মনৈরাত্ম্যের জ্ঞেয়াবরণের নিরসনে হয়। মোক্ষ ও সর্বজ্ঞত্ব এ দু'টি নৈরাত্ম্যের দ্বারাই লাভ করা যায়। সত্য তিন প্রকার—পরিকল্পিত, পরতন্ত্র ও পরিনিষ্পন্ন। পরিকল্পিত ও পরতন্ত্র সত্য মাধ্যমিক সংবৃতি সত্যের সংগে এবং পরিনিষ্পন্ন সত্য

১। বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদমসদর্থাবভাসনাৎ।
যদ্বৎ তৈমিরিকস্যাসৎকেশোণ্ডুকাদিদর্শনম্॥
ন দেশকালনিয়মঃ সংতানানিয়মো ন চ।
ন চ কৃত্যক্রিয়া যুক্তা বিজ্ঞপ্তির্যদি নার্থতঃ॥

—'সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র, তাদের সত্যকার অস্তিত্ব নেই—তৈমিরিক বা চক্ষুপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের অলীক বস্তুসমূহের মত অবভাস মাত্র। ধর্ম যখন অলীক তখন দেশ এবং কালের পরিচ্ছেদ নেই, ক্ষণপ্রবাহও নেই, কৃত্যক্রিয়ার সমাধান বলেও কিছু নেই, কারণ ধর্মসমূহ প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানমাত্র।' আবার চিত্তমাত্রং ভো জিনপুত্রা যদুত ত্রৈধাতুকমিতি—হে জিনপুত্রগণ ত্রিধাতু বা সকল জগৎ চিত্তমাত্র।

পরমার্থ সত্যের সংগে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যোগাচার মতে সত্তা বিজ্ঞানমাত্রতা। কিন্তু মাধ্যমিক মতে এটি শূন্যতা। যোগাচারীরা সত্তাকে বিশেষণে বিশেষিত করে।

কালক্রমে পূর্বোক্ত চারটি সম্প্রদায় আবার দু'দলে বিভক্ত হয়—একটি হীনযান এবং অপরটি মহাযান। এ দু'টি সম্প্রদায় এখন বুদ্ধধর্মের প্রধান শাখা। আজও ভগবান বুদ্ধদেবের শাশ্বত অমৃত বাণী জগতে এদের প্রযত্নে প্রচারিত হচ্ছে। হীনযান সম্প্রদায় ছড়িয়ে পড়ে সিংহল, বর্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আর মহাযানেব প্রসাব হয় তিব্বত, নেপাল, চীন, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলে। যুবোপীয় পণ্ডিতেরা হীনযান ও মহাযানকে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর দেশের (Southein and Northern) বৌদ্ধধর্ম বলেন। কিন্তু এই আখ্যায় অভিহিত কবা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ দেশ বিভাগের উপব এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে—কোন মতবাদের উপর নহে।

মহাযান মতবাদ—মহাযানীবাই প্রাচীনদেব অর্থাৎ গোঁড়া রক্ষণশীল বৌদ্ধদেব হীনযান বলেন। হীনযানীবা নিজেদের কখনও হীনযান বলেন না। তাঁরা নিজেদের স্থবিরবাদী (থেববাদী) বলেন। হীনযানকে কেন হীন বলা হয় তা খ্যাতনামা মহাযানী আচার্য অসঙ্গের সূত্রালঙ্কার গ্রন্থপাঠে জানা যায়। নিম্নলিখিত বিষয়ে এ দু'টি সম্প্রদায়েব প্রভেদগুলি উল্লেখযোগ্য—

(ক) আশয়—উপদেশের আকাঙ্ক্ষা,

(খ) উপদেশ,

(গ) প্রয়োগ—উপদেশের প্রয়োগ,

(ঘ) আলম্বন—সাধনার সামগ্রী,

(ঙ) সাধনার কার্যসিদ্ধির সময়[১]।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মহাসাংঘিকেরা সাতটি দলে বিভক্ত। এসব শাখাগুলি মহাযান মতবাদের ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এরপর আবার ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি মহাযান হয়ে দাঁড়ান। তাই মহাসাঙ্ঘিকেরা মহাযানের প্রথম পথপ্রদর্শক। পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে মহাযান সম্প্রদায় মহাসাংঘিক বা অন্য কোন বিশেষ সম্প্রদায় হতে উদ্ভূত নহে—তিনি মনে

১। আশয়স্যোপদেশস্য প্রয়োগস্য বিরোধতঃ
উপস্তম্ভস্য কালস্য যৎ হীনং হীনমেব তৎ।

করেন মহাযানের উদ্ভব হয় একাধিক সম্প্রদায়ের অল্পস্বল্প মতবাদের গ্রহণ ও বর্জন হতে।

মহাযানের আদর্শ বুদ্ধত্ব লাভ—হীনযানের মত অর্হত্ব নহে। হীনযানীরা নিজেদের নির্বাণ ও অর্হত্ব প্রাপ্তির জন্য সতত ব্যগ্র---তাঁরা অপরের বিষয় চিন্তা করেন না। মহাযানীদের আদর্শ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত—এঁদের অতি মহান আদর্শ। এঁরা নিজেদের নির্বাণও চান না—তাঁরা চান জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করতে। জগতের সকলকে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করানোই মহাযানীদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাযানের আর একটি আদর্শ বোধিসত্ত্ববাদ। এঁদের মতে সকলেই বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে তবে তাঁদের প্রথমে বোধিসত্ত্ব হতে হবে। বোধিসত্ত্ব হতে হলে প্রথমে বোধিচিত্ত নিতে হয়। যে কোন লোক পরোপকারে আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা নিলে বোধিসত্ত্ব আখ্যা পায়। জগতের দুঃখ দূরীকরণের জন্য আকাশ ও জগতের স্থিতিকাল পর্যন্ত বোধিসত্ত্বেরা নিজেদের স্থিতি কামনা করেন[১]। আরও কামনা করেন যে জগতের যত সব দুঃখ যেন তাঁরাই ভোগ করেন। আর তাঁদের কুশল কর্মের জন্য যেন জগতে সুখ আসে[২]। তাই বোধিসত্ত্ব অবস্থা মহাযানপন্থীর কাম্য। এরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁরা বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হন। বোধিসত্ত্বকে আবার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য দশটি চর্যায় পূর্ণতা লাভ করতে হয়। চর্যাগুলিতে পূর্ণতা লাভই পারমিতা। হীনযানের মত মহাযানের দশটি পারমিতার উল্লেখ আছে। কিন্তু এ দু'টি সম্প্রদায়ের চর্যার নামে প্রভেদ আছে। মহাযানে প্রধানত দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা এই কয়টি পারমিতা পালনের উপব বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বোধিসত্ত্ব যখন ক্ষান্তি, বীর্য ও ধ্যান প্রভৃতি পারমিতায় দক্ষ হন তখন তাঁর মনোবৃত্তিও উর্ধ্বগামী হয়। করুণায় তাঁর চিত্ত ক্রমশ ভরপুর হয়ে ওঠে। এজন্য মহাযানে মনোবৃত্তির অবস্থা অনুসারে দশটি ভূমির কল্পনা করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে একে দশভূমি বলা হয়। এই দশটি ভূমি অতিক্রম করলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত

১। আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াৎ জগদ্দুঃখানি নিঘ্নতঃ॥

২। যৎ কিঞ্চিৎ জগতো দুঃখং তৎসর্বং ময়ি পচ্যতাম্।
বোধিসত্ত্বশুভৈঃ সর্বং জগৎ সুখিতমস্তু॥

হন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে হীনযানেও চারটি শুদ্ধ অবস্থার উল্লেখ আছে। যথা—স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্ব।

মহাযানে বুদ্ধের তিনটি কায়ের কল্পনা করা হয়েছে। এই তিনটি—নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায়। নির্মাণকায় মানুষরূপী বুদ্ধ। এ শরীরে তিনি জগতের হিতসাধন করেন। এদেহে আবার তিনি শ্রাবক, প্রত্যেকবুদ্ধ ও জনসাধারণকে দেশনা দেন। সম্ভোগকায় বুদ্ধের জ্যোতির্ময় কায়। এ দেহে তিনি বোধিসত্ত্বদের গূঢ় ধর্ম দেশনা দেন। ধর্মকায় বুদ্ধের শাশ্বত, বিশুদ্ধ ও চিরশান্ত অবস্থা। একে তথতা বলা হয়। নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায় বহু। ধর্মকায় কিন্তু এক। বোধিসত্ত্বেবা ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ দূর করে এ বিশুদ্ধ ধর্মকায় লাভ করেন। তাই বুদ্ধেব বিভিন্ন প্রকৃতি স্বীকার করা হয়। মহাযানীরা হীনযানীর মত শুধু পুদ্গল-নৈবাত্ম্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা পুদ্গল ও ধর্ম—উভয় নৈরাত্ম্যে বিশ্বাস করেন। হীনযানে শুধু আত্মা অস্বীকার করা হয়। মহাযানের মতে আত্মা ও জগতের সব কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এ সবই শূন্যগর্ভ।

মহাযানে চাবটি ব্রহ্মবিহার ভাবনার উপদেশ আছে। এ চারটি—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। অপরিমিত মানসে এ চারটি ভাবনা করলে চিত্তের প্রসন্নতা ও বিশুদ্ধি লাভ হয়।

মহাযানে বুদ্ধের দার্শনিক মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হীনযানে দর্শনের চেয়ে নৈতিক তত্ত্বে বেশী জোব দেওয়া হয়েছে। তাই মহাযান প্রধানত দর্শনমূলক আর হীনযান নীতিমূলক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির পৃথক আলোচনা সম্ভবপর নয়। এ দু'টি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এদের ভেদ অতি সূক্ষ্ম।

মহাযানের বিবর্তন—পরবর্তীকালে খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতক হতে মহাযান ধর্মে বিবর্তন দেখা দেয়। মন্ত্র, তন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম মহাযানে প্রবেশ করে। তন্ত্রবাদেরই হল প্রাধান্য। ফলে ধর্মজগতে উৎপত্তি হল এক অভিনব মহাযান ধর্মের। এই মহাযানকে সাধারণভাবে তান্ত্রিক মহাযান বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মে ভজন-পূজনের কোন ব্যবস্থা ছিল না—দেবতার সংস্রব ছিল না। কিন্তু ধর্মের কি হল বিরাট বিবর্তন!

এই রূপান্তরিত মহাযান হতে মন্ত্রযানের সৃষ্টি হয়। আবার বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান এই তিনটি ভাব ধারার উদ্ভব হয় এই মন্ত্রযান হতে। এখানে এই মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে :—

(১) **মন্ত্রযান**—মন্ত্রকে আশ্রয় করে সাধনার যে পথ তা মন্ত্রযান। বুদ্ধত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। বহু কঠোর সাধনার পর তবে এই জ্ঞান লাভ হয়। মন্ত্রযানমতে মন্ত্র, জপ, পূজা ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রভৃতি বুদ্ধত্ব লাভের প্রকৃষ্ট পথ। মোট কথা, মন্ত্রের উপর আস্থাই ছিল এই মতবাদের মূল।

(২) **বজ্রযান**—বজ্রক আশ্রয় কবে সাধনার যে পথ তাই বজ্রযান। জ্ঞান-সিদ্ধি নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় বোধিসত্ত্বই বজ্র[১]। কঠোর সাধনার ফলে বোধিচিত্ত স্থির স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এটি বজ্রের মত অভেদ্য, অচ্ছেদ্য ও অদাহ্য হয়। বোধিচিত্তের বজ্রস্বভাব লাভ হলে সাধকের বোধিজ্ঞান লাভ হয়। বোধিচিত্তের অর্থ চিত্তের এমন অবস্থা যা বোধি বা সম্যক্ জ্ঞান লাভের দৃঢ সংকল্প। কিন্তু বজ্রযান মতে মৈথুনযোগে চিত্তের যে চবম আনন্দ ভাব উৎপত্তি হয় তাই বোধিচিত্ত। যাঁরা বজ্রস্বভাব লাভ কবেছেন তাঁদের বলা হয় বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধব। বজ্রযানে গুরুই যথাসর্বস্ব। তিনি স্বয়ং হন বজ্রধারী।

(৩) **সহজযান**—বজ্রযান সাধনার সূক্ষ্মতর স্তর। এই মতে শূন্যতা প্রকৃতি ও করুণা পুরুষ। শূন্যতা ও করুণা উভয়েব মিলনেই বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে যোগমার্গে এক অনির্বচনীয় সুখের উৎপত্তি হয়। এই সুখেই তাদের মহাসুখ। এই সুখ এমন একটা অবস্থা যেখানে ভেদ জ্ঞান নাই। মোহ দূরীভূত হয় ও শূন্যতা জ্ঞান লাভ হয়—এটিই সহজ সুখ। সাধক এ অবস্থায় উপনীত হলে মুক্তি লাভ করেন। এ মতে পূজা, মন্ত্র, জপ প্রভৃতির কোন স্থানই নেই। সহজযানের অধিকাংশ গ্রন্থই তিব্বতীয় অনুবাদে সংরক্ষিত। দোহাকোষ ও চর্যাগীতি হতে এ সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির যথেষ্ট অভাস পাওয়া যায়।

(৪) **কালচক্রযান**—বজ্রযানের আর একটি সাধন মার্গ। কালচক্রযান মতে কালচক্র শূন্যতা ও করুণার প্রতীক। তার উৎপত্তি ও ক্ষয় কিছুই নেই। সহজেই জ্ঞান ও জ্ঞেয় সেখানে মিশেছে। সকলের উদ্ভব এই কালচক্রে। ত্রিকাল—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ত্রিকায়—সম্ভোগকায়, নির্মাণকায় ও ধর্মকায় তার

১। বোধিচিত্তং ভবেৎ বজ্রম্।

মধ্যে নিহিত। এ কালচক্রই সর্বজ্ঞ, মহাশূন্য ও আদিবুদ্ধ। এখানে সকল বুদ্ধেরই জন্ম। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তনশীল কালচক্রকে প্রতিরুদ্ধ করা এবং নিজেদের কালচক্রের ঊর্ধ্বে রাখা। তাঁরা আরো বলেন—যোগসাধনার দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ুকে আয়ত্বে আনতে পারলে প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ হয় এবং কালকে জয় করা যায়। এ সম্প্রদায়ের সাধনবিষয়ে তিথি, নক্ষত্র, যোগকরণ, রাশি প্রভৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করে। সুচন্দ্রের লঘু-কালচক্রতন্ত্রবাজটীকা বা বিমলপ্রভাটীকা প্রভৃতিতে কালচক্রযানের দার্শনিক মতবাদেব বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায়। জানা যায় রাজা রামপালের সমসাময়িক অভয়াকবগুপ্ত কালচক্র মতবাদেব উপর কযেকটি গ্রন্থ লিখেন। তিব্বতী ইতিবৃত্ত হতে জানা যায় লামা মতবাদের (Lamaism) উৎপত্তি হয় এই কালচক্রযান হতে।

এই সমস্ত মতবাদগুলি গুরুসর্বস্ব ছিল। সৎগুরুর উপদেশই ছিল মূল কথা। গুরুর প্রসাদে চরমকাম্য বস্তু লাভ হয়। গুরুব উপদেশ ছাড়া এঁদের সাধনার প্রণালী ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞান লাভ কবা অত্যন্ত কঠিন। গুরুরা দীক্ষিত শিষ্য ছাড়া কাউকেও ধর্মতত্ত্ব বোঝাতেন না। তাই ধর্মতত্ত্বগুলি গুরুশিষ্য পরম্পরা চলত। এজন্য মতবাদগুলির প্রসাব ও প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। সন্ধ্যা ভাষাই সম্প্রদায়গুলির ভাষা ছিল। সন্ধ্যা ভাষার সাধারণভাবে কথায় একরূপ অর্থ কিন্তু ভিতরে গূঢ় অর্থ। এই মতবাদগুলি একই ভাবধারা থেকে উদ্ভূত এবং এদেব পার্থক্য খুবই কম। যা হোক এই ধর্মমতগুলির লীলাভূমি ছিল পূর্বভারত—বাংলা দেশ (এখন পূর্বপাকিস্তান)।

সপ্তম অধ্যায়

বৌদ্ধ গৃহী

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় ভগবান বুদ্ধের ধর্মের গোড়ার দিকে গৃহীদের কোন স্থান ছিল না। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সংগে নিযে দেশে দেশে প্রচার করতেন তাঁর ধর্মমত। দলে দলে লোক সংসার ছেড়ে ভিক্ষু হয়ে যোগ দেন বুদ্ধের সংঘে। সংঘ গড়ে তোলাই ছিল তখন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি মনে করলেন গৃহীজীবন ব্রহ্মচর্যজীবনের ও তাঁর প্রচারিত নির্বাণ মার্গের পরিপন্থী। তাই গৃহত্যাগী ভিক্ষু নিযেই সৃষ্টি হয় বৌদ্ধধর্মের বনিযাদ। তাঁর প্রচারিত চারি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতি তত্ত্ব ও সত্য উপলব্ধি কবে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সচেষ্ট হওযাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মেব প্রধান লক্ষ্য। তখনও কিন্তু বৌদ্ধধর্মে আচার অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনাদির তেমন কোন উল্লেখ মেলে না।

বুদ্ধ তারপর ভাবলেন গৃহত্যাগীদেবও বেঁচে থাকাব জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের দবকার। কোন উদাসীন সম্প্রদায়ই গৃহস্থের বদান্যতা ছাডা বেঁচে থাকতে পাবে না। তাদের জীবিকার কোন সংস্থান নেই। ধনাগমেবও কোন পথ নেই। অন্নবস্ত্র প্রভৃতির জন্য তারা সততই গৃহীর উপব নির্ভব কবে। সুতরাং সংঘের উত্তবোত্তর প্রসারের সংগে গডে উঠল বৌদ্ধ গৃহীসম্প্রদায়ও। বৌদ্ধ সাহিত্যে গৃহী শিষ্যদের মধ্যে পুরুষদের উপাসক ও নারীদেব উপাসিকা বলা হয়। তাবা ভিক্ষুদের আহার, বিহার, ভৈষজ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয দ্রব্যাদি দান করত। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে গৃহীরা যে কোন সম্প্রদাযেব সন্ন্যাসীকে সম্মান প্রদর্শন করত ও দান দিত। এজন্যই বুদ্ধের নব প্রতিষ্ঠিত সংঘ গৃহীদের কাছ হতে দানাদি অনায়াসে লাভ করে দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গৃহীরা ভিক্ষুদের সেবা, যত্ন ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির প্রতি সদাই অবহিত থাকত। বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুদের চীবরাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দান করত ও ধর্মোপদেশ শুনত। ভিক্ষুরা সাধারণত তাদের দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের অপকারিতা, নৈষ্ক্রম্যের গুণ ইত্যাদি ধর্মোপদেশ দিতেন। পালি সাহিত্যে এরূপ দেশনাকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলা হয়। ফলে ভিক্ষুদের সংগে গৃহীদের

যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনাদি ধর্মের বেশ অংগ হয়ে উঠল। এ সব ধর্মানুষ্ঠানগুলো হল :—

(ক) ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ,

(খ) উপোসথ দিনে ধর্মোপদেশ শ্রবণ, পঞ্চশীল বা অষ্টশীল গ্রহণ,

(গ) বর্ষান্তে প্রবারণা উৎসবে ভিক্ষুদের চীবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র দান,

(ঘ) চারমহাপুণ্যস্থান দর্শন—বুদ্ধের জন্মস্থান (লুম্বিনী) সম্বোধি লাভ স্থান (বুদ্ধগয়া), ধর্মচক্রপ্রবর্তনস্থান (সাবনাথ) ও মহাপবিনির্বাণস্থান (কুশীনগর),

(ঙ) স্তূপ ও চৈত্যের পূজা[১]।

উৎকল বা উড়িষ্যা দেশ হতে আগত ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দু'জন বণিকই ভগবান বুদ্ধের সর্বপ্রথম উপাসক[২]। বুদ্ধগয়ায় সম্বোধি লাভ করার অনতিকাল পরেই বুদ্ধ এ দু'জনকে উপাসক করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এদের বলা হয় দ্বেবাচিক উপাসক। তাঁরা বুদ্ধের ও ধর্মের শরণ নিয়ে হন বৌদ্ধ উপাসক—তখনও সংঘের উৎপত্তি হয় নি। তারপর যশের পিতা বারাণসীতে হলেন বুদ্ধের তৃতীয় উপাসক। তাঁকেই বলা হয় তেবাচিক উপাসক—ইনিই হলেন জগতের সর্বপ্রথম তেবাচিক উপাসক। সংঘের তখন উৎপত্তি হয়েছিল। সেজন্য তাকে সংঘেরও শরণ নিতে হয়েছিল। মোটকথা, তাকে ত্রিশবণ (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) নিয়েই উপাসক হতে হয়েছিল। অতঃপর ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সম্প্রদায় হতে দলে দলে লোক বুদ্ধের উপাসক হয়ে তাঁর সেবা করত। বৌদ্ধ গৃহী হওয়ার জন্য বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা জানা যায় না। গৃহীরা সচরাচর ধর্মোপদেশ শুনে প্রীত হয়ে এরূপ উক্তি করে উপাসক হত :—

অভিক্কন্তং, ভো গোতম! অভিক্কন্তং, ভো গোতম! সেয্যথাপি, ভো গোতম, নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য, চক্খুমন্তো রূপানি দক্খন্তী তি, এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেকপরিয়ায়েন ধম্মো পকাসিতো। এতে ময়ং

১। চৈত্য তিন প্রকার—শারীরিক, পারিভোগিক ও উদ্দেশিক।

২। উপসতি পরিরূপাসতীতি উপাসকো—যে সেবা বা পরিচর্যা করে তাকেই উপাসক বলা হয়।

ভবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছাম ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। উপাসকে নো ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্‌গে পাণুপেতে সরণগতেতি।

—হে গৌতম! অতি সুন্দর! অতি মনোরম! যেমন কেউ উল্টোকে সোজা, আচ্ছাদিতকে অনাচ্ছাদিত, পথভ্রান্তকে ঠিক পথ প্রদর্শন করে বা অন্ধকারে আলো তুলে ধরে, যাতে চক্ষুষ্মান লোক রূপ দেখতে পায়। সেরূপ বুদ্ধও অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রচার করেছেন। প্রভু, আমরা ভগবানের শরণ নিচ্ছি, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। আজ হতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদিগকে উপাসক করে নিন।

পালি নিকায় ও শুভাকরগুপ্তের আদিকর্মরচনা নামক গ্রন্থ হতে জানা যায় কেউ ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) নিলেই তাকে বৌদ্ধ গৃহী বলা হয়। বর্তমানে সুদক্ষ ভিক্ষু ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল দান করে প্রার্থীকে বৌদ্ধ গৃহী করেন। পরিশেষে তিনি স্বস্তিবাচক পরিত্রাণ পাঠ করেন ও নব দীক্ষিতকে ধর্মোপদেশ দেন।

পালি নিকায়ে সদ্ধর্মের শ্রোতাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে :— ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি। অঙ্গুত্তরনিকায়ে এদের বৃত্তির উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয়েরা রাজশক্তি নিয়ে প্রজা শাসন করত। ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ পূজার্চনা ও মন্ত্র নিয়ে থাকত। গৃহপতিরা ব্যস্ত থাকত ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্যান্য কারুকর্ম নিয়ে। তাছাড়া ধনী, দরিদ্র, শ্রেষ্ঠী, কৃষক, ছুতার, কর্মকার ও অন্যান্য বৃত্তিধারী লোকেরা ও বুদ্ধের গৃহীশিষ্য হল। গৃহপতিরা সোনারূপা, অট্টালিকা, ভূসম্পত্তি, রূপবতী নারী, দাসদাসী নিয়ে প্রায়ই সুখে জীবন অতিবাহিত করত। বুদ্ধ তাদের আত্মসচেতন হতে, আপন লব্ধ শ্রমেব দ্বাবা পরিবার পোষণ করতে, কল্যাণমিত্রের সংসর্গে আসতে এবং সৎগুণ অর্জন করতে বলেন। গৃহপতিরা বুদ্ধেব ধর্মকথায় তুষ্ট হয়ে শ্রদ্ধাভবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের অর্থাৎ ত্রিরত্নের মহিমা কীর্তন করত। পালি নিকায় গ্রন্থে গৃহপতিবর্গ নামে কয়েকটি পরিচ্ছেদ আছে। এতে বিশেষ করে গৃহপতিদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ যে সব ধর্মোপদেশ দিয়েছেন সে সব বর্ণিত আছে। এখানে শীল, কর্মফল, গৃহপতি ও গৃহপত্নীর আদর্শ ও বৌদ্ধধর্মের প্রধান তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। নীতিতত্ত্ব ও দর্শনের আলোচনাও এতে আবার রয়েছে। গৃহপতিবর্গে গৃহপতিদের প্রতি বুদ্ধের উপদেশাবলী বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকাদের অবশ্য পালনীয়। নিকায়ে গৃহপতি কর্তব্য এরূপে বর্ণিত আছে—

(ক) মাতাপিতার ভরণপোষণ,

(খ) জ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন,

(গ) প্রিয়বাক্য ব্যবহার,

(ঘ) রূঢ়বাক্য পরিহার,

(ঙ) কৃপণতা পরিত্যাগ,

(চ) দান দেওয়া,

(ছ) সত্য কথা বলা,

(জ) ক্রোধ না করা ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়া গৃহপতিদের আরও কতকগুলি কর্তব্যের নির্দেশ আছে—

(ক) বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধা,

(খ) ধর্মের মহিমা কীর্তন,

(গ) সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন,

(ঘ) দান করা—এমন কি নিজ পত্নীকেও দান করা,

(ঙ) ধর্মকথা শ্রবণে আগ্রহ,

(চ) পঞ্চনীবরণ[১] হতে বিমুক্ত।

জানা যায় গৃহপতিদের সাতটি বিশেষ গুণ হল—শ্রদ্ধা, শীল, হ্রী, অপত্রাপ্য, বহুশ্রুত, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা। গৃহপতিরা চারটি সংগ্রহবস্তু যথাযথ পালন করেন,। যথা—দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্যা, সমানর্থতা। পালি দীঘনিকায়ের লক্‌খণ ও সিগালোবাদসুত্ত হতেও বৌদ্ধ গৃহীদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানা যায়। লক্‌খণসুত্তে উল্লেখ আছে --

(ক) কুশল কাজ করা,

(খ) দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক কাজ ও চিন্তা হতে বিরত থাকা,

(গ) দানশীল হওয়া,

(ঘ) উপোসথ দিনে পঞ্চশীল বা অষ্টশীল পালন করা,

(ঙ) শ্রমণ ব্রাহ্মণদের দান করা,

(চ) কলহকারীদের কলহ প্রশমন করা,

(ছ) মাতাপিতার সেবা করা,

(জ) ক্রোধ বা দ্বেষ পোষণ না করা,

(ঝ) শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের নিকট ধর্মোপদেশ শুনা,

(ঞ) নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধন করা,

১। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা।

(ট) অন্যের প্রতি সৌজন্য ইত্যাদি।

সিগালোবাদসুত্তে গৃহীদের আরও কিছু উপদেশ মেলে। এ সুত্তটিকে আবার গৃহীবিনয়ও বলা হয়। বুদ্ধের এ উপদেশগুলো হল—:

(ক) প্রাণিহত্যা হতে বিরতি,

(খ) মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি,

(গ) ব্যভিচার হতে বিরতি,

(ঘ) সুরাপান হতে বিরতি,

(ঙ) নাচ-গান, বাজনা প্রভৃতি না দেখা বা শুনা,

(চ) ছন্দ, দ্বেষ, মোহ বা ভয়ের বশে কোন অসৎ কাজ না করা,

(ছ) মাতাপিতা, আচার্য ও উপদেষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা,

(জ) দাসদাসী প্রভৃতির প্রতি অবহিত হওয়া,

(ঝ) শ্রমণ ব্রাহ্মণকে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করা,

(ঞ) সকলের কল্যাণ কামনা করা,

(ট) পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করা,

(ঠ) দ্যূতক্রীড়া ও স্বার্থপর বন্ধুব সংসর্গ ত্যাগ করা ইত্যাদি।

ধম্মপদে গৃহীদের আবার নৈতিক শিক্ষার কথা আছে। গৃহীরা কিভাবে জীবন যাপন করলে নৈতিক উন্নতি লাভ করতে পারে, তাই এখানে বলা হয়েছে। যেমন—

সুখা মত্তেয্যতা লোকে অথো পেত্তেয্যতা সুখা।
সুখা সামঞ্‌ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্‌ঞতা সুখা॥
সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্‌ঠিতা।
সুখো পঞ্‌ঞায পটিলাভো পাপানং অকরণং সুখং॥

—জগতে মাতা ও পিতার সেবা সুখকর। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা জগতে সুখদায়ক। বার্ধক্য পর্যন্ত শীল পালনই সুখকর। শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সুখদায়ক। প্রজ্ঞা লাভই সুখজনক। পাপ না করাই সুখাবহ।

এছাড়া পালি মিলিন্দপঞ্‌ঞ-এ গৃহীদের আরও কতকগুলি উপদেশ রয়েছে। সেগুলি হল—

(ক) গৃহী সংঘের অভ্যুদয়ে সুখ ও বিপর্যয়ে দুঃখ,

(খ) ধর্মই গৃহী জীবনের কাম্য,

(গ) সদ্ধর্মের অবনতিতে তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সততই সচেষ্ট হওয়া,

(ঘ) সম্যক্ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া,

(ঙ) কর্ম ও বাক্যে সুসংযত হওয়া,

(চ) ঐক্য রক্ষা করা,

(ছ) মাৎসর্য ত্যাগ করা,

(জ) ধর্মবিষয়ে কপটতা পরিহার করা।

পালি বিনয়পিটকে গৃহীর শীল পালনের ফলের কথা বর্ণিত আছে। উল্লেখ আছে শীল পালনে গৃহী ধনসম্পত্তি, যশ, সজ্ঞানে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর দিব্যজীবন লাভ করে।

গৃহপতিদের মধ্যে বুদ্ধের উল্লেখযোগ্য গৃহীশিষ্য হল হথারোহপুত্ত, কপিলাবস্তুর মহানাম, পোতলীয় গৃহপতি, জীবক, উপালি গৃহপতি, পুন্ন কোলিয়পুত্ত, অচেল, সেনিয়, অভয়রাজকুমার ও অনাথপিণ্ডদ। তাছাড়া গৃহপত্নীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—নকুলমাতা, সুজাতা, বিশাখা, খুজ্জুত্তরা, সামাবতী, উত্তরা নন্দমাতা, সুপ্পবাসা কোলীয়ধীতা, সুপ্পিয়া কাত্যায়নী, আম্রপালী আরও অনেকে। বুদ্ধ নারীদেরও উপদেশ দিয়েছেন- সুপাত্র, সুপুত্র, সুখৈশ্বর্য ও সুখপূর্ণ জীবন লাভের জন্য নারীদেব শীলাদি পালন ও দান করতে বলেছেন। তাদের আবার শান্ত, ভদ্র, মিতব্যয়ী, গৃহকাজে দক্ষ, পতিকূলে গুরুজনদের ভক্তি, সেবাশুশ্রূষা, আজ্ঞা পালন এবং দাসদাসীব প্রতি নম্র ব্যবহারের কথা বলেছেন। নারীরাও বুদ্ধের ধর্মোপদেশ মন দিয়ে শুনত। তারা জ্ঞানার্জনেও ব্রতী হত। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে নারীবাও আবার পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠে।

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, গ্রামণী[১], পরিব্রাজক, শ্রেষ্ঠী, রাজা এবং আরও অনেকে বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হন। তাঁরাই সংঘের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মেটাতেন। পালি মহাবগ্‌গ ও চুল্ল বগ্‌গে সংঘের প্রতি গৃহীদের বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত গৃহীরাই ভিক্ষুসংঘের ভরণপোষণের একপ্রকার মেরুদণ্ড। মহাপরিনির্বাণ লাভ করার আগে আনন্দ বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান নির্দিষ্ট করেন চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী; সাকেত, কৌশম্বী ও বারাণসী প্রভৃতি নগরগুলিকে। তিনি মনে করেন সেখানকার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি প্রভৃতি বুদ্ধের গৃহী শিষ্যেরা বুদ্ধের ধাতু পূজা করতে সমর্থ হবে। সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায় হতে

১। ইনি ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। এঁর হাতে গ্রামের ভার দেওয়া হত।

জানা যায় মহানাম শাক্য বৌদ্ধ উপাসকদের অন্য সম্প্রদায়ের উপাসক হতে তফাৎ করবার লক্ষণ কি—সে সম্বন্ধে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ উত্তরে বলেন যে, কেউ ত্রিশরণ নিলে তাকেই উপাসক বলা হয়। কিন্তু অন্যত্র কথা প্রসংগে জানা যায় উপাসককে ত্রিরত্নে অবিচলিত শ্রদ্ধা ছাড়াও শীলাদি পালন করতে, বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপাদি না করতে ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংঘকে দান না দিতে বলা হয়েছে। পুক্কুস মল্লপুত্ত, উপালি গৃহপতি ও অভয়রাজকুমার আপন আপন গুরু ত্যাগ করে বুদ্ধের গৃহী শিষ্যত্ব নেন। নিকায়ে বৌদ্ধ গৃহীদের স্বরূপের বিশেষ কোন লক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এতে কখনও কখনও গৃহীদের আচরণের কথা উল্লেখ করে বৌদ্ধ গৃহীকে অন্য সম্প্রদাযের গৃহী হতে প্রভেদ করা হয়েছে মাত্র। যেমন বৌদ্ধ উপাসকেরা ধর্ম দেশনার সময় উচ্চস্বরে বাদানুবাদ পছন্দ করে না। নীরবে আগ্রহ সহকারে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শোনে। শ্রাবস্তীতে গৌতম বুদ্ধের যত প্রধান প্রধান উপাসক আছেন তাঁদের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত পঞ্চকংগো ভাস্কর অন্যতম—এ ভাবে মাঝে মাঝে বৌদ্ধ উপাসককে চিহ্নিত করা হয়েছে মাত্র। উপাসকদের পঞ্চ বাণিজ্য নিষেধ কবা হযেছে। যথা—জীববাণিজ্য, মাংস-বাণিজ্য, সুরাবাণিজ্য, অস্ত্রবাণিজ্য ও বিষবাণিজ্য।

শীলাদি রক্ষা করা ছাড়া উপাসক-উপাসিকারা ভিক্ষুদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ভৈষজ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দান করে। তাদের বিশ্বাস ভিক্ষুদের দান কবলে পুণ্য হয় এবং এ পুণ্যেব ফলে তারা পবজন্মে দীর্ঘায়ু, অটুট স্বাস্থ্য, অপরূপ সৌন্দর্য ও ভোগ সম্পদ লাভ করে। সেজন্য বৌদ্ধ গৃহীরা দ্বিধাহীন চিত্তে সানন্দে দান দেয়। বর্ষাবাসের পব বিহাবে প্রবারণা উৎসব হলে গৃহীরা ভিক্ষুদের চীবর ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দান করে। উপোসথের দিনে বৌদ্ধ গৃহীরা বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল বা অষ্টশীল গ্রহণ করে। তারা ঐ দিনের প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই বিহাবে ভিক্ষুদের নিকট ধর্মকথা শোনে। কেউ কেউ বা চল্লিশটি কর্মস্থানের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে ভাবনা করে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হেতু অনেকে আবার অকুশল চিন্তা ত্যাগ করে চিত্ত সংযম লাভ করে ও ধ্যানস্থ হয়। নিকায় হতে জানা যায় চিত্তগৃহপতি ও উত্তরা নন্দমাতা ধ্যানে দক্ষতা লাভ করেন। কোন কোন উপাসক আবার চারটি ব্রহ্মবিহার অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করে ও স্মৃত্যুপস্থান অভ্যাস করে। সিরিভদ্দ ও মানদিন্নাকে রোগের তীব্র

যন্ত্রণা দূর করার জন্য স্মৃত্যুপস্থান অভ্যাস করতে বুদ্ধ উপদেশ দেন। বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ নারী ভক্তদের অন্যতমা সামাবতী মৈত্রী ভাবনা করেন। খুজ্জমাতা পটিসম্ভিদাজ্ঞান লাভ করেন। নন্দমাতা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে খ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং নারীরা নৈতিক কেন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভেও সক্ষম হয়েছিল।

বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যেরা গৃহীদের প্রথমে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন না। গৃহীদের ধীশক্তি বুঝে ধর্মোপদেশ দেওয়া হত। পূর্বেই বলেছি গৃহীদের প্রথমে দানকথা, শীলকথা এবং স্বর্গকথা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হত। তাদের মন ধর্মে প্রসাদ লাভ করলে, সংসার জীবনের অসাবত্ব ও সন্ন্যাস জীবনের সুফল সম্বন্ধে ধর্মদেশনা দেওয়া হত। পরিশেষে দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ, ও মার্গ সম্বন্ধে তাদের উপদেশ দেওয়া হত। বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্র বুদ্ধভক্ত অনাথাপিণ্ডদকে মৃত্যুশয্যায় ধর্ম দেশনা করেন। ইহা শুনে তিনি আপন যন্ত্রণা হতে মুক্তি পান। এরূপে গৃহীরাও গভীর তত্ত্ব আয়ত্ব করতে পারত। তারা যদিও শ্বেত বস্ত্র পরিহিত কিন্তু তারা ভিক্ষুদের মত আধ্যাত্মিক চিন্তায় উন্নত হতে সমর্থ হত।

গৃহীরা বিশ্বাস করে যে পুণ্য কাজের ফলে মানুষ দেবলোকে দেবতা এমন কি দেবরাজ ইন্দ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। বিমানবথ্থুতে কর্মতত্ত্বকে অবলম্বন করে স্বর্গ বিষয়ক প্রচুর বিবরণ মেলে। পুণ্যের ফলে গৃহীরা ও যম, তুষিত, চাতুর্মহারাজিক প্রভৃতি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে অষ্টশীল পালনের দ্বারা যোড়শ মহাজনপদের রাজাও হওয়া যায়।

গৃহীরা আপন চরিত্রশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়। নিকায় হতে জানা যায় বুদ্ধভক্ত অনাথপিণ্ড ও অন্য নব্বই জন উপাসক সকৃদাগামী লাভ করে এবং আরও পাঁচশো গৃহী স্রোতাপত্তি লাভ করে। ককুধ নামক একজন গৃহী অনাগামী ফল লাভ করে। এরূপে কালিঙ্গ, নিকট, কতিস্সভ, তুট্ঠ, ভদ্দ, সুভদ্দ এবং আরও অনেক গৃহী আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে। শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেও তারা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী ফল লাভ করে।

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গৃহীদের পূজা-অর্চনা ও অনুষ্ঠানাদি বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধের সময়েও অবশ্য গৃহীদের চৈত্যও স্তূপ গড়ে পূজা করার কিছু পরিচয় মেলে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বৈশালী নগরের আশে পাশে গোতমক, সত্তম্বক, বহুপুত্ত নামক চৈত্যের নাম

পাওয়া যায়। তাছাড়া উদেন, সারন্দদ, চাপাল, আনন্দ (ভোগনগর), মল্লদের মকুটবন্ধন নামক আরও চৈত্যের উল্লেখ আছে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম বহির্ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে। দেশ বিদেশে হাজার হাজার লোক বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘে আশ্রয় নিল। বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিস্তারের সংগে সংগে বৌদ্ধ সংঘ ও গৃহী শিষ্যদের আচার অনুষ্ঠান ও পূজার্চনাদি বেড়ে গেল। অনেকে মনে করেন অশোক নিজেও বৌদ্ধ উপাসক হন। বৈরাট শিলালেখ হতে জানা যায় তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বৌদ্ধ গৃহী হিসাবে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম এবং সংঘের উন্নতি ও হিতার্থে অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেন। তিনি প্রতিদিন শত শত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের আহার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করতেন। কথিত আছে, তিনি জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) ৮৪,০০০ বিহার নির্মাণ করান। নেপালের তরাই অঞ্চলে নিগলভা নামক স্থানে পূর্ববুদ্ধ কনকমুনির স্তূপ সংস্কার করেন ও পূজা করেন। সংঘভেদ বন্ধ করার জন্য তিনি সাঁচী ও সারনাথে অনুশাসন লিপি খোদাই করান। তিনি মহামাত্রগণ সহ ধর্মযাত্রায় বের হয়ে বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনী ও সম্বোধি লাভের স্থান বুদ্ধগয়া দর্শন করেন এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণদের দান দেন।

অশোকোত্তর যুগে বৌদ্ধ গৃহীদের পূজা ও অনুষ্ঠানাদি সহস্রধারায় বেড়ে উঠল। ভারতে ও বহির্ভারতে শত শত বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, চৈত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গড়ে উঠল বৌদ্ধ গৃহীদের বদন্যতায় ও বৌদ্ধ রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়। বুদ্ধমূর্তিপূজা, চৈত্যপূজা, চার মহাপুণ্য স্থান দর্শন এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অচল শ্রদ্ধার মাধ্যমে বৌদ্ধ চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠানাদি বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলে। এ জনপ্রিয় বৌদ্ধতত্ত্ব ও বৌদ্ধ গৃহীদের আচার অনুষ্ঠানাদি কিরূপ বিস্তৃত ও বিকাশ লাভ করেছিল তার বিবরণ মেলে মহাযান ও তদ্ভূত অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহিত্যে।

অষ্টম অধ্যায়

বৌদ্ধ সাহিত্য

বুদ্ধ তথাগত জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় মৌখিক উপদেশ দিতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে বুদ্ধ তার ধর্ম সমূহ কোনও ভাষায় লিপিবদ্ধ করে যান নি। গুরুশিষ্যের মুখ পরম্পরায় এসব উক্তি চলত। তাঁর মহাপরিনির্বাণের (প্রায় খৃঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দ) কিছু পরে রাজগৃহে সপ্তপর্ণিগুহায় রাজা অজাতশত্রুর সমর্থনে স্থবির মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় সদ্ধর্মের স্থায়িত্বের জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় ৫০০ ভিক্ষু যোগ দেন এবং স্থবির মহাকাশ্যপ এতে নেতৃত্ব করেন। ইতিহাসে এটিই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বলে খ্যাত। এই সঙ্গীতিতে প্রথম বুদ্ধবচন সংগ্রহ করা হয়। ভিক্ষু আনন্দ ধর্মবিষয়ে যে সব বুদ্ধবচন আবৃত্তি করেন তা ধর্ম বলে অভিহিত হয়। আর ভিক্ষু উপালির বিনযবিষয়ক রচনাবলী বিনয় আখ্যা পায়। অভিধর্মপিটকের আলাদা অস্তিত্ব তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এ থেকে অনুমান করা যায় বৌদ্ধশাস্ত্রের দুটি অঙ্গ ছিল। অভিধর্ম ছিল ধর্মের অঙ্গ। তথাগতের মহাপরিনির্বাণের ১০০ বছর পরে বৈশালীতে রাজা কালাশোকের আনুকূল্যে মহামতি যশ মহাস্থাবিরের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসম্মেলনে ৭০০ ভিক্ষু যোগ দেন। সঙ্গীতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাবিষয়ক বিধানগুলি আলোচিত হয়। অভিধর্মপিটকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তখনও কোন সন্ধান মেলে না। মোটকথা, ধর্ম-বিনয়বিষয়ক বচনাবলী সংগ্রহ প্রথম সঙ্গীতের এবং ভিক্ষুদের বিনয় গর্হিত আচার ব্যবহারের বিচার ছিল দ্বিতীয় সঙ্গীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২০০ বছর পরে পাটলিপুত্র নগরে (বর্তমান পাটনা) সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় সঙ্গীতি আহূত হয়* এক হাজার ভিক্ষু এই মহাসম্মেলনে যোগ দেন। খ্যাতনামা মোদ্‌গলিপুত্র (মোগ্‌গলি পুত্ত) তিষ্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে সংকলিত বৌদ্ধশাস্ত্রের সূত্র ও বিনয় পিটক পুনরায় এই সভায় সমালোচিত ও স্বীকৃত হয় এবং অভিধর্মপিটকের আলাদা অস্তিত্বও প্রচারিত হয়।

ভিক্ষুপ্রবর মোদ্‌গলিপুত্র তিস্য অভিধর্মপিটকের কথাবস্তু (কথাবত্থু) গ্রন্থ নিজেই সংকলন করেন। ধর্ম ও বিনয় এই দু'ভাগে বিভক্ত বুদ্ধবচন তৃতীয় সঙ্গীতিতে তিনভাগে বিভক্ত হয়। যথা সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক। ধর্মের হয় দুটি ভাগ—একটি সূত্রপিটক অপরটি অভিধর্মপিটক। ধর্মের স্থান দখল করল সূত্র ও অভিধর্ম।

পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি বা পাত্র। কিন্তু পালিতে পিটক শব্দ কোন দ্রব্য রাখার বাক্স বা আধার অর্থে গৃহীত হয় না। এটি কিংবদন্তী (Tradition) অর্থে ব্যবহৃত হয়। খনন কার্যে যেমন মৃত্তিকা খনিত স্থান হতে ঝুড়িতে ঝুড়িতে শ্রেণীবদ্ধ মজুরদের হাতে হাতে অপর স্থানে অপসারিত হয়, সেরূপ ত্রিপিটকও পুরাকাল হতে অদ্যাবধি গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে পিটকের পারিভাষিক অর্থ গ্রন্থের আধার ও আধেয়। পূর্বেই বলা হয়েছে এই পিটকগুলি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগে বিভক্ত পিটকই বৌদ্ধ শাস্ত্রে ত্রিপিটক নামে খ্যাত।

ত্রিপিটক আবার বৌদ্ধ সাহিত্যে পারিভাষিক অর্থে বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতিতে ভরপুর বিরাট শাস্ত্র বলে অভিহিত। সাধারণত সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক—এই তিনটি ত্রিপিটকের ক্রম। অনেক সময় এই ক্রমেরও একটু পরিবর্তন দেখা যায়—সূত্রের স্থানে বিনয়ের নাম। বৌদ্ধেরা নিজেরাই বিনয়পিটককে ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগে স্থান দিয়েছেন। এই বিভাগই সাধারণত প্রচলিত। স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের মত অপরাপর সম্প্রদায়গুলির ত্রিপিটক ছিল। কিন্তু ত্রিপিটকগুলির ভাষা ছিল বিভিন্ন। স্থবিরবাদের (থেরবাদের) ভাষা ছিল পালি। সর্বাস্তিবাদীদের মিশ্র সংস্কৃত, সম্মিতীয়দের অপভ্রংশ ও মহাসাংঘিকদের প্রাকৃত। পূর্বেই বলা হয়েছে মহাসাংঘিকদের সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম, প্রকীর্ণক এবং ধারণী—এই পাঁচভাগে বিভক্ত পিটক ছিল। স্থবিরবাদীদের (থের) পালি ত্রিপিটক ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ ত্রিপিটক আজও পাওয়া যায় নি—মূলগ্রন্থ অধিকাংশই বিলুপ্ত। তবে দু'একটি সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থ তিব্বতী ও চীনা অনুবাদে লিপিবদ্ধ আছে। সর্বাস্তিবাদীদের ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্মের কয়েকটি গ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি মধ্যএশিয়া ও গিলগিটে (কাশ্মীর) পাওয়া গেছে। গিলগিটে আবিষ্কৃত পুঁথিপত্রগুলি এখন ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে দিল্লীতে সংরক্ষিত রয়েছে।

মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির কিছু কিছু এখন প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ও আমাদের শ্রদ্ধেয় আচার্য ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় গিলগিটে আবিষ্কৃত বিনয়ের কতক পুঁথিপত্র গিলগিট খণ্ড নামক গ্রন্থগুলিতে (Gilgit Volume) প্রকাশ করেছেন। সেখানে আবার তিনি এদের মুখবন্ধে পালি বিনয়ের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে সর্বাস্তিবাদের ত্রিপিটকের ভাষা ছিল সংস্কৃত—সমীকৃত আংশিক সংস্কৃত ও আংশিক প্রাকৃত। একে মিশ্রিত সংস্কৃত নামে অভিহিত করা হয়। এটি সংস্কৃত মিশ্রিত মধ্য ভারতের চলতি ভাষা বলে পরিচিত। এটিকে আবার বৌদ্ধ সংস্কৃত (Buddhist Sanskrit) ও বলা হয়।

স্থবিরবাদের সম্পূর্ণ ত্রিপিটক পাওয়া যায়। এই ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। অনেকের মতে পালি মাগধী প্রাকৃত। বুদ্ধ মগধে অধিকাংশ সময়ই কাটান এবং এখানে নিজেই ধর্ম প্রচার করেন। তিনি ঐ দেশের ভাষায় জন-সাধারণকে ধর্ম দেশনা দিতেন। তাই অনুমান করা যায় বৌদ্ধশাস্ত্র সম্ভবত এই দেশের ভাষাতে রচিত হয়। অনেকে মনে করেন পালি পৈশাচী প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যরূপ। কেউ কেউ বলেন পালি কলিঙ্গের ভাষা। এখান হতে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে ক্রমশ সিংহলে প্রবেশ করে। আবার অনেকে মনে করেন শৌরসেনী প্রাকৃতই পালির বুনিয়াদ। যা হোক এখনও গবেষক মহলে এ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

কথিত আছে সম্রাট অশোক তার পুত্র মহেন্দ্রকে সদ্ধর্ম প্রচারার্থে সিংহলে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি এই ত্রিপিটক—বিনয, সূত্র ও অভিধর্ম—তাঁর সাথে নিয়ে যান। কেউ কেউ আবার মনে করেন তিনি সমস্ত ত্রিপিটক শাস্ত্র মুখস্থ করে সিংহলে যান। যা হোক জানা যায় সেখানে রাজার আনুকুল্যে সদ্ধর্মের বেশ প্রতিষ্ঠা হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রাজা বট্টগামিনীর নির্দেশে সিংহলে এই ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। সিংহলের বৌদ্ধদের মতে এই ত্রিপিটক এবং সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালে তৃতীয় সঙ্গীতিতে সংকলিত ত্রিপিট এক এবং অভিন্ন। অনেকে এ মত সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন এই ত্রিপিটক তৃতীয় সংগীতিতে সংকলিত ত্রিপিটকের অনুরূপ নহে। এটি একটি সংস্করণ। মূল ত্রিপিটক যা মাগধী ভাষায় রচিত তা হতে পালি ও সংস্কৃত

ত্রিপিটক উদ্ভূত। সংস্কৃত ত্রিপিটকের যা খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে তা হতেও এ মত সমর্থিত হয়। পালি ত্রিপিটক ছাড়াও সিংহলে পরবর্তীকালে বহু পালি গ্রন্থ রচিত হয়—অধিকাংশই টীকা ও টিপ্পনী গ্রন্থ। সাহিত্য ও দর্শনের ইতিবৃত্তের দিক দিয়েও গ্রন্থগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রের ত্রিপিটকে আবার নয়টি বিভাগ দেখা যায়। যথা—সুত্ত (সুত্র) —গদ্যে উপদেশ, গেয্য—গদ্যে ও পদ্যে ধর্ম উপদেশ; বেয্যাকরণ (ব্যাকরণ) —ব্যাখ্যা, টীকা, গাথা—(শ্লোক); উদান—সারগর্ভ বচন; ইতিবুত্তক—ক্ষুদ্র ভাষণ; জাতক—বুদ্ধের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত, অব্ভুতধম্ম (অদ্ভুতধর্ম)— অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ এবং বেদল্ল—প্রশ্নোত্তর ছলে ধর্মোপদেশ—একে নবাঙ্গশাস্তাশাসন (নবঙ্গসথুসাসন) বলা হয়। পালিসাহিত্যে এই নয় বিভাগ সাহিত্যের নয় প্রকাব ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নহে। এগুলি নয় প্রকার রচনার নিদর্শন। কারণ থের-থেরীগাথা, ইতিবুত্তক এবং জাতকে গাথা, ইতিবুত্তক ও জাতকজাতীয় রচনার লক্ষণ পাওয়া যায়। অঙ্গুত্তরনিকায়ে এই নয় প্রকার রচনারই লক্ষণ বর্তমান আছে। জানা যায়, বৌদ্ধ সাহিত্যে এই বিভিন্ন রচনাগুলির নিদর্শন বৌদ্ধশাস্ত্রের বর্তমানকালেব সংকলন হতে অস্তিত্ব ছিল।

পালি ত্রিপিটকেব স্বরূপ এখন নির্ণয় করা হচ্ছে। বৌদ্ধদের নিজেদের মতে ত্রিপিটকের প্রথম ভাগ বিনয়, দ্বিতীয় ভাগ সুত্ত এবং তৃতীয় ভাগ অভিধম্ম। এখানে আমবা এই বিভাগ অনুসারে পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির আলোচনা করছি :—

বিনয়পিটক

বিনয়পিটকে সংঘের নিয়ম-কানুন এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য পালনীয় আচার-ব্যবহার লিপিবদ্ধ আছে। এতে আণাদেশনা অর্থাৎ বিধিনিষেধের আধিক্য আছে। এটি শীল বিষয়ক—শীলই এর প্রধান বিষয়বস্তু। ভিক্ষুদের মতে বিনয়ই বুদ্ধ শাসনের ও শিক্ষার আয়ু। বিনয়ের অস্তিত্বেই শাসন ও শিক্ষার অস্তিত্ব থাকে[১]। নির্বাণলাভের এটিই প্রধান সোপান[২]। এ বিনয়পিটক তিন ভাগে বিভক্ত—(ক) সুত্তবিভঙ্গ, (খ) খন্ধক ও (গ) পরিবার।

১। বিনয়ো নাম বুদ্ধসাসনস্‌স আয়ু, বিনযে ঠিতে সাসনং ঠিতং হোতি।

২। বিনয়ো অনুপ্পাদগবিনিব্বানথায।

(ক) **সুত্তবিভঙ্গ**—সুত্তবিভঙ্গের প্রধান অঙ্গ পাতিমোক্‌খ। এটিই বিনয়-পিটকের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। পাতিমোক্‌খকে বিনয়পিটকের ভিত্তি বলা হয়। এতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় শিক্ষাপদের এবং এগুলির ব্যতিক্রমে তাঁদের যে অপরাধ হয় তার অনুরূপ দণ্ডেরও বিধান আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে একজন সৎ ভিক্ষুকে পাতিমোক্‌খসংবরসংবুতো অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষনিয়ন্ত্রিত জীবন বলা হয়। এ থেকে সংঘে প্রাতিমোক্ষের গুরুত্ব বেশ বোঝা যায়। প্রত্যেক পক্ষের অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এটি সংঘে নিয়মিত পাঠ করা হয়। পালি প্রাতিমোক্ষে ২২৭টি নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। জানা যায় প্রথমে ১৫২টি নিয়ম ছিল। চীনা ও তিব্বতী প্রভৃতি অনুবাদে প্রাতিমোক্ষের নিয়মের মোট সংখ্যার কিছু তারতম্য আছে[১]। প্রাতিমোক্ষের নিয়মগুলি আট ভাগে বিভক্ত—পারাজিক, সংঘাদি-শেষ, অনিয়ত, নৈঃসর্গীয়প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, প্রতিদেশনীয়, শৈক্ষ্য এবং অধিকরণশমথ। প্রাতিমোক্ষের এই নিয়মগুলি গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিনয়পিটকে প্রাতিমোক্ষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা জানা যায় না—এটি সুত্তবিভঙ্গে সন্নিবিষ্ট। প্রাতিমোক্ষের এই শিক্ষাপদ বা অনুশাসনগুলির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য সুত্তবিভঙ্গের রচনা। বিভঙ্গ অর্থ ভেঙ্গে ফেলা অর্থাৎ ভেঙ্গে চুরে ব্যাখ্যা করা। প্রাতিমোক্ষের এই অনুশাসনগুলি ভেঙ্গে চুরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে এটি বিভঙ্গ বলে অভিহিত। তাই সুত্তবিভঙ্গ হচ্ছে প্রাতিমোক্ষের ব্যাখ্যা। প্রাতিমোক্ষের প্রত্যেকটি শব্দের এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার নিয়মটি কোথায় এবং কিরূপে উৎপন্ন ও কিরূপস্থানে এর প্রয়োগ তার বিবরণও এতে পাওয়া যায়। এরূপে বিভঙ্গে প্রাতিমোক্ষের সমস্ত নিয়মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাপদ বা অনুশাসনগুলির ব্যাখ্যা করাই বিভঙ্গের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুত্তবিভঙ্গ দু'ভাগে বিভক্ত—মহাবিভঙ্গ এবং ভিক্‌খুনীবিভঙ্গ—একে যথাক্রমে পারাজিক ও পাচিত্তিয় বলা হয়। আবার একে উভতো বিভঙ্গ আখ্যাও দেওয়া হয়। মহাবিভঙ্গ ভিক্ষুবিভঙ্গ বলেও পরিচিত। মহাবিভঙ্গে ভিক্ষুদের আট প্রকার আপত্তির বা অপরাধের অনুরূপ আটটি পরিচ্ছেদ আছে। ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষের আদর্শে রচিত। এটি মহাবিভঙ্গ হতে ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ। ভিক্ষুবিভঙ্গের বহু নিয়ম-কানুন ভিক্ষুণীবিভঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে এবং ঐ সব নিয়মগুলি ভিক্ষুবিভঙ্গে ব্যাখ্যাত। সেজন্য এইগুলি ভিক্ষুণীবিভঙ্গে উল্লিখিত

১। সংস্কৃতে ২৬৩টি, তিব্বতীতে ২৫৮টি।

হয়েছে। এতে সাতটি পরিচ্ছেদ। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের অনিয়ত আপত্তির অনুরূপ কোন আপত্তি নেই। তাই এতে একটি কম পরিচ্ছেদ আছে। ভিক্ষুণীবিভঙ্গ ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষের টীকা।

(খ) **খন্ধক**—খন্ধকে সংঘের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার লিপিবদ্ধ আছে। এটি সুত্তবিভঙ্গের একরকম ধারা-বাহক ও পরিপুরক বলে বৌদ্ধশাস্ত্রে পরিচিত। খন্ধক আবার দু'ভাগে বিভক্ত—মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ।

মহাবগ্‌গ—এটি বিনয়পিটকের একখানি অন্যতম গ্রন্থ। এর দশটি পরিচ্ছেদ—মহাস্কন্ধ, উপোসেথস্কন্ধ, বর্ষোপনায়কস্কন্ধ, প্রবারণাস্কন্ধ, চর্মস্কন্ধ, ভৈষজ্যস্কন্ধ, কঠিনস্কন্ধ, চীবরস্কন্ধ, চম্পেয্যস্কন্ধ এবং কৌশাম্বীস্কন্ধ। প্রত্যেক স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদ বেশ বৃহৎ বলে সম্ভবত এটির মহাবগ্‌গ নাম হয়েছে। মহা-বগ্‌গে বুদ্ধের জীবনী পাওয়া যায়—কিন্তু এটি আংশিক মাত্র। এখানে বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা নেই। ভগবান বুদ্ধের বোধিমূলে বোধিজ্ঞান লাভ হতে বারাণসীতে প্রথম ধর্মপ্রচারের ইতিবৃত্ত রয়েছে। সংঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিবরণ ও বিনয়ের বিধানগুলি কিরূপে প্রবর্তিত হল তারও সন্ধান মেলে। বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের এবং বুদ্ধের নিজের পুত্র রাহুলের সদ্ধর্মে দীক্ষার বিবরণ আছে। বহু নীতিমূলক আখ্যান এবং প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন জীবনের বিষয় এখানে পাওয়া যায়। এতে সেকালের ভারতের নাগরিক ও সামাজিক বহু বিষয়ের তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। মোটকথা মহাবগ্‌গ গ্রন্থটি বিবিধ অমূল্য তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ।

চুল্লবগ্‌গ—এটি বারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত—কর্মস্কন্ধ, পারিবাসিকস্কন্ধ, সমুচ্চয়স্কন্ধ, শমথস্কন্ধ, ক্ষুদ্রকবস্তুস্কন্ধ, শয়নাসনস্কন্ধ, সংঘভেদস্কন্ধ, ব্রতস্কন্ধ, প্রাতিমোক্ষস্থাপনস্কন্ধ, ভিক্ষুণীস্কন্ধ, পঞ্চশতিকস্কন্ধ; এবং সপ্তশতিকস্কন্ধ। এর স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র বলে সম্ভবত চুল্লবগ্‌গ নাম হয়েছে। এতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহারও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। শ্রেষ্ঠী অনাথ-পিণ্ডকের সংঘে জেতবন দান কাহিনী, দেবদত্তের সংঘভেদের চেষ্টা এবং মহাপ্রজাপতির অনুরোধে ভিক্ষুণীসংঘের উৎপত্তির বিবরণীও পাওয়া যায়। এতে বুদ্ধের জীবনী ও সংঘের ইতিবৃত্ত ঘটিত আখ্যানের উল্লেখ আছে। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিরও বিবরণ আছে। অনেকের মতে এ দু'টি সঙ্গীতির

বিষয় প্রক্ষিপ্ত—এগুলি পরে চুল্লবগ্গে লিপিবদ্ধ হয়। আর বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত অংশে পরিপূর্ণ থাকার জন্যও এর নাম চুল্লবগ্গ হয়েছে বলে মনে করা হয়। মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ পাঠে বুদ্ধের জীবনী ও সংঘের জ্ঞাতব্য বহু বিষয় জানা যায়। এগুলি সংঘের এবং সমাজের পক্ষে বিশেষ অমূল্য গ্রন্থ। এ দু'টি গ্রন্থে বিনয়ের মুখবন্ধ পাওয়া যায়। মহাবগ্গের দশটি এবং চুল্লবগ্গের বারটি একত্রে বাইশটি পবিচ্ছেদে ভগবান বুদ্ধের সম্যক্ সম্বোধি লাভের পব হতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত ধাবাবাহিক ঘটনা লিপিবদ্ধ বয়েছে। মোটকথা ধর্মজীবনেব বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধদেবেব আলৌকিক কৃতিত্বের প্রচারই গ্রন্থগুলিব কৃতিত্ব।

সুত্তবিভঙ্গ যেমন প্রাতিমোক্ষ অবলম্বনে রচিত সেরূপ খন্ধকও কর্মবাক্য অবলম্বনে বচিত।

(গ) **পরিবারপাঠ**—এটি বিনয়পিটকেব সর্বশেষ গ্রন্থ এবং সুত্তবিভঙ্গ ও খন্ধকের অনেক পরে বচিত। অনেকে মনে করেন সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক এটি বচিত। পরিবার পাঠে একুশটি পবিচ্ছেদ। এখানে বিনয় সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রশ্নোত্তবচ্ছলে অতি সুন্দবভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেকের মতে এর গুরুত্ব খুবই কম। সংঘের সৃষ্টি বা বিনয়ের নিয়ম-কানুনের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি নতুন সমাচার কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থটি পাঠ করলে জানা যায় বিনয়ের দুরূহ বিষয়গুলি কিরূপ সুন্দরভাবে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিষয়টি একেবারে সহজ ও সুবোধ্য করা হয়েছে। সুত্তবিভঙ্গের ও খন্ধকেব বিষয়বস্তুগুলি জানবার এটি একমাত্র চাবি বলা যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে বিনয়ধর আচার্যদেবের একটি তালিকা আছে। ভারত ও সিংহলের বৌদ্ধ সংঘের ইতিবৃত্তে তালিকাটি অমূল্য। একে আবার সূচী বা পরিশিষ্ট বলা হয়। একে বেদ ও বেদাঙ্গেব অনুক্রমণীর পবিশিষ্টের সংগে তুলনা করা যেতে পারে।

সুত্তপিটক

বিনয়পিটকে যেমন বৌদ্ধ সংঘ এবং ভিক্ষু জীবনের বিশদ বিববণ পাওয়া যায়, তেমনই সুত্তপিটকে ধর্মের বা বৌদ্ধ প্রবচনেরও তাঁর শিষ্যদেব বিষয় নিবদ্ধ আছে। সুত্তপিটকে বোহার দেশনা অর্থাৎ লোক প্রচলিত উপদেশেরই আধিক্য দেখা যায়। এতে গদ্যে যে সকল কথোপকথন, বিবরণ ও বচন আছে তা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। সুত্তপিটকের পাঁচটি

ভাগ—দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং খুদ্দক-নিকায়। খুদ্দকনিকায়ে আবার ১৫খানি গ্রন্থের সমাবেশ আছে—খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসম্ভিদামগ্‌গ, অপদান, বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটক।

আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে নিকায় শব্দসমূহ ও নিবাস—এই দুই অর্থ প্রকাশ করে। দীঘনিকায় দীর্ঘ প্রমাণ সূত্র সমূহের নিবাস স্বরূপ। মজ্ঝিমনিকায় মধ্যম প্রমাণ সূত্র সমূহের নিবাস স্বরূপ। এরূপে খুদ্দকনিকায় ক্ষুদ্র প্রমাণ সূত্র সমূহের নিবাস স্বরূপ। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে নিকায়ের পরিবর্তে আগম শব্দের প্রচলন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—দীঘনিকায়=দীর্ঘাগম, মজ্ঝিমনিকায়=মধ্যমাগম ইত্যাদি। প্রথম চারিটি নিকায় বিভিন্ন সুত্ত সমূহের বা উপদেশাবলীর সমাবেশ মাত্র। সুত্তগুলি সাধারণত গদ্যে লিখিত। দীঘ, মজ্ঝিম, সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তর বলতে আলাদা গ্রন্থের নাম বোঝা যায়। কিন্তু খুদ্দক বলতে পৃথক কতকগুলি গ্রন্থের একটি সাধাবণ নাম বলে জানা যায়। এখানে নিকায়গুলির একটি বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :—

দীঘনিকায়—দীর্ঘ প্রমাণ বুদ্ধের অনুশাসনগুলি এই নিকায়ে লিপিবদ্ধ আছে। এতে ৩৪টি সূত্র। ব্রহ্মজালসুত্ত, সামঞ্ঞফলসুত্ত, অম্বট্ঠসুত্ত, সোণদণ্ডসুত্ত, কূটদন্তসুত্ত, মহালিসুত্ত, জালিয়সুত্ত, মহাসীহনাদসুত্ত, পোট্ঠপাদসুত্ত, সুভসুত্ত, কেবট্টসুত্ত, লোহিচ্চসুত্ত, তেবিজ্জসুত্ত, মহাপদানসুত্ত, মহানিদানসুত্ত, মহাপরিনিব্বানসুত্ত, মহাসুদস্সনসুত্ত, জনবসভসুত্ত, মহাগোবিন্দসুত্ত, মহাসময়সুত্ত, সক্কপঞ্হসুত্ত, মহাসতিপট্ঠানসুত্ত, পায়াসীসুত্ত, পাথিকসুত্ত, উদুম্বরিকাসীহনাদসুত্ত, চক্কবত্তীসীহনাদসুত্ত, অগ্‌গঞ্ঞসুত্ত, সম্পসাদনীয়সুত্ত, পাসাদিকসুত্ত, লক্খণসুত্ত, সিগালোবাদসুত্ত, আটানাটিয়সুত্ত, সঙ্গীতিসুত্ত ও দসুত্তরসুত্ত। এই সূত্রসমূহ সাধারণ সূত্রগুলির চেয়ে অনেকাংশে দীর্ঘ। সূত্রগুলিব মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই—প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেকটিকে আবার স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বর্গভেদে শীলস্কন্ধ, মহা ও পাথিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত। ১—১৩ সূত্র শীলস্কন্ধ বর্গের অন্তর্গত। শীল ও সদাচারই এদের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রথম দু'টি সূত্র—ব্রহ্মজাল ও সামঞ্ঞফল—হতে শীল ছাড়া আরও অনেক বিশেষ তথ্য জানা যায়। ব্রহ্মজাল হতে ৬২ প্রকার দার্শনিক মতবাদের

সন্ধান পাওয়া যায়। সামঞ্‌ঞফলসুত্তে বুদ্ধের সমসাময়িক ছ'জন শাস্তার ধর্মমত আছে। অন্যান্য সূত্রগুলিতে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও জাতিবাদ ইত্যাদির বিষয় আলোচিত হয়েছে। ১৪-২৩ সূত্র মহাবগ্‌গের অন্তর্গত। মহাবগ্‌গের দশটি সূত্রের মধ্যে সাতটি সূত্র মহা এই বিশেষণ পদ আরোপিত হওয়ায় সূত্রগুলির গুরুত্ব ও দীর্ঘতাব ইঙ্গিত নির্দেশ কবে বলে মনে হয। মহাবর্গেব গুরুত্ব উপলব্ধি কবিতে হলে এর কযেকটি সূত্রেব বিষযবস্তু আলোচনা করা প্রযোজন। মহাপরিনিবাণসূত্রান্তটি পাঠে জানা যায, বুদ্ধেব অন্তিম জীবনকে কেন্দ্র কবে স্থবিবগণ বিভিন্ন কালেব বিভিন্ন বিষযবস্তুব ও ঘটনাপঞ্জীব সমাবেশে সূত্রটিকে রঞ্জিত কবেছেন। বিভিন্ন প্রকাব চিত্রের বর্ণবিন্যাসে সূত্রটি ক্রমশ বেড়ে ছ' অধ্যাযে এক বিবাট সূত্রান্তে পরিণত হযেছে। আবও অনেক দিক হতে বিচাব কবলে সূত্রটিব মূল্য নির্ধারণ কবা যায়। এই সূত্রটিতে বুদ্ধেব অন্তিম জীবনেব অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাই বুদ্ধের একটি ধাবাবাহিক জীবনী রচনায এটি ঐতিহাসিকদেব যথেষ্ট সাহায্য কবতে পাবে। এ বিষযে মহাপদানসূত্রটিব মূল্যও কম নহে। চাবটি নিকাযেব মধ্যে এই সূত্রটিতে কেবলমাত্র বুদ্ধেব পিতা শুদ্ধোদন নামটি পাওযা যায়। মহাপরিনির্বাণসূত্রান্তে প্রথম ও দ্বিতীযবাব ধাতু বণ্টনের বিবরণে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলাবস্তু, অল্লকল্প, রামগ্রাম, বেঠদ্বীপ, পাবা, কুশীনগব ও পিপ্পলবন প্রভৃতি স্থানেব উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রাচীন ভাবতের বৌদ্ধধর্ম বিস্তাবেব সীমা ও ভৌগোলিক জ্ঞানেব যথেষ্ট পবিচয পাওযা যায। এই সূত্রান্ত হতে বৃজি, মল্ল, শাক্য, বুলি, কোলীয প্রভৃতি গণরাজ্যগুলির সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। ভৌগোলিক উপাদান হিসাবে মহাগোবিন্দসূত্রটির মূল্য অপরিসীম। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যেব মধ্যে এই সূত্রটিতে ভাবতেব সঠিক আকার বর্ণিত হয়েছে—উত্তবে আযত এবং দক্ষিণে শকট মুখ। জনবসভ, মহাসময়, সক্কপঞ্‌হ প্রভৃতি সুত্তে দেবতাদেব বিষয বর্ণিত আছে। বৈদিক সাহিত্যে ও পুবাণে বর্ণিত দেবাদেবীর বর্ণনার সংগে এগুলির তুলনামূলক আলোচনা প্রযোজন। কয়েকটি সূত্রান্তে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা আছে। এগুলি বিবিধ অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ২৪-৩৪টি সূত্র পাথিকবগ্‌গ ভুক্ত। বর্গটির নাম হতে গ্রন্থগুলির বিষয়-বস্তু বা কোন রীতি বা ক্রম কিছুই অনুমান কবা যায় না। অনেকেব মতে পাথিকাদিবর্গ বর্গটির নাম হওয়া উচিত ছিল, তাহলে সহজে বর্গটির অর্থ বোঝা

যেত। পাথিকাদিবর্গ অর্থ বর্গের প্রথমে বা আদিতে পাথিকসূত্র। এখানে এই অর্থে পাথিকের ব্যবহার তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই বর্গের এগারটি সূত্রের মধ্যে সিগালোবাদ ও আটানাটিয় সুত্তই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দু'টি সুত্ত সমগ্র ত্রিপিটকের মধ্যে অমূল্য সম্পদ। সিগালোবাদসুত্তকে গৃহীবিনয় বলা হয়। বুদ্ধদেব একদিন সিগাল নামক জনৈক গৃহীকে ছ'টি দিক—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব ও অধঃ—করজোড়ে নমস্কার করতে দেখেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সিগাল উত্তর দেন—তিনি পিতৃকুলের উদ্দেশে এরূপ তর্পণ করছেন। তখন বুদ্ধ সিগালকে ছ'টি দিকের অনুরূপ ছ'জন মানুষের প্রতি জীবনের প্রত্যহ শ্রদ্ধা, ভক্তি বা সৎ ব্যবহারের উপদেশ দেন। সূত্রটিতে গার্হস্থ্য জীবনের সদুপদেশে পরিপূর্ণ—এটি সৎগৃহীর জীবনের প্রকৃত আদর্শ। অনেকেই মনে করেন অশোকের ধর্মের এই-ই ভিত্তিভূমি। আটানাটিয়সুত্তে মন্ত্র, ধারণী প্রভৃতির বিষয় বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মন্ত্র উচ্চারণে মানুষ দুষ্ট গ্রহের প্রভাব হতে মুক্তি পায় লক্‌খণসুত্তন্তে ৩২টি মহাপুরুষের লক্ষণের উল্লেখ আছে। এছাড়া অনেকগুলি সূত্রতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ ও কঠোর তপস্যার বিষয় পাওয়া যায়।

মজ্‌ঝিমনিকায়—১৫২টি মধ্যমপ্রমাণ সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি পনেরটি বর্গে বিভক্ত—মূলপরিয়ায়বগ্‌গ, সীহনাদবগ্‌গ, উপমাবগ্‌গ, মহাযমকবগ্‌গ, চুল্লযমকবগ্‌গ, গহপতিবগ্‌গ, ভিক্‌খুবগ্‌গ, পরিব্বাজকবগ্‌গ, রাজবগ্‌গ, ব্রাহ্মণবগ্‌গ, দেবদহবগ্‌গ, অনুপদবগ্‌গ, সুঞ্ঞতাবগ্‌গ, বিভঙ্গবগ্‌গ ও সলায়তনবগ্‌গ। বর্গগুলিকে মোটামুটিভাবে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। কয়েকটির নামকরণ আবার বর্গের প্রথম সূত্র হতে হয়েছে। দীঘনিকায়ের ন্যায় মজ্‌ঝিমনিকায়েও ভিক্ষুদের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষার বিশেষ আলোচনা আছে। অচ্ছরিয়ব্ভুতসুত্তে বুদ্ধের জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। চুল্লসচ্চকসুত্ত, উপালিসুত্ত, অভয়রাজ-কুমারসুত্ত, চুল্লসকুলদায়িসুত্ত, দেবদহসুত্ত এবং সমাগমসুত্তে—এই ছ'টি সূত্রে বুদ্ধের জৈন আচার্যদের সংগে বিতর্কের বিষয় জানা যায়। মহাসারোপমাসুত্তে এবং অভয়কুমারসুত্তে দেবদত্তের সংঘভেদের বর্ণনা আছে। মধুরসুত্ত, অস্‌-সলায়নসুত্ত এবং এসুকারীসুত্ত—এ তিনটিতে জাতিবিষয়ক বিশেষ আলোচনা রয়েছে। চুল্লমালুক্যসুত্ত পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা

প্রসংগে বলেন—এই তথ্যগুলির আলোচনা পরিহার করা উচিত। কারণ এরা নির্বাণলাভের অন্তরায় মাত্র। কয়েকটি সূত্রে আবার চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি বিবিধ গুরুতর অপরাধও তার শাস্তির উল্লেখ আছে। এ থেকে সেকালের দণ্ডনীতির আভাস পাওয়া যায়। মজ্ঝিমনিকায়ের অধিকাংশ সূত্রই পরমতবাদ খণ্ডন করে বর্ণিত।[১] মজ্ঝিমনিকায়ের অর্থকথা পপঞ্চসূদনী হতে জানা যায় মজ্ঝিমনিকায়কে মজ্ঝিমসংগীতি বলা হয়[২]।

সংযুক্তনিকায়—এ নিকায়ে ৫৬টি গুচ্ছ (সংযুক্ত) আছে। এগুলি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত—সগাথবগ্গ, নিদানবগ্গ, খন্ধকবগ্গ, সলায়তনবগ্গ এবং মহাবগ্গ। বগ্গগুলির নামকরণ গুচ্ছের (সংযুক্তের) প্রথম নাম অথবা সম্ভাষকের নাম হতে হয়েছে। সগাথবর্গে এগারটি সংযুক্ত, নিদানে দশটি সংযুক্ত, খন্ধে তেরটি, সলায়তনে দশটি এবং মহাবগ্গে বারটি সংযুক্ত আছে। মারসংযুক্ত এবং ভিক্ষুণীসংযুক্ত গীতিকাব্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এগুলির কাব্য সাহিত্যে যথেষ্ট মূল্য আছে। জানা যায় সংযুক্ত নিকায়ের সূত্রগুলিকে তিনটি পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধকরা হয়েছে—

(ক) বৌদ্ধ মতবাদ অনুসারে,

(খ) দেবতা, মনুষ্য বা দৈত্য অনুসারে এবং

(গ) নায়ক বা বক্তা অনুসারে।

প্রথমবর্গে নীতি এবং ভিক্ষুজীবনের আদর্শ এবং অন্য বর্গগুলিতে আন্বীক্ষিকীর (metaphysics) প্রাধান্য দেখা যায়। মোটকথা সংযুক্ত নিকায় আধ্যাত্মিক নৈতিক এবং দার্শনিক বিষয়ে পরিপূর্ণ।

অঙ্গুত্তরনিকায়—এ নিকায়ে ১,২,৩ ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে উত্তরোত্তর বর্ধিত সূত্রের সমাবেশ। এটি এগারটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগকে নিপাত বলা হয়। নিপাতও আবার এগারটি। যথা—একনিপাত, দুকনিপাত, তিকনিপাত, চতুক্কনিপাত, পঞ্চকনিপাত, ছক্কনিপাত, সত্তকনিপাত, অট্‌ঠক-নিপাত, দসকনিপাত ও একাদসকনিপাত। একনিপাতে একরকম কথা—উপাসকদের কথা, বিবিধ ধ্যানের কথা। দুকনিপাতে দু'রকম কথা—দু'রকম পাপের কথা, দু'রকম বুদ্ধের কথা, দু'কারণে বনবাসের কথা, তিকনিপাতে—

১। পরবাদমথনসুস।

২। মজ্ঝিমসংগীতি নাম পণ্ণাসতো মূলপণ্ণাসা মজ্ঝিমপণ্ণাসা উপরিপণ্ণাসা'তি পণ্ণাসত্তযসঙ্গহা।

কায়-বাক্-চিত্ত সম্বন্ধীয় কথা, তিন রকম ভিক্ষুর কথা, তিনটি দেবদূতের (জরা, ব্যাধি, মৃত্যু) কথা ইত্যাদি। আর সব নিপাতগুলি এই রীতিতে রচিত। নিপাতগুলি আবার বিভিন্ন বর্গে গঠিত। অঙ্গুত্তরনিকায়ে ২৩০টি সূত্র আছে। অনেকগুলি সূত্রে স্ত্রীলোকদের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কয়েকটি সূত্র হতে অমানুষিক দণ্ডনীতি ও সেকালের ফৌজদারী নিয়ম-কানুন জানা যায়। বিবিধ বিষয়বস্তুর আলোচনাই এই নিকায়টির বৈশিষ্ট্য। যা হোক এতে ধর্মমতের উপরই বেশী জোর দেখা যায়। এর ভাষা গম্ভীর ও প্রাঞ্জল।

খুদ্দকনিকায়—এটি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সমষ্টি মাত্র। একে প্রকীর্ণক সংগ্রহ বলা যায়। অনেকে মনে করেন খুদ্দকনিকায় সুত্তপিটকের অন্তর্গত নহে। নিকায়ের বহু পরে রচিত। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নেই—পরস্পর বিভিন্ন। গ্রন্থগুলিব অধিকাংশই গাথায় রচিত। কাব্যসাহিত্যে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এখন গ্রন্থগুলির সংক্ষেপে বিবরণ দেওয়া হচ্ছে এবং এ থেকে গ্রন্থ সমূহের মোটামুটি ধারণা করা যাবে—

খুদ্দকপাঠ—এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন'টি সূত্র আছে। যথা—সরণত্তয়, দসসিক্খাপদ, দ্বাত্তিংসাকার, কুমারপঞ্হ, মঙ্গল, রতন, তিরোকুড্ড, নিধিকণ্ড ও মেত্তাসুত্ত। শিক্ষার্থীকে সংঘে প্রবেশের সময় এই সূত্রগুলিকে প্রথমে মুখস্থ করতে বলা হয়। বৌদ্ধদের ধর্মীয় কাজে এগুলিকে মন্ত্ররূপে প্রয়োগ করা হয়। আজও এর সাতটি সূত্র বৌদ্ধজগতে পরিত্ত অর্থাৎ যাদু মন্ত্ররূপে পরিচিত। মোটকথা খুদ্দকপাঠ বৌদ্ধদের একটি উৎকৃষ্ট হাতবই (hand book)।

ধম্মপদ—এটি একটি কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে ৪২৩টি গাথা আছে। গাথাগুলি ২৬টি বর্গে বিভক্ত—যমক, অপ্পমাদ, চিত্ত, পুপ্ফ, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্স, পাপ, দণ্ড, জরা, অত্ত, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোধ, মল, ধম্মট্ঠ মগ্গ, পকিণ্ণক, নিরয়, নাগ, তণ্হা, ভিক্খু ও ব্রাহ্মণ। ধম্মপদের গাথাগুলি ভগবান তথাগতের মুখনিঃসৃত বাণী। এগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বলা হয়। গ্রন্থটিব নাম হতে বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। এটি ধর্মনীতি সম্বন্ধীয় পদাবলী। ধম্মপদে যে সকল হিতোপদেশ আছে মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থেও তার অনুরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। ধম্মপদ হিন্দুদের গীতার ন্যায় একখানি অমূল্য গ্রন্থ। অনেক বৌদ্ধ গৃহী এর গাথাগুলি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ

করেন। সিংহল দেশে সকল ভিক্ষুই গ্রন্থখানি মুখস্থ বলতে পারেন। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষাতে এটির অনুবাদ করা হয়েছে। ত্রিপিটকের মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে গৃহস্থ, শ্রমণ, ভিক্ষু—সকলের জন্যই উপদেশ আছে। ধম্মপদের মুখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণেকে নৈতিক উপদেশ দান। মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করলে নৈতিক উন্নতি লাভ করতে পারে তা সরল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি চারিটি ভাষায় পাওয়া গেছে—সংস্কৃত, মিশ্রসংস্কৃত, প্রাকৃত এবং পালি। এছাড়া এর চৈনিক অনুবাদও মেলে।

উদান—ধর্মীয় ভাবাবেশে মহামানবেরা যে গম্ভীর উক্তি করেন তাই উদান নামে খ্যাত। সাধারণত সৌমনস্যযুক্ত সূত্রই উদান। উদানে আটটি বর্গ আছে। প্রত্যেক বর্গে দশটি সূত্র। সুতরাং এর সংখ্যা আশিটি মাত্র। অধিকাংশ সূত্রই গাথায় রচিত। রচনাপদ্ধতি অতি প্রাঞ্জল। উদানের উক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ার্থ। অধিকাংশ উদানে বৌদ্ধ জীবনের আদর্শ ও পরম পদ নির্বাণের গুণও বর্ণিত আছে।

ইতিবুত্তক—গদ্যে ও পদ্যে ভগবানের উক্তিরূপে রচিত সূত্র। এতে ১১২টি ক্ষুদ্র সূত্র আছে। সূত্রগুলি আবার চারিটি নিপাতে বা বর্গে বিভক্ত। এই শ্রেণীর সূত্রের আরম্ভে—বুত্তং হেতং ভগবতা, বুত্তং অরহতাতি মে সুতং—ভগবান অর্হৎ একথা বলেছেন আমি তা শুনেছি। এবং শেষে—অয়মপি অত্থো বুত্তো ভগবতা ইতি মে সুতন্তি—ভগবান এ অর্থ বলেছেন আমি তা শুনেছি—বাক্যগুলি যুক্ত আছে। এতে বুদ্ধের নৈতিক উপদেশের আধিক্য দেখা যায়। এর ভাষা অতি সরল ও সাবলীল।

সুত্তনিপাত—এটি গাথায় রচিত সত্তরটি সূত্রের সংগ্রহ। ইহা আবার পাঁচটি বর্গে বিভক্ত—উরগ, চুল্ল, মহা, অট্ঠক ও পারায়ণ। উরগবগ্‌গে বারটি, চুল্লবগ্‌গে চৌদ্দ, মহাবগ্‌গে বার, অট্ঠকে ষোলটি এবং পারায়ণবগ্‌গেও ষোলটি সূত্র আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ধম্মপদের পরে এর স্থান। সুত্তনিপাতে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় বিশেষ উল্লেখ আছে। এই ভাবধারার সঙ্গে ভগবদ্‌গীতার ভাবধারার বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। এখানে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ আদর্শের তুলনা করা হয়েছে এবং দেখান হয়েছে বৌদ্ধ আদর্শ উচ্চ ও মহৎ। বৌদ্ধধর্মের নৈতিক শিক্ষার বিষয় জানতে হলে সুত্তনিপাতের পঠন

আবশ্যক। গ্রন্থটি ভারতের বৌদ্ধযুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার উপর আলোকপাত করে।

বিমানবত্থু ও **পেতবত্থু**—এ দু'খানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ। বিমানবত্থুতে ৮৫টি গাথা আছে। গাথাগুলি আবার সাতটি বর্গে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে দেবতাদের দিব্যাবাসের বর্ণনা আছে। জানা যায় কর্মের ফল স্বরূপ দেবতারা এরূপ আবাস লাভ করেন। পেতবত্থুতে একান্নটি গাথা আছে। গাথাগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থটি প্রেতের কথায় পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পর অসৎ কর্মের দরুণ প্রেতেরা অশেষ দুঃখ ভোগ করে। কাব্য হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য খুবই কম। বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন সৎকর্মের সৎফল এবং অসতের অসৎফল। কর্মবাদ প্রচারই গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

থের ও **থেরীগাথা**—দু'টি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রন্থ। থের (সংস্কৃত স্থবির) অর্থ বৃদ্ধ। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষুদের থের বলা হয় ও জ্ঞানবৃদ্ধা ভিক্ষুণীদের থেরী আখ্যা দেওয়া হয়। সাধন মার্গে উন্নত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা এই পদবীর অধিকারী। বয়সের সহিত কোন সম্বন্ধ নেই। থেরগাথায় ২৬৪টি প্রধান স্থবিরের কথিত ১৩৬০টি গাথা আছে। থেরী গাথায় কিন্তু ৭৩টি পূতশীলা স্থবিরা কথিত ৫২২টি গাথার সমাবেশ। গাথাগুলি স্থবিরদের বা স্থবিরাদের মধ্যে কেউ আবৃত্তি করেছেন অর্হৎফল প্রাপ্তি বর্ণনার প্রসঙ্গে, কেউ প্রীতি সুখ, কেউ সমাধি বিহার, কেউ বা সদ্ধর্মের ভবিষ্যৎ অবস্থা প্রসঙ্গে। গাথগুলি পড়লে প্রথমে মনে হয় স্থবিরেরা বা স্থবিরাগণ নিজে যেন এগুলির রচয়িতা বা রচয়িত্রী। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় এ অনুমান সঠিক নয়। একই গাথায় দেখা যায় একাধিক স্থবিরের বা স্থবিরার মুখনিঃসৃত গীতি। কতকগুলি গাথা যে স্থবিরদের বা স্থবিরাদের স্বরচিত তাতে সন্দেহ নেই। অনেকগুলি গাথায় রচয়িতাদের বা রচয়িত্রীদের কবিত্বের ও ধর্মশীলতার আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থ দু'টির নাম হতে বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়—স্থবিরদের বা স্থবিরাদের মুখনিঃসৃত মঙ্গলগীতি। স্থবিরদের বা স্থবিরাদের পারমার্থিক ভাবধারা ও বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সারমর্ম প্রচারের প্রয়াসই প্রধান বিষয়বস্তু। সংসার জীবন ত্যাগ করে কি উপায়ে জীবনযাপন করে স্থবিররা বা স্থবিরেরা নৈতিক উন্নতি লাভ করেন তার একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এক একটি গাথা এক একটি স্থবির বা স্থবিরার অন্তরের অনুভূতি স্বরূপ। এগুলি পাঠককে মুগ্ধ ও

পুলকিত করে। থেরীগাথা হতে সেকালেব সামাজিক অবস্থা ও স্ত্রী স্বাধীনতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। কাব্য সাহিত্যেও থের ও থেবী গাথাব মূল্য কম নহে। গাথাগুলির মধ্যে অনেকগুলি যে সরস কাব্য তাতে সন্দেহ নেই। ছন্দের প্রাণ আছে উপমাবও আছে বৈচিত্র্য। থেরগাথায প্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সুন্দব উপমা আছে, তা হতে বেশ বুঝা যায প্রকৃতিব প্রতি স্থবিরদেব ছিল একটু বিশেষ অনুবাগ। গীতিকাব্য ও নাটকীয আলাপগুলি উচ্চাঙ্গেব। কবি ও নাট্যাচার্যেবা গাথাগুলি হতে অনেক উপদান সংগ্রহ কবতে পাবেন—এতে কোন সন্দেহ নেই।

জাতক—গৌতমবুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনী। জাতক শব্দেব আক্ষবিক অর্থ যে জন্মগ্রহণ কবেছে। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে তা পাবিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত। জাতকগ্রন্থে ৫৪৭টি জাতক আছে। প্রত্যেক জাতকেব পাঁচটি অঙ্গ—প্রত্যুৎপন্ন বা বর্তমান কাহিনী, অতীতবস্তু বা অতীত কাহিনী, গাথা বা শ্লোক, ব্যাকবণ বা বিশদ ব্যাখ্যা বা টীকা এবং সমোধান বা সংযোগ অর্থাৎ বর্তমান কাহিনীব নাযকদেব জীবনেব সহিত তাদেব পুর্ব জন্মেব সনাক্তকবণ। অধিকাংশ জাতকই গদ্যও গাথায লিখিত। সমগ্র জাতক গ্রন্থে বাইশটি নিপাত আছে। বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় কবাই জাতকেব মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্য শিল্পেব দিক দিযা জাতক অমূল্য সম্পদ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং সকল স্তবেব লোকেব জীবন প্রণালীরও আভাস মেলে। মোটকথা জাতক নানাবকম তথ্যে ভবপুব। আখ্যাযিকা, পবীব গল্প, উপাখ্যান, নীতি কথা, পৌবাণিক আখ্যান, হাস্যবসাত্মক কাহিনী প্রভৃতি জাতকের প্রধান বিষযবস্তু। কতকগুলি জাতকে মৈত্রী, করুণা ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি সৎগুণেব উল্লেখ পাওযা যায। বস্তুত সাহিত্য ভাণ্ডাবে জাতকেব অবদান অমূল্য।

নিদ্দেস—ইহা শারিপুত্র বচিত একখানি টীকা। এতে সুত্তনিপাতের অট্ঠক ও পারায়ণবর্গের বত্রিশটি সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। এর আবার দুটি ভাগ—মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেস। পালি টীকা গ্রন্থগুলিব মধ্যে নিদ্দেস অতি প্রাচীন। সম্ভবত এজন্য একে নিকায়ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে আবার প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা আছে। গ্রন্থটিতে কোন একটি

শব্দের অর্থ দিতে বহু প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। মনে হয় এটি পরবর্তীকালে শব্দকোষের ভিত্তি স্থাপন করে।

পটিসম্ভিদামগ্গ—এতে সকল বিষয়ই অভিধর্মরীতিতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একে কিন্তু সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি সূত্রের প্রারম্ভে এবং মে সুতং—আমি এরূপ শুনেছি—বাক্যটি যেমন যুক্ত সেরূপ গ্রন্থটির অধিকাংশ সূত্রই এরূপে আরম্ভ হয়েছে। সূত্রের ন্যায় গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থলে 'ভিকৃখবে' এ সম্বোধন পদটি পাওয়া যায়। এর তিনটি বর্গ—মহাবগ্গ, যুগনন্ধবগ্গ ও পঞ্ঞাবগ্গ। প্রত্যেকটি বর্গের আবার দশটি করে পরিচ্ছেদ। বর্গগুলিতে বৌদ্ধধর্মের মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম বর্গে ৭৩ প্রকার জ্ঞান, স্মৃতি, কর্ম ইত্যাদি আছে। দ্বিতীয় বর্গে আছে চতুরার্য সত্য, মৈত্রী ইত্যাদি। তৃতীয় বর্গে যোগীদের অলৌকিক শক্তি ইত্যাদির আলোচনা আছে।

অপদান—অপদান (সংস্কৃত অবদান) শব্দের অর্থ মহৎ কর্ম, কীর্তি। অপদান গ্রন্থে বুদ্ধ ও তার শিষ্যদের কার্যকলাপ বর্ণিত আছে। জাতক গ্রন্থে শুধু গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু অপদান গ্রন্থে বুদ্ধের কাহিনী ছাড়াও তাঁর প্রধান শিষ্যদেরও বৃত্তান্ত জানা যায়। এটি গাথায় রচিত। অপদানের অধিকাংশ ভাগই স্থবিরদের কাহিনী। কাহিনীগুলিকে ৫৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক বর্গে দশটি করে কাহিনী আছে। গ্রন্থটির অবশিষ্ট অংশ স্থবিরাদের কাহিনী। এ কাহিনীগুলি আবার চারটি বর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্গে দশটি করে কাহিনী। সুতরাং গ্রন্থটিতে ৫৫০জন স্থবির ও ৪০জন স্থবিরার জীবন চরিত আছে। এসব স্থবির ও স্থবিরাদের কাহিনী ধর্মের ইতিহাসের জন্য উপযোগী। অপদান গ্রন্থ খুদ্দকনিকায়ের অন্যান্য গ্রন্থগুলির অনেক পরে রচিত হয়। সংস্কৃত অবদানের সহিত এর বেশ সাদৃশ্য আছে।

বুদ্ধবংস—এতে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর পরবর্তী ২৪ জন বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত আছে। এটি ২৬টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রথমে দীপঙ্করের সমীপে গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধ হবার সঙ্কল্পের কথা। তারপর অন্যান্য বুদ্ধের প্রত্যেকের ধর্ম প্রবর্তনের বিষয় বলা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে গৌতম বুদ্ধ ও অন্যান্য বুদ্ধদের দেহাবশেষ বণ্টনের কথা পাওয়া যায়।

চরিয়াপিটক—এটি কতকগুলি পদ্যে রচিত জাতক কাহিনীর সমষ্টি এটি অশোকোত্তর যুগে রচিত। এতে ৩৫টি জাতকের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে এখানে বোধিসত্ত্বদের পারমিতার পূর্ণতা প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে দশটি পারমিতার উল্লেখ আছে। কিন্তু চরিয়াপিটকে সাতটি পারমিতা পালনের কথা পাওয়া যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থগুলি সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত নহে। সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুদের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থের খুদ্দনিকায়ের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মতানৈক্য আছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ দিব্যাবদানে দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর এই চারিটি আগমের উল্লেখ আছে। পালি সুমঙ্গল-বিলাসিনী গ্রন্থ হতে জানা যায় নিকায় সংকলিত হবার পরে এর আবৃত্তি ও পঠন পাঠনের ভার এক একজন স্থবির বা তাঁর শিষ্যদের উপর দেওয়া হয়। যেমন দীঘনিকায়ের ভার পড়ে আনন্দের উপর, মজ্ঝিমনিকায়ের শারিপুত্রের শিষ্যদের উপর, সংযুক্তনিকায়ের মহাকাশ্যপের উপর এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভার পড়ল অনুরুদ্ধের উপর। কিন্তু খুদ্দকনিকায়ের বিষয় কিছুই জানা যায় না। কাজেই নিকায়ের পাঁচটি বিভাগ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

অভিধম্মপিটক

এটি ত্রিপিটকের তৃতীয় বিভাগ। পালি ঐতিহ্য মতে বুদ্ধ প্রথম ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাদের অভিধর্ম প্রচার করেন। শারিপুত্র আবার ভদ্রজিকে প্রকাশ করেন। এরূপে গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেরত ও অপর কয়েকজন ভিক্ষু জানিতে পারেন। পরিশেষে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় সংগীতিতে ইহা চূড়ান্ত আকার পেল। কিন্তু কাশ্মীরের বৈভাষিক সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা বলেন, বুদ্ধ তাঁর উপদেশ ভিক্ষুদের নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে দেন। অর্হৎ ও শ্রাবকেরা এ উপদেশাবলী সংগ্রহ করে অভিধর্ম রচনা করেন। বৌদ্ধদের মধ্যে একটি প্রবাদ চলতি আছে—লোকের মুখ দেখে সূত্র হয় এবং সূত্রের মুখ দেখে অভিধর্ম হয়। অর্থাৎ সূত্র অবলম্বন করে অভিধর্ম রচিত হয়। সূত্রই অভিধর্মের ভিত্তিমূল। খ্যাতনামা টীকাকার বুদ্ধঘোষের ধম্মসংগণির টীকা অত্থসালিনী ও অসংগের সূত্রালঙ্কারে অভিধর্মের বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া

যায়। অনেকেই মনে করেন অভিধর্মে বৌদ্ধ দর্শনের কথা আছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। এতে কোন ধারাবাহিক দর্শনের আলোচনা নেই। সূত্রপিটকের ধর্মগুলির আছে বিশেষ ব্যাখ্যা। ধর্মগুলি এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত ও প্রমাণিত হয়েছে।

অভিধম্মপিটক সাত ভাগে বিভক্ত :—ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক এবং পট্ঠান। এদের সাধারণত পালিশাস্ত্রে সপ্ত প্রকরণ বলা হয়।

ধম্মসংগণি—এর নাম হতে বিষয়েব পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মের অর্থাৎ লৌকিক ও লোকোত্তর পদার্থের গণনা। এতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের যাবতীয় বিষয়গুলিকে শ্রেণী ভাগ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এগুলি চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। এতে এদেরই আছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ ও বিভাগ গ্রন্থটির তিনটি প্রধান ভাগ। প্রথম ভাগে চিত্ত ও চৈতসিকের বিশ্লেষণ আছে। এই চিত্ত ও চৈতসিকের সংখ্যা ৫৩টি। চিত্ত একটি এবং চৈতসিক ৫২টি। এর স্বরূপ, কৃত্য ও পরস্পরের সম্পর্ক বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আছে রূপের বিশ্লেষণ। বিকার বা পরিবর্ত্তনশীল পদার্থই অভিধর্মে রূপ বলে পরিচিত। এই রূপেরই এ ভাগে আলোচনা আছে। তৃতীয় ভাগটির নাম নিক্ষেপ (নিক্খেপ)। এখানে পূর্ব বর্ণিত বষয়গুলির সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

বিভঙ্গ—বিভঙ্গ শব্দের অর্থ বিশদ ব্যাখ্যা। ধম্মসংগণিতে পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভঙ্গতে সেগুলিকে সংশ্লেষণ করা হয়েছে। ধম্মসংগণি পদার্থের বিশ্লেষণের উপরই জোর দেয়। কিন্তু বিভঙ্গ দেয় জোর সংশ্লেষণের উপর। বিভঙ্গের ১৮টি অধ্যায়—খন্ধবিভঙ্গ, আয়তনবিভঙ্গ, ধাতুবিভঙ্গ, সচ্চবিভঙ্গ, ইন্দ্রিয়বিভঙ্গ, পচ্চয়াকারবিভঙ্গ, সতিপট্ঠানবিভঙ্গ, সম্মপ্পধানবিভঙ্গ, ইদ্ধিপাদবিভঙ্গ, বোজ্ঝঙ্গবিভঙ্গ, মগ্গবিভঙ্গ, ঝানবিভঙ্গ, অপ্পমঞ্ঞাবিভঙ্গ, সিক্খাপদবিভঙ্গ, পটিসম্ভিদাবিভঙ্গ, ঞানবিভঙ্গ, খুদ্দকবত্থুবিভঙ্গ ও ধম্মহদয়বিভঙ্গা। বিভঙ্গের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ খন্ধবিভঙ্গ, আয়তনবিভঙ্গ ও ধাতুবিভঙ্গ ধর্মসংগণির পরিপূরক।

কথাবত্থু—ত্রিপিটক অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কথাবত্থুর কেবল লেখকের নাম জানা যায়। রাজা অশোকের সময় তৃতীয় সংগীতিতে মোগ্গলিপুত্ত

তিস্‌স (মৌদ্‌গল্যপুত্র তিষ্য) নিজে এটি সংকলন করেন। গ্রন্থটিতে ২৩টি অধ্যায় আছে। এতে সাকুল্যে ২২৬টি মতবাদ দেখা যায়। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই মতবাদগুলি খণ্ডন করা হয়েছে। বুদ্ধের পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ মতবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থটি বিশেষ আলোকপাত করে।

পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি—অভিধর্মপিটকের একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ। এর ভাষা ও বিষয়বস্তু অভিধর্মের অন্যান্য গ্রন্থ হতে বেশ ভিন্ন। এতে চিত্ত, চৈতসিক প্রভৃতির কোন আলোচনা নেই। বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ আলোচনা আছে। সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্যপুদ্‌গল প্রভৃতির বিষয় এখানে লিপিবদ্ধ আছে।

ধাতুকথা—ধম্মসংগণির খন্ধবিভঙ্গ, ধাতুবিভঙ্গ ও আয়তনবিভঙ্গ এই তিনটি অধ্যায়ই ধাতুকথার ভিত্তিমূল। এতে ১৪টি পরিচ্ছেদ আছে। এই ১৪টি পরিচ্ছেদে খন্ধ, ধাতু ও আয়তনের নানাভাবে নানা দিক দিয়ে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলোচনা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এই গ্রন্থটির নাম খন্ধ-আয়তন-ধাতু-কথা—এ নাম হওয়া উচিত ছিল। কারণ এই তিনটিরই বিশদ বিবরণ মেলে।

যমক—যমক শব্দের অর্থ যুগল বা যুগ্ম। এতে পরস্পর বিরোধী কথার সমাবেশ আছে। এর দশটি অধ্যায়—মূলযমক, খন্ধযমক, আয়তনযমক, ধাতুযমক, সচ্চযমক, সঙ্খারযমক, অনুসয়যমক, চিত্তযমক, ধম্মযমক ও ইন্দ্রিয়যমক। অধ্যায়গুলি প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র।

পট্‌ঠান—পট্‌ঠান শব্দের অর্থ প্রধান কারণ। অভিধর্মপিটকের এটি বিরাট গ্রন্থ। একে মহাপ্রকরণ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে কার্যকারণ নির্ণয়ের দু'টি রীতি। একটি প্রতীত্যসমুৎপাদ রীতি ও অপরটি পট্‌ঠান রীতি। পট্‌ঠান প্রতীত্য-সমুৎপাদেরই বিশদ ব্যাখ্যা। প্রতীত্যসমুৎপাদের ১২টি নিদান বা অবয়ব পট্‌ঠানে ২৪টি প্রত্যয়াকারে[১] অতি সরল ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সমগ্র পট্‌ঠানে চারটি প্রধান বিভাগ—অনুলোমপট্‌ঠান, পচ্চনিয়পট্‌ঠান,

---

১। হেতুপচ্চয়, আরম্মণপচ্চয়, অধিপতিপচ্চয়, অনন্তরপচ্চয়, সমনন্তরপচ্চয়, সহজাতপচ্চয়, অঞ্ঞমঞ্ঞপচ্চয়, নিস্‌সয়পচ্চয়, উপনিস্‌সয়পচ্চয়, পুরেজাতপচ্চয়, পচ্ছাজাতপচ্চয়, আসেবনপচ্চয়, কম্মপচ্চয়, বিপাকপচ্চয়, আহারপচ্চয়, ইন্দ্রিয়পচ্চয়, ঝানপচ্চয়, মগ্‌গপচ্চয়, সম্পযুত্তপচ্চয়, বিপ্পযুত্তপচ্চয়, অত্থিপচ্চয়, নত্থিপচ্চয়, বিগতপচ্চয় ও অবিগতপচ্চয়।

অনুলোমপচ্চনিয় ও পচ্চনিয়অনুলোমপট্ঠান। এই চারটি বিভাগে ২৪টি প্রত্যয়ের প্রয়োগ ৬ প্রকারে দেখান হয়েছে।

ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধর্মের পঠন ও পাঠন এখনও বৌদ্ধদেশে বেশ প্রচলন আছে। বিশেষত ব্রহ্মদেশে প্রত্যেক বৌদ্ধবিহারে ও অনেক উপাসক ও উপাসিকার গৃহে এর নিয়মিত আলোচনা হয়। শতাব্দীক্রমে বহু গ্রন্থও এটির উপর লেখা হয়েছে। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ শিক্ষার্থীকে প্রথমে অভিধর্মের সারসংগ্রহ অভিধম্মত্থসংগহ পড়তে দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা সহজে অভিধর্মের ৭টি গ্রন্থের সারমর্ম জানতে পারেন। কাজেই অভিধর্মের কোন গ্রন্থ বোঝা তাঁদের পক্ষে কষ্টকর নহে। অতি সহজে ও অল্প সময়ে তাঁরা তা বুঝতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি স্থবিরবাদের কয়েকটি সম্প্রদায়ের পালি ত্রিপিটকের মত সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক ছিল। এদের মধ্যে সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ত্রিপিটকের খণ্ডিত অংশ মধ্যএশিয়া, গিলগিট (কাশ্মীর) হতে পাওয়া গেছে। জানা যায় সর্বাস্তিবাদ ত্রিপিটকেরও তিনটি প্রধান বিভাগ—আগম (নিকায়), বিনয় ও অভিধর্ম। এখন সংস্কৃত ত্রিপিটকের স্বরূপ দেখা যাক :—

আগম

এর পাঁচটি ভাগ—দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, সংযুক্তাগম, একোত্তরাগম ও ক্ষুদ্রকাগম।

দীর্ঘাগম—সূত্র সংখ্যা ৩০টি মাত্র। পালির মত ৩৪টি নহে। এদের মধ্যে সংগীতিসূত্র ও আটানাটিয়সূত্রের খণ্ডিতাংশ মধ্যএশিয়া থেকে পাওয়া গেছে।

মধ্যমাগম—মধ্যমাগমে ২২২টি সূত্র পাওয়া যায়। পালির ন্যায় ১৫২টি নহে। এদের মধ্যে উপালিসূত্র ও শুকসূত্র এ দু'টি সূত্র পাওয়া গেছে।

সংযুক্তাগম—এতে ৫০টি অধ্যায় আছে। পালি সংযুত্তনিকায় অপেক্ষা এতে অনেক বেশী সূত্র আছে। মধ্যএশিয়া থেকে এরও তিনটি সূত্র—প্রকরণসূত্র, চন্দ্রোপমসূত্র ও শক্তিসূত্র পাওয়া গেছে।

একোত্তরাগম—এতে ৫২টি অধ্যায় আছে। পালিতে কিন্তু ১১টি নিপাতে ১৬৯টি অধ্যায় আছে। একোত্তরাগমেরও পঙ্কধাসূত্র, পুর্ণিকসূত্র ইত্যাদি কয়েকটি সূত্র মধ্যএশিয়া থেকে পাওয়া গেছে। এ সব সূত্রগুলি মনীষী আর

ফিচেল (R. Fischel) এস. বি. এ. পত্রিকাতে (S.B.A. 1904) কয়েক বছর হল প্রকাশ করেছেন।

ক্ষুদ্রকাগম—এটি আগমের পঞ্চম বিভাগ ছিল কি না সে বিষয়ে এখনও মতানৈক্য আছে। অনেকের মতে আগমের পাঁচটি বিভাগই ছিল। প্রথম চারটির সর্বত্র উল্লেখ দেখা যায়। পঞ্চম বিভাগের ততটা উল্লেখ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক সিলভেন লেভী মনে করেন সূত্রনিপাত, উদান, ধর্মপদ, স্থবিরগাথা, বিমানবস্তু ও বুদ্ধবংশ ক্ষুদ্রকাগমের অন্তর্গত গ্রন্থ।

ক্ষুদ্রকাগমের আজও কোন তেমন পুঁথিপত্র আবিষ্কার হয় নি। তবে ধর্মপদের প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ ও স্থবিরগাথার কিছু খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে। ধর্মপদের বিভিন্নাংশ মধ্যএশিয়ার নানা স্থান হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। সংস্কৃতে এটি উদানবর্গ বলে পরিচিত। গ্রন্থটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যএশিয়া হতে প্রাকৃত ধর্মপদের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে। স্থবিরগাথার খণ্ডিতাংশটি আবিষ্কৃত হয়েছে গিলগিট হতে। ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় এটি প্রকাশ করেছেন। যে অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা হতে জানা যায় পালি থেরগাথার সহিত এর সাদৃশ্য তত বেশী নয়।

বিনয়পিটক

এটি চার ভাগে বিভক্ত:—বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়বস্তু, বিনয়ক্ষুদ্রক ও বিনয়উত্তরগ্রন্থ। বিনয়বিভঙ্গ পালি সুত্তবিভঙ্গের অনুরূপ। বিনয়বস্তু পালি খন্ধকেব মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গদ্বয়ের অনুরূপ। বিনয়বস্তুর আবার ১৭টি পরিচ্ছেদ—প্রব্রজ্যাবস্তু, পোষধবস্তু, বর্ষাবস্তু, প্রবারণবস্তু, কঠিনবস্তু, চীবরবস্তু, চর্মবস্তু, ভৈষজ্যবস্তু, কর্মবস্তু, প্রতিক্রিয়াবস্তু, কালাকালসম্পদবস্তু, ভূম্যন্তরস্থ-চরণবস্তু, পরিকর্মবস্তু, কর্মভেদবস্তু, চক্রভেদবস্তু, অধিকরণবস্তু ও শয়নাসনবস্তু। আমার সর্বাস্তিবাদ গ্রন্থে (Sarvāstivāda Literature) এ সব পরিচ্ছেদগুলির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। পালি পরিবারপাঠের পরিবর্তে বিনয়ক্ষুদ্রক ও বিনয়উত্তরগ্রন্থ আছে। এ দু'খানি বিনয়ের ততটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নহে। বিনয়সম্বন্ধীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এ গুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সর্বাস্তিবাদ ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিনয়পিটকেরই বেশী মূল গ্রন্থ মধ্যএশিয়া ও গিলগিট থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যএশিয়া হতে প্রায় সম্পূর্ণ ভিক্ষু-

প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে। এ দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি গিলগিট (কাশ্মীর) হতে যে সব পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে সেগুলি সবই প্রায় বিনয় গ্রন্থের পুঁথি। তন্মধ্যে ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষসূত্র[১], কর্মবাক্য[২], বিনয়বস্তু, বিনয়বিভঙ্গ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বলেছি প্রায় এ সবগুলি প্রকাশিত হয়েছে। বিহার প্রাচ্য গবেষণা সংসদে (Bihar Oriental Research Society) গিলগিটের অনেক পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি বিনয়গ্রন্থের পুঁথি। এতে বিনয়সূত্র, বিনয়সূত্রটীকা, ভিক্ষুপ্রকীর্ণক ও উপসম্পদাজ্ঞপ্তি প্রভৃতি গ্রন্থের পুঁথি রয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থ অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে।

অভিধর্মপিটক

পালি অভিধম্মের অনুরূপ সংস্কৃতেও সাত খানি গ্রন্থ আছে। এ সাতখানি গ্রন্থ: জ্ঞানপ্রস্থানসূত্র, সংগীতিপর্যায়, প্রকরণপাদ, বিজ্ঞানকায়, ধাতুকায়, ধর্মস্কন্ধ ও প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র।

এদের মধ্যে জ্ঞানপ্রস্থানই সর্বপ্রধান গ্রন্থ। এটি মূল ও অন্যান্যগুলি পাদ বা পরিপূরক। অধ্যাপক তাকাকুসু মনে করেন বেদের সহিত বেদাঙ্গের যে সম্পর্ক অন্যান্য গ্রন্থগুলির সহিত জ্ঞানপ্রস্থানের সেই সম্পর্ক। একটির সাথে আরেকটির বেশ যোগসূত্র আছে। পালি গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুর সহিত এদের কোন সাদৃশ্য নেই। গ্রন্থগুলির সংখ্যাতেই মাত্র সাদৃশ্য। এগুলির সংস্কৃত মূল গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নি। চীনা অনুবাদেই সব গ্রন্থগুলি সংরক্ষিত রয়েছে। শুধু প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র গ্রন্থটির আবার তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়। সম্প্রতি আফগানিস্থানের বেমিয়ান গুহা হতে সংগীতিপর্যায়ের সামান্য খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অধ্যাপক তাকাকুসু (Prof. Takakusu) চীনা অনূদিত গ্রন্থগুলির বিষয় জে. পি. টি. এস পত্রিকায় (J. P. T. S. 1904—5) বিশেষ আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা হতেই শাস্ত্রগুলির একটু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

(ক) **জ্ঞানপ্রস্থানসূত্র**—বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৩০০ বছর পরে কাশ্মীরের খ্যাতনামা আচার্য কাত্যায়নীপুত্র এটি প্রণয়ন করেন। চীনা ভাষায়

১+২। আমি এ দু'খানি Indian Historical quarterly পত্রিকায় প্রকাশ করেছি।

এর দু'খানি অনুবাদ আছে। একটিকে অভিধর্ম-অষ্টগ্রন্থ বা অষ্টগ্রন্থ এবং অপরটিকে অভিধর্মশাস্ত্র বা জ্ঞানপ্রস্থানসূত্র বলা হয়। দু'টি গ্রন্থেরই আটটি বর্গ আছে। আটটি বর্গ আবার ৪৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থ দু'টির কয়েকটি অধ্যায়ের নামে পার্থক্য দেখা যায়। প্রজ্ঞা, ধ্যান প্রভৃতি এদের প্রধান বিষয়বস্তু।

(খ) **সঙ্গীতিপর্যায়**—চীনা লেখকদের মতে শ্রদ্ধেয় শারিপুত্র এর প্রণেতা। কিন্তু দার্শনিকপ্রবর যশোমিত্র ও ঐতিহাসিক বুতোন মনে করেন সর্বাস্তিবাদের আচার্য মহাকোষ্ঠিল্যই এর রচয়িতা। এটির ১০টি অধ্যায়। পালি অঙ্গুত্তরনিকায়ের মত এখানে ধর্মগুলি সংখ্যানুযায়ী সজ্জিত ও ব্যাখ্যাত।

(গ) **প্রকরণপাদ**—সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা আচার্য বসুমিত্র এর রচয়িতা। চৈনিক পর্যটক হুয়েন-সাঙের বিবরণী হতে জানা যায় আচার্য বসুমিত্র এটি পুষ্করবতী বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানকালে প্রণয়ন করেন। এর দু'খানা চীনা অনুবাদ আছে। অধ্যাপক তাকাকুসু মনে করেন, গ্রন্থটির নাম অভিধর্মপ্রকরণ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পাদগ্রন্থগুলির সহিত যুক্ত হওয়ায় এটির প্রকরণপাদ আখ্যা হয়। এর ৮টি অধ্যায়। বৌদ্ধ ধর্মের পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যাই গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

(ঘ) **বিজ্ঞানকায়**—ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের ১০০ বছর পরে শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী বিশোক বিহারে অর্হৎ দেবশর্মা এটি প্রণয়ন করেন। এর ৬টি অধ্যায়। পুদ্‌গল, ইন্দ্রিয়, শৈখ্য, অর্হৎ প্রভৃতির ব্যাখ্যা আছে। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মতে এটি ত্রিপিটাকান্তর্গত গ্রন্থ নহে।

(ঙ) **ধাতুকায়**—চীনা লেখকদের মতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৩০০ বছর পরে শ্রদ্ধেয় বসুমিত্র এটি প্রণয়ন করেন। কিন্তু আচার্য বসুমিত্র এবং তিব্বতীয় ঐতিহাসিক বুতোনের মতে পূর্ণই ইহার লেখক। এর দু'টি খণ্ড বা অধ্যায় আছে। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তুর সহিত প্রকরণপদের চতুর্থ খণ্ডের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক লা ভেলি ফুসে মনে করেন সংস্কৃত ধাতুকায় পালি ধাতুকথার ভিত্তিমূল।

(চ) **ধর্মস্কন্ধ**—চীনা লেখকদের মতে শ্রদ্ধেয় মৌদ্‌গল্যায়ন এর রচয়িতা। কিন্তু আচার্য যশোমিত্র ও ঐতিহাসিক বুতোন মনে করেন আর্য শারিপুত্র

এটি প্রণয়ন করেন। অভিধর্মশাস্ত্রের জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রের পরে এর স্থান। এতে ২১টি অধ্যায়। শিক্ষাপদ, শীল, চতুরার্যসত্য প্রভৃতির এখানে বিশদ আলোচনা আছে। গ্রন্থটিতে ভিক্ষু জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ের আধিক্য দেখা যায়। কি উপায়ে এই উন্নতি লাভ হয় তার সাধন-মার্গের নির্দেশ আছে। বুদ্ধঘোষের প্রধান গ্রন্থ বিসুদ্ধিমগ্‌গের সহিত এর তুলনা করা হয়।

(ছ) **প্রজ্ঞপ্তিসার**—মহামৌদ্‌গল্যায়ন এটি প্রণয়ন করেন। এর তিনটি খণ্ড—লোকপ্রজ্ঞপ্তি, কারণপ্রজ্ঞপ্তি ও কর্মপ্রজ্ঞপ্তি। চীনা অনুবাদে এর প্রথম খণ্ডটি অর্থাৎ লোকপ্রজ্ঞপ্তি খণ্ডটি পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীতে তিনটি খণ্ডেরই অনুবাদ আছে। লোকপ্রজ্ঞপ্তিতে লোকভূমির বিষয়, কারণপ্রজ্ঞপ্তিতে বোধিসত্ত্বদের মহাপুরুষলক্ষণ ও কর্মপ্রজ্ঞপ্তি থেকে বিবিধ কর্মের বিষয় জানা যায়। অনেকে মনে করেন দীঘনিকায়ের লক্‌খণসুত্তের সহিত গ্রন্থটির বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

মনে হয় এ ছ'টি পাদগ্রন্থ মূল গ্রন্থ জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রেরই পরিপূরক।

এ সব শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে সহজবোধ্য করার জন্য পরবর্তীকালে বহু টীকা-টিপ্পনী রচিত হয়। এ সব টীকাগুলি বিভাষা বলে খ্যাত। পূর্বেই বলেছি এ থেকে বৈভাষিক নামের উৎপত্তি। খ্যাতনামা আচার্য বসুবন্ধু অভিধর্মকোষ নামে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এটি জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রের টীকা এবং সর্বাস্তি-বাদ সম্প্রদায়ের অভিধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থাবলী

এ পর্যন্ত ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থ সমূহের আলোচনা কবা হল। ত্রিপিটক বহির্ভূত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাদের একটু পবিচয় দেওয়া আবশ্যক। পালি ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই সিংহলেব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের রচিত টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাকরণাদি গ্রন্থ। এ ছাড়া ব্রহ্মদেশেও পরবর্তী কালে পালি গ্রন্থ বিরচিত হয়। এ সবও টীকা, দীপনী, মধু, গন্ধি ইত্যাদি। এখন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে :—

মিলিন্দপঞ্‌হ—ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মিলিন্দপঞ্‌হ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিশিষ্ট গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি পালি ভাষায় রচিত নহে।

সংস্কৃত বা উত্তর ভারতের কোন একটি প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত। মূল গ্রন্থটি এখনও পাওয়া যায় নি। এখন যেটি আছে সেটি মূলগ্রন্থের পালি অনুবাদ। এটি যবনরাজ মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বিবিধ কথোপকথন। এ কথোপকথন কত যে মূল্যবান তা সহজে অনুমান করা যায়। প্লেটোর কথোপকথনের রচনাভঙ্গীর সহিত এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের অতি জটিল সমস্যাবলী সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। এ সব আলোচ্য সমস্যাগুলির অনুরূপ সমস্যা অভিধম্মপিটকের কথাবত্থু গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এটির ভাষা অতি সরল। বর্তমান গ্রন্থটির ৭টি খণ্ড আছে। অনেকের মতে মূল গ্রন্থটিতে মাত্র ৩টি খণ্ড ছিল। পরবর্তী কালে ৪র্থ হতে ৭ম খণ্ড এতে সংযোজিত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের ইতিহাসের দিক দিয়ে এটি একটি অমূল্য গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ পালি ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ এ গ্রন্থটিকে পিটকগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন।

নেত্তিপ্পকরণ ও **পেটকোপদেস**—এ গ্রন্থ দু'খানি মিলিন্দপঞ্হের সমকালীন। ভিক্ষু মহাকচ্চায়ন (মহাকাত্যায়ন) এদের রচয়িতা। নেত্তিপ্পকরণে মূল রচনা ও তার ব্যাখ্যা যথাক্রমে প্রদর্শিত হয়েছে। এটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ যাতে বুদ্ধের মতবাদের ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্তের সহিত বেদের যে সম্বন্ধ এ গ্রন্থটিরও পালি শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত সে সম্পর্ক আছে। পালি গ্রন্থসমূহের মধ্যে এতেই তর্কশাস্ত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটিকে আবার নেত্তিগন্ধ বা শুধু নেত্তিও বলা হয়।

মিসেস রিস্ ডেভিড্সের মতে নেত্তিপ্পকরণ অভিধর্মের শেষ দু'খানি গ্রন্থ যমক ও পট্ঠানের অনেক পূর্বে রচিত। নেত্তিপ্পকরণের সহিত সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের প্রধান অভিধর্মগ্রন্থ জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের কয়েকটি বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে ধর্মপাল এর একটি টীকা রচনা করেন।

পেটকোপদেস—ভিক্ষু মহাকাত্যায়ন এটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটিতে নেত্তিপ্পকরণেরই বিন্যাসধারা অনুসৃত হয়েছে এবং এর তিনটি পরিচ্ছেদ হুবহু পেটকোপদেসে উদ্ধৃত রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর উপযোগী পিটক গ্রন্থসমূহের উপদেশাবলী আছে। স্থানে স্থানে আবার ত্রিপিটক গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। নেত্তিপ্পকরণের যে সব বিষয় দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট তা এতে সুন্দর

ভাবে আলোচিত হয়েছে এবং অনেক স্থানে নতুন আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে চতুরার্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের সার বা মূলসূত্র বলে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী কালে সর্বাস্তিবাদ গ্রন্থসমূহে এই মহান সত্যের বিশেষ সূক্ষ্ম আলোচনা হয়েছে।

নিদানকথা—এতে বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবনকাহিনী অনেকটা বিবৃত রয়েছে। এ ছাড়া অন্য গ্রন্থে তেমন কিছুই জীবনী পাওয়া যায় না। নিদান-কথার রচয়িতা কে তা জানা যায় না। এটি জাতক-অট্ঠকথা অর্থাৎ জাতক টীকার মুখবন্ধ। এটি তিন ভাগে বিভক্ত: দূরেনিদান, অবিদূরেনিদান ও সন্তিকেনিদান। দূরেনিদানে দীপংকর বুদ্ধের সময় গৌতম বুদ্ধের সুমেধ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ হতে তুষিত নামক স্বর্গে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধবংস এবং চরিয়াপিটকের সহিত এর বেশ সম্পর্ক আছে। প্রধানত এ দু'টি গ্রন্থের সারভাগের উপরই এটি লেখা। কেবলমাত্র সুমেধের বর্ণনাটি বুদ্ধবংসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত। অবিদূরেনিদানে গৌতমবুদ্ধের তুষিত স্বর্গ থেকে অবতরণ হতে নৈরঞ্জনাতীরে বোধি প্রাপ্তি পর্যন্ত বর্ণনা আছে। মোটকথা নিদানকথা বুদ্ধ উপাখ্যান বিস্তারের দিক দিয়ে সংস্কৃত ললিত-বিস্তার বা অনুরূপ কোন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির চেয়ে পূর্ব স্তর প্রকাশ করে। এ বিষয়ে গ্রন্থটি অতি প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য।

মহাবংস ও দীপবংস—এ দু'খানি গ্রন্থই সিংহলের প্রখ্যাত পালি গ্রন্থ। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে পালি অট্ঠকথা বা টীকা অবলম্বনে বিরচিত। মহাবংসের রচয়িতা যে কবি মহানাম তা জানা যায়। গ্রন্থ দু'খানির বিষয়বস্তু ও পদবিন্যাসে বেশ সাদৃশ্য আছে। এমন কি এ দু'টির ভাষাতেও হুবহু মিল দেখা যায়। দু'খানিরই আরম্ভ গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনীতে। জানা যায় বুদ্ধ তিনবার সিংহল দেশে যান। ভারত ও সিংহলের প্রাচীন রাজবংশের বংশাবলীর এবং প্রথম তিনটি সংগীতির ইতিবৃত্ত এখানে মেলে। আবার সম্রাট অশোকও তার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রার সদ্ধর্ম প্রচারের বিষয়ও জানা যায়। মোটকথা সিংহলের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের দিক দিয়া এ দু'খানি গ্রন্থ অতি মূল্যবান।

টীকা গ্রন্থ: এখন কয়েকটি মূল্যবান টীকার কথা বলা হচ্ছে। এ টীকাগুলি

বুদ্ধদেবের ভাবধারাকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত ও বোধগম্য করে তুলেছে। এ সব টীকাকারদের মধ্যে বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল—এ তিন জনেরই নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার বুদ্ধঘোষই প্রধান।

বুদ্ধদত্ত ছিলেন বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক। অনেকের মতে তিনি ছিলেন বুদ্ধঘোষের সমবয়সী। আবার অনেকে মনে করেন বুদ্ধঘোষের চেয়ে তিনি কিছু বড ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভাবতের উরগপুরের (বর্তমান উরমিয়ু) অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিনয ও অভিধর্মেব উপর অনেক টীকা লেখেন। এ টীকা গুলির মধ্যে **বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধম্মতার** এবং **রূপারূপ-বিভাগ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম টীকা দু'খানি বিনয়পিটক অবলম্বনে রচিত। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় সম্বন্ধীয বিষয়গুলির আলোচনা আছে।

অবিধম্মাবতার—এ গ্রন্থটিতে ২৪টি পরিচ্ছেদ আছে। এটি গদ্য ও পদ্যে রচিত। চিত্ত, চৈতসিক, আবম্বন, বিপাকচিত্ত, রূপ, নির্ব্বাণ প্রভৃতি এর বিষয় বস্তু। অভিধর্মের সূক্ষ্ম বিষযের বিশ্লেষণই গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

রূপারূপবিভাগ—গ্রন্থটি পদ্যে রচিত। রূপ, চিত্ত, চৈতসিক প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়। মোটকথা অভিধর্মের দুরূহ ও দুর্বোধ্য নামরূপের ব্যাখ্যাই এর উদ্দেশ্য।

এ গ্রন্থ চারটিকে বুদ্ধদত্তের হাত বই (Buddhadatta's Manual) বলা হয়।

বুদ্ধঘোষ—আচার্য বুদ্ধঘোষ ছিলেন মগধের বুদ্ধগয়ার লোক। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম হয়। ভিক্ষু বেরতেব নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি সিংহলে যান পালি অট্‌ঠকথা বা টীকার অনুসন্ধানে। টীকাকার ও ভাষ্যকার হিসাবে বুদ্ধঘোষই পালি সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ও সমাদৃত। তিনি সমস্ত ত্রিপিটকের উপর অনেক টীকা লেখেন। এ সবগুলি তাঁর ত্রিপিটক সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানেব পরিচয় দেয়। সকলেই মনে করেন যে, গ্রন্থগুলির মূল্য টীকার চেয়ে অনেক বেশী। **বিসুদ্ধিমগ্‌গ** (বিশুদ্ধিমার্গ) তাঁর প্রথম রচিত গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ২৩টি অধ্যায় আছে। একটি গাঁথার [১] ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তিনি এ বিরাট গ্রন্থটি

১। সীলে পতিট্‌ঠায় নবো সপঞ্‌ঞো, চিত্তং পঞ্‌ঞং চ ভাবয়ং।
আতাপী নিপকো ভিক্‌খু, সো ইমং বিজটয়ে জটং॥

লেখেন। এ গ্রন্থটি সমস্ত ত্রিপিটকের সারসংগ্রহ। এটি একটি বৌদ্ধকোষ। গ্রন্থটি বুদ্ধঘোষকে অমর করে রেখেছে।

সমন্তপাসাদিকা—তাঁর আর একখানি বড় টীকা। বিনয়পিটকের মূল পাঁচখানি গ্রন্থের উপরই এটি লিখিত। বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও এখানে সংগীতির আহ্বানের কারণ, স্থান ইত্যাদি এবং অষ্টাদশ মহাবিহার, বিনয়-সূত্র-অভিধর্মের বিভাগ, রাজা অশোকের কথা, কর্মস্থান, স্মৃতি প্রভৃতির আলোচনা পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও **সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী** প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ টীকা লেখেন। তাঁর **অথসালিনী** হচ্ছে অভিধর্মের ধম্মসংগণির টীকা। গ্রন্থটিতে প্রধানত কতকগুলি বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব বিবরণের ব্যাখ্যা আছে। এতে আবার অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক খবর পাওয়া যায়। গ্রন্থটির মুখবন্ধে বুদ্ধঘোষ সাহিত্যিক ও দার্শনিক কতগুলি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তাঁর এ সাহিত্যিক আলোচনা আমাদের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্মের কাল নিরূপণের যথেষ্ট সাহায্য করে।

ধর্মপাল—ধর্মপাল ছিলেন দক্ষিণ ভারতের সিংহলের নিকটস্থ পদরতীর্থের লোক। তিনিও খুদ্দকনিকায়ের কয়েকটি গ্রন্থের উপর **পরমথদীপনী** নামে টীকা রচনা করেন। তাঁর এসব রচনা বুদ্ধঘোষের টীকার চেয়ে অনেক কম মূল্যবান।

আধুনিক গ্রন্থঃ এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে :—

মহাবোধিবংস বা বোধিবংস—একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভিক্ষু উপতিস্স কর্তৃক রচিত। এতে গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভ, দশবল বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ, তিনটি বৌদ্ধসংগীতি ও মহিন্দের লঙ্কাগমন প্রভৃতির কাহিনী পাওয়া যায়।

দাঠাবংস—ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়াব দিকে মহাস্থবির ধম্মকীত্তি কর্তৃক বিরচিত। তিনি ছিলেন সিংহলের অধিবাসী ও খ্যাতনামা লেখক সারিপুত্তের শিষ্য। সংস্কৃত, মাগধী প্রভৃতি ভাষা ও ব্যাকরণে তাঁর ছিল অশেষ পাণ্ডিত্য। গ্রন্থটি পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। এতে সিংহলে আনীত ভগবান বুদ্ধের দন্তধাতুর বিবরণ মেলে। এর ভাষা সরল পালি নহে—সংস্কৃতানুগ পালি।

থূপবংস—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাচিস্সর কর্তৃক রচিত। পালি ও সিংহলী

উভয় ভাষাতেই গ্রন্থটি পাওয়া যায়। এর বিষয়বস্তুকে মোটামুটি তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হতে পরিনির্বাণ, তাঁর পুতাস্থি বণ্টন ও রাজগৃহে অজাতশত্রু কর্তৃক অস্থিধাতুর উপর স্তূপ নির্মাণ প্রভৃতির কাহিনী এবং তৃতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদে অস্থিধাতুর পরবর্তী ইতিকথা রয়েছে।

হত্থবনগল্লবিহারবংস—এটি একাদশ পরিচ্ছেদে অতি সরল পালি ভাষায় রচিত। এর প্রথম আটটি পরিচ্ছেদে রাজা সিরিসংঘবোধির কাহিনী ও শেষের তিনটি পরিচ্ছেদে তাঁর শেষ বাসস্থানে নির্মিত স্তূপ ও স্তম্ভের বিবরণ রয়েছে।

ছকেসধাতুবংস—এটি ব্রহ্মদেশের জনৈক বৌদ্ধাচার্য কর্তৃক রচিত। এর ভাষা খুব সরল ও সাবলীল। এতে বুদ্ধের কেশধাতুর উপর শক্র, পর্জন্য, মণিমেখলা, অধিকনাবিক, বরুণ, নাগরাজ প্রভৃতির দ্বারা রচিত স্তূপগুলির কাহিনী আছে।

গন্ধবংস—এটি পাঁচ অধ্যায়ে রচিত আধুনিক গ্রন্থ। এটিও ব্রহ্মদেশে নন্দপঞ্ঞ কর্তৃক বিরচিত। এতে পালি শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াও আধুনিক পালি বই-এরও অনেক গ্রন্থকারের বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সাসনবংস—উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ের সংঘরাজ বিহারের খ্যাতনামা আচার্য প্রজ্ঞাস্বামী স্থবির কর্তৃক রচিত। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের ইতিহাসই এটির প্রধান আলোচ্য বিষয়। আনুষাঙ্গিকরূপে অন্যান্য দেশেরও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের কাহিনী এতে মেলে।

কাব্য গ্রন্থ : পালি ভাষা কাব্যজাতীয় রচনাতেও সমৃদ্ধ হয়েছিল। দশ বা একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হতে আরম্ভ করে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ সব কাব্য গ্রন্থ বেশীর ভাগই রচিত হয় সিংহলে। এখানে এদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে :

অনাগতবংস—এটি ১২৪টি কবিতায় ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়ের জীবন বৃত্তান্ত। বুদ্ধবংসের রচনানীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। বস্তুত এটি বুদ্ধবংসেরই একটি পরিপূরক গ্রন্থমাত্র।

জিনচরিত্র—এটি বনরত্ন মেধংকর কর্তৃক বিভিন্ন ছন্দে ৪৭০ টিরও অধিক

গাথায় রচিত। এর কিছু গাথা আবার তেরটি অক্ষরে অতিজগতী ছন্দে রচিত। নিদানকথার কাহিনী অবলম্বনে সংস্কৃত বুদ্ধ চরিতের মত এটির প্রধান বিষয়বস্তু ভগবান বুদ্ধের জীবন চরিত।

তেলকটাহগাথা—আটানব্বইটি কবিতায় রচিত একটি ছোট কাব্যের বই। এতে মনুষ্য জীবনের অসারতা ও বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম আলোচিত হয়েছে।

পজ্জমধু—বুদ্ধপিয় কর্তৃক একশো চারটি কবিতায় রচিত। এতে বুদ্ধের গুণকীর্তন রয়েছে। ভাষা সংস্কৃতানুগ পালি।

সদ্ধম্মোপায়ন—আচার্য বুদ্ধসোমপিয় কর্তৃক রচিত। এতে নয়টি অধ্যায়ে ৬২৯টি কবিতায় সদ্ধর্মের গৌরব মহিমা বিবৃত রয়েছে। অষ্ট অক্ষণ, দশ অকুশল, প্রেতদের দুর্দশা প্রভৃতির বিবরণ মেলে।

পঞ্চগতিদীপন—এতে কায়, বাক ও মনজনিত অকুশল কর্মের যে পাঁচটি গতি—নরক, তির্যক, প্রেত, অসুর ও মনুষ্য—তার বিবরণ রয়েছে। সঞ্জয়, কালসুত্ত, সংঘাত, রোরুব প্রভৃতি নরকের বর্ণনাও আছে। এটি একশো চৌদ্দটি কবিতার সংগ্রহ।

ব্যাকরণ গ্রন্থ ঃ পালি ভাষায় ব্যাকরণ গ্রন্থের অপ্রাচুর্য নেই। ব্যাকরণ গ্রন্থ সবই রচিত হয় সিংহল ও ব্রহ্মদেশে। তিন জন ছিলেন প্রধান বৈয়াকরণ—**কচ্চায়ন**, মোগ্গলান ও অগ্গ বংস। প্রথম দু'জন ছিলেন সিংহলের অধিবাসী এবং তৃতীয় ও শেষ আচার্য ছিলেন ব্রহ্মদেশের লোক। এঁদের মধ্যে কচ্চায়নই সর্ব জ্যেষ্ঠ। তিনিই প্রথম **সুসন্ধিকপ্প** নামে একখানি পালি ব্যাকরণ লেখেন। সংস্কৃত কাতন্ত্র ব্যাকরণের বহু সূত্রের সংগে এটির সূত্রের বেশ সাদৃশ্য আছে। কচ্চায়নের সূত্রগুলির অবলম্বনে রচিত হয় **মহারূপসিদ্ধি, বালাবতার** প্রভৃতি এবং মোগ্গলানের ব্যাকরণের অনুকরণে **পয়োগসিদ্ধি, পদসাধন** প্রভৃতি। আচার্য অগ্গবংসের প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ **সদ্দনীতি** অনুসরণে আবার চুলসদ্দনীতির রচনা। এ ছাড়া পরবর্তী কালে আরও অনেক ব্যাকরণ রচিত হয়।

অলংকার ও ছন্দ গ্রন্থ ঃ অলংকার ও ছন্দশাস্ত্রের গ্রন্থ পালি ভাষায় খুবই কম। সিংহলের খ্যাতনামা আচার্য সংঘরক্ষিতের **সুবোধালংকারই** একমাত্র গ্রন্থ। আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শের অনুকরণে এ গ্রন্থটি রচিত। এতে

তিন শত সাতষট্টিটি গাথা রয়েছে। এগুলিকে আবার পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। ভগবান বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বন করে এটিতে অলঙ্কারের উদাহরণ দেওয়া আছে।

ছন্দগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **বুত্তোদয়**। এটি স্থবির সংঘরক্ষিত কর্তৃক রচিত। এতে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

নবম অধ্যায়

বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষা

শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা, প্রচলন ও প্রসার আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু পূর্বে ইউরোপে খৃষ্ট যাজকেরা ও ভারতে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ও রীতি-পদ্ধতি নিরূপণ করতেন। তখনকার রাজন্যবর্গেরও তাঁরা এ কাজে সক্রিয় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রথাই অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগ হতে আরম্ভ করে আজও ভারতে এ প্রথার লোপ পায় নি। এখানে যে শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলা হচ্ছে এই বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সহিত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পার্থক্য ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার ও সংঙ্ঘা-রামগুলি। এখানে শিক্ষা দেওয়া হত সঙ্ঘবদ্ধভাবে। ধর্মীয় ও বৈষয়িক সব শিক্ষাই পরিবেশন করতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। এঁদের ছিল সেকালে এসব একচেটিয়া। মোট কথা এঁরাই ছিলেন বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার ধারক ও বাহক। বৌদ্ধ জগতে বৌদ্ধ বিহার ছাড়া অন্যত্র কোথাও শিক্ষা-দীক্ষার সেরূপ বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার ইতিহাস মূলত বৌদ্ধ সঙ্ঘেরই ইতিহাস। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল একক ও ব্যক্তিক। গুরু গৃহেই ছিল এর কেন্দ্র। দ্বিজ ও উচ্চবর্ণ স্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া কারু সেই গৃহে প্রবেশাধিকার ছিল না। অধিতব্য বিষয়ও আবার ছিল সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

আগেই বলা হয়েছে সঙ্ঘে প্রবেশের দু'টি ছিল সোপান—প্রথমটি প্রব্রজ্যা ও অপরটি উপসম্পদা। এ দু'টিই গড়ে তুলত ভিক্ষু জীবন। পালি মহাবগ্‌গ পাঠে জানা যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যখন বিহারে বসবাস করতে আরম্ভ করেন তখন উপদেশ ও অনুশাসনের অভাবে ভিক্ষুদের মধ্যে অনেকেই অশোভন আচার ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে জনসাধারণ ভিক্ষুদের নিন্দা করতেন। সেজন্য ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের শাসনের জন্য উপাধ্যায় ও আচার্যের বিধান করেন।

উপাধ্যায় তরুণ শিক্ষার্থীকে প্রব্রজ্যা ও ধর্মবিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক উপদেশ দিতেন। আর আচার্য নজর দিতেন তার আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধন মার্গের

উপর। আচার্যকে আবার কর্মাচার্য বলেও পালি সাহিত্যে আখ্যা দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে কিন্তু আচার্যের স্থান উপাধ্যায়ের উপরে। উপাধ্যায়ের অধীনে যে সব শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাদের বলা হত সহবিহারী (সদ্ধিবিহারিক) এবং আচার্যের অধীনস্থ শিক্ষার্থীদের বলা হত অন্তেবাসী (অন্তেবাসিক)। উপাধ্যায় সহবিহারীকে পুত্রের মত এবং সহবিহারী উপাধ্যায়কে পিতার মত মনে করতেন। এরূপে আবার আচার্য অন্তেবাসীকে পুত্রের মত এবং অন্তেবাসী আচার্যকে পিতার মত দেখতেন। এরূপ সম্পর্কের জন্য সঙ্ঘজীবন মধুর হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে এ রীতির পারিভাষিক নাম হচ্ছে নিশ্রয় সম্পত্তি (নিস্সয় সম্পত্তি) অর্থাৎ শিষ্যের গুরুর উপর সর্বপ্রকারে নির্ভর করা। নিশ্রয়কাল সাধারণত দশ বছর। কিন্তু যে শিক্ষার্থী ভিক্ষু দক্ষ ও যোগ্য তাকে পাঁচ বছর মাত্র অন্যের অধীনে থাকতে হত এবং অদক্ষ ও অযোগ্যকে আজীবন অন্যের আশ্রয়ে বাস করতে হত। দশ কিংবা ততোধিক বছর উপসম্পদাপ্রাপ্ত প্রাজ্ঞ ও দক্ষ উপাধ্যায় এবং আচার্যই কেবল আশ্রয় দিতে পারতেন। জানা যায় পাঁচ কারণে উপাধ্যায়ের আশ্রয় ও ছ কারণে আচার্যের আশ্রয় রহিত হত। মোটকথা সঙ্ঘের শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও আচার বিষয়ে গুরুর ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপরই বেশী জোর দেওয়া হত। সব তরুণ শিক্ষার্থীকে উপাধ্যায় গ্রহণ করতে হত। উপাধ্যায় গ্রহণ এরূপ—শিক্ষার্থীকে তার উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) এক কাঁধে রেখে প্রস্তাবিত উপাধ্যায়ের পদ বন্দনা করে হাঁটুর উপর ভব দিয়ে বসে যুক্ত করে সেই ভিক্ষুকে তার উপাধ্যায় হবার জন্য তিনবার অনুরোধ জানাতে হত। তিনি তখন তাঁর কায় বা বাক্যের দ্বারা তাঁর উপাধ্যায় হবার সম্মতি জানাতেন।

বৌদ্ধ প্রথায়ও ব্রাহ্মণ্য প্রথার মত শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শিষ্যের গুরুর পরিচর্যার বিধান আছে। শিক্ষার্থীকে সকালে বিছানা থেকে উঠে তার উপাধ্যায়কে দাঁতন ও মুখ ধোবার জল দিতে হত। তারপর আসন পেতে দিয়ে ধোয়া পাত্রে তাকে যাগু দিতে হত। যাগু খাওয়া হলে পাত্রটি আবার ভাল করে ধুয়ে মুছে রাখতে হত। উপাধ্যায় আসন থেকে উঠলে আসনটি পুনরায় তুলে রাখতে হত। জায়গাটি ময়লা হলে তাকে ঝাঁট দিতে হত। উপাধ্যায় যদি গ্রামে যেতে ইচ্ছুক হতেন তা হলে তাকে ত্রিচীবর, কটিবন্ধ ও ভিক্ষাপাত্র এনে দিতে হত। যদি তিনি তাকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করতেন

তা হলে তাকে উপযুক্তভাবে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁর অনুগামী হতে হত। কিন্তু তাকে না দূরে বা না কাছে থাকা চলত না। উপধ্যায়ের কথা বলার সময় মাঝখানে সে কোন কথা বলতে পারত না। তবে তাঁর কথা যদি আপত্তিজনক হত তাঁকে নিষেধ করতে পারত। ফিরবার সময় উপাধ্যায়ের আগেই এসে তাকে আসন ও পা ধোবার জল প্রস্তুত রাখতে হত এবং বেশভূষা প্রভৃতি পরিবর্তনে তাকে সাহায্য কবতে হত। তাঁর চীবর যদি স্বেদসিক্ত হত তাহলে তা উত্তাপে উত্তপ্ত করে যথাস্থানে তুলে রাখতে হত। যদি আহার্য প্রস্তুত থাকে এবং উপাধ্যায় আহার করতে ইচ্ছা করেন তা হলে জলসহ আহার্য দিতে হত। ভোজনান্তে পাত্র ভাল করে ধুয়ে আবার তা যথাস্থানে রাখতে হত। যদি উপাধ্যায় স্নান করতে ইচ্ছা করতেন, তাকে স্নানের ব্যবস্থা করতে হত। শীতল জলের প্রয়োজন হলে তাঁকে শীতল জল এবং গরম জলের প্রয়োজন হলে গরম জল দিতে হত। যদি উপাধ্যায় স্নানাগারে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তা হলে তাকে অঙ্গ মার্জনের জন্য চূর্ণ ও মৃত্তিকা দিতে হত এবং স্নানাগারের পীঠ তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ে দিতে হত। স্নানাগারে তাকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হত এবং সেখানে সে স্থবির ভিক্ষুদের সংগে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে বা নতুন ভিক্ষুদিগকে আসন চ্যুত করতে পারত না। স্নানাগারে তাকে তাঁর অঙ্গ মার্জনা করতে হত। যদি শিক্ষার্থীকে স্নান কবতে হত তা হলে তাকে শীঘ্রই স্নান সেরে তার দেহ হতে জল মুছে শুষ্ক বস্ত্র পরে উপাধ্যায়ের পরিধেয় বস্ত্র ও বসবার আসন দিতে হত। তারপর তাকে জলপান করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হত। স্নানের পর অবসর সময় উপাধ্যায় যদি উপদেশ দিতে বা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করতেন তা হলে তাকে উপদেশ নিতে ও প্রশ্ন করতে হত।

সঙ্ঘে কোন ভৃত্য নিযুক্ত করা হত না। শিক্ষার্থীকেই সময় মত চাকরের কাজ করতে হত। উপাধ্যায় যে বিহারে থাকতেন, সেই বিহার ময়লা হলে তাকে পরিষ্কার করতে হত। পরিষ্কার করার পূর্বে তাকে পাত্র, চীবর, চাদর, মাদুর, আসন, বালিস প্রভৃতি ঘর হতে বের করে এক পাশে রাখতে হত। তারপর এগুলি পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে রাখতে হত। তাকে বিহারের অঙ্গন, পাকশালা, ভাড়ার ঘর প্রভৃতিও ঝাঁট দিতে হত। এমন কি পায়খানার আবর্জনাও তাকে পরিষ্কার করতে হত। পালি চুল্লবগ্‌গ গ্রন্থে এ বিষয়ে

বিশদ বিবরণ মেলে। উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করে সে অন্যকে ভিক্ষাপাত্র দিতে বা অন্যের ভিক্ষাপাত্র নিতে পারত না ; অন্যকে চীবর দিতে বা অন্যের চীবর নিতে পারত না ; অন্যের চুল কাটতে বা অন্যের দ্বারা চুল কাটাতে পারত না। অন্যের পরিচর্যা করতে বা অন্যের দ্বারা নিজের পরিচর্যা করতে পারত না এবং অন্যের দ্বারা নিজের ভিক্ষান্ন আহরণ করতে পারত না। উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করে সে গ্রামে প্রবেশ করতে পারত না ও শ্মশানে যেতে পারত না। এমন কি কোন দিকেই যেতে পারত না। যদি উপাধ্যায় পীড়িত হতেন তবে তাকে রোগ মুক্তির জন্য যাবজ্জীবন পরিচর্যা করতে হত। মোট কথা উপরোক্ত কর্তব্যগুলিকে সাধারণভাবে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :—(ক) শিক্ষার্থীর নিজ কর্তব্য সম্বন্ধীয়, (খ) উপাধ্যায়ের পরিচর্যা বিষয়ক এবং (গ) সঙ্ঘের হিতকর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। শিক্ষার্থীকে যেমন অপকটে পরিচর্যা করতে হত, উপাধ্যায়ের তেমন শিক্ষার্থীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হত ও তার সব কাজকর্মের উপর বিশেষ নজর রাখতে হত। শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন, উপদেশ ও অনুশাসন দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করতে হত। পুত্রের কল্যাণের জন্য পিতা যেমন সতত চিন্তিত থাকেন উপাধ্যায়ও তেমন শিক্ষার্থীর জন্য চিন্তিত থাকেন। পূর্বেই বলেছি উপাধ্যায়ের সহিত শিক্ষার্থীর পিতাপুত্রের সম্বন্ধ ছিল। শিক্ষার্থী পীড়িত হলে যতদিন পর্যন্ত সে সুস্থ ও স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে সক্ষম না হত ততদিন তাঁকে পরিচর্যা করতে হত। অবশিষ্টাংশ শিক্ষার্থীর কর্তব্যের তুল্য।

উপাধ্যায় বিহার হতে নির্জনে সাধনার জন্য অন্যত্র চলে গেলে, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করলে বা অন্য সম্প্রদায়ে যোগ দিলে তখন আচার্যই শিক্ষার্থীকে দর্শন ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এরূপে শিক্ষার্থীর শিক্ষা বিষয়ে যাতে কোন বাঁধা না হত সঙ্ঘে তার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে বলা যেতে পারে উপাধ্যায়ের উপদেশ হতে অনেক সময় সে একেবারেই বঞ্চিত হত না। কারণ উপাধ্যায় বিহারে ফিরে গেলে তিনি শিক্ষার্থীকে আবার উপদেশ দিতে পারতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে উপাধ্যায়ের নিকট যে সব শিক্ষার্থী উপদেশ নিত তাদের বলা হত সহবিহারিক (সদ্ধিবিহারিক) এবং আচার্যের নিকট যারা নিত তারা আখ্যা পেত অন্তেবাসিক। সহবিহারিক অর্থ যে উপাধ্যায়ের সহিত বিচরণ

করত অর্থাৎ সর্বদা উপাধ্যায়ের সাথে সাথে থাকত। অন্তেবাসিক অর্থ যে আচার্যের অন্তে বা নিকটে থাকত। অন্তেবাসিক শুধু নির্দিষ্ট সময়ে আচার্যের নিকট হতে উপদেশ নিত। শিক্ষার্থীর ব্যাপারে আচার্যের চেয়ে উপাধ্যায়েরই অনেক বেশী দায়িত্ব ছিল। প্রব্রজ্যা দেয়া হতে আরম্ভ করে তার উপসম্পদার ব্যবস্থা করা ও ভিক্ষুর কি কি কাজ তাঁকে সব শেখাতে হত।

শিক্ষার্থী-অন্তেবাসিকের আচার্যের প্রতি কর্তব্য ও আচার্যের অন্তেবাসিকের প্রতি কর্তব্য, শিক্ষার্থী-সহবিহারিকের উপাধ্যায়ের প্রতি ও উপাধ্যায়ের সহবিহারিকের কর্তব্যের হুবহু অনুরূপ ছিল। সুতরাং এখানে তার আর পুনরুক্তি করা হল না।

শিক্ষার্থীর গর্হিত আচরণের জন্য সংঘে আবার দণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল। পালি সাহিত্যে এই দণ্ড দানের নাম হচ্ছে পণামিত বা প্রণমিত। আর পারিভাষিক নাম হচ্ছে পণাম। গুরু প্রথমে শিক্ষার্থীকে চীবর মাত্র নিয়ে ঘরের বাহিরে যাবার জন্য আদেশ দিতেন এবং তার কোন পরিচর্যাই নিতেন না। শিক্ষার্থী দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে গুরুকে অবশ্যই ক্ষমা করতে হত এবং সে আবার পূর্বের মত তাঁর সাহচর্য লাভ করত ও সকল সুখ-সুবিধা ফিরে পেত। পালি মহাবগ্‌গ হতে জানা যায় শিক্ষার্থীর যখন উপাধ্যায়ের প্রতি অধিক মাত্রায় প্রেম নেই; অধিক মাত্রায় শ্রদ্ধা নেই; অধিক মাত্রায় লজ্জাশীলতা নেই, অধিক মাত্রায় ভক্তি নেই এবং অধিক মাত্রায় উপাধ্যায়ের সম্বন্ধে চিন্তা নেই তখন তাকে প্রণমিত অর্থাৎ সাময়িক দণ্ড দেওয়া হত।

বিহারে ভিক্ষুদের অধিকাংশ সময়ই কাটত ধ্যানধারণায়। বাকী সময়টুকু তাঁরা আবার দিতেন দেশের ও সঙ্ঘের হিতকর কাজে। সঙ্ঘের তরুণ শিক্ষার্থীদের আদর্শ ভিক্ষু করে গড়ে তোলার ভার তাঁদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তাছাড়া বিহারের কাছাকাছি অনেক লোকও আসত সেখানে উপদেশ নিতে। সেজন্য সে কালে বৌদ্ধ বিহারগুলি শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলি আবার আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে। বিহারের শিক্ষানবীশরাই ছিলেন আবাসিক ছাত্র। যারা বাহির হতে আসত তাদের শিক্ষা দেয়া হত দিনের বেলায়। তাদের কাছে বিহার ছিল দিন মাপিক বিদ্যালয় (Day school)। বিহারের প্রাজ্ঞ ও বহুদর্শী ভিক্ষুরাই পড়াবার সুযোগ পেতেন। অর্থাৎ খ্যাতনামা ভিক্ষুরাই হতেন অধ্যাপক। পুরাকালের শিক্ষাপদ্ধতির ধরণ-

ধারণ অন্যরকম ছিল। বর্তমান যুগের সংগে তার তুলনা হয় না। জ্ঞানচর্চা তখন চলত মুখে মুখে এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায়। পালি বিনয়পিটক হতে জানা যায় বৌদ্ধ যুগেও সেই একই অবস্থা ছিল। ভিক্ষুদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলির মধ্যে কোন পুঁথিপত্র বা লেখ্য উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সরকারী কাজের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রস্তর লিপি বা শিলালিপি ছাড়া বই লেখা সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের আগে চালু হয়নি। মথুরা যাদুঘরে একটি বিকৃত ভাস্কর প্রতিলিপি হতে জানা যায় বৌদ্ধ যুগে আচার্যরা কিরূপে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে শিক্ষা দিতেন। এ প্রতিলিপিটিতে দেখা যায় আচার্যের মাথার উপর একটি ছাতা রয়েছে, বাঁ হাত দিয়ে তিনি ছাতাটির বাঁট ধরে আছেন এবং তাঁর সামনের খোলা জায়গায় হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নানা ভঙ্গিতে তারা অবহিত হয়ে উপদেশ শুনছেন। বিহারে সাধারণত উপদেশ দেওয়া হত ধর্ম বা ধর্মাচার বা বিনয় বিষয়ে। মুখ্য উপদেশ ছিল যাতে শিক্ষার্থীরা সত্যে আদর্শ ভিক্ষু হয়ে গড়ে উঠেন। এসব ধর্মমত ও নিয়ম-কানুন পালনের উপর এত জোরই ছিল বৌদ্ধধর্মের মেরুদণ্ড। ধর্মের আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক রূপ সৃষ্টি করেছিল বিহারগুলি এবং গড়ে তুলেছিল আদর্শ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল বর্তিকার ধারক ও বাহক এঁরাই ছিলেন ভারত ও বহির্ভারতে। মোটকথা বৌদ্ধধর্মের আয়ু বিহারগুলির উপরই নির্ভর করেছিল। যতদিন বিহারগুলি তার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল ততদিন বৌদ্ধধর্ম সজীব ছিল।

বিহারে শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও বিনয়সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির উপর বেশী জোর দেওয়া হত। পালি মহাবগ্‌গ পাঠে জানা যায় এ ছাড়া আরও অনেক পঠিতব্য বিষয় ছিল। সেগুলি হচ্ছে—রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্যকথা, সৈন্যকথা, যুদ্ধকথা, অন্নপানকথা, বস্ত্রকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, জনপদকথা, জ্ঞাতিকথা, স্ত্রীকথা, পুরুষকথা, পূর্বপ্রেতকথা, লোকাখ্যায়িকা, সমুদ্রাখ্যায়িকা, ভবাভবকথা ইত্যাদি। বস্তুত এর বিষয়বস্তু ও প্রসঙ্গগুলির মূল ছিল প্রাক্ বৌদ্ধ যুগের গ্রাম্য লোকদের জন্য ভাটদের রচিত গীতিকা। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মকে লোকপ্রিয় করবার জন্য যে সব জাতকের উৎপত্তি হয়েছি সেগুলিরও আবার উৎস ছিল এসব আখ্যান। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে রণকৌশল জানতেন তার প্রমাণ জাতক হতে জানা যায়। রাজা প্রসেনজিত অজাত-

শত্রুর নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে রণব্যূহ শিক্ষার জন্য বিহারে ভিক্ষুদের শরণাপন্ন হন। তারপর রাজা অজাতশত্রুকে তিনি পরাস্ত করে বন্দী করেন। পালি সাহিত্যে এ বিদ্যাগুলির পারিভাষিক নাম হচ্ছে তিরশ্চান বিদ্যা (তিরচ্ছান বিজ্জা) বা অপরা বিদ্যা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা। এর বিপরীত হচ্ছে পরা বিদ্যা বা প্রকৃষ্ট বিদ্যা। এই বিদ্যাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহায়ক বা নির্বাণ মার্গদেশক। বিহারের আবাসিক শিক্ষার্থীরাই আচার্যের নিকট এই বিদ্যা লাভ করত। অপরা বিদ্যা শিখত সাধারণত গৃহস্থ শিক্ষার্থীরা জীবিকার প্রয়োজনে। তারা অনেকেই চায় জীবনে আরাম। সে জন্য সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করার নিমিত্ত এরকম বিদ্যা উৎসাহের সহিত শিখত। কিছু কিছু শিক্ষার্থীরাও ধর্ম এবং ধর্মাচার বিষয়েও জ্ঞানলাভ করত। এখানে বলা আবশ্যক যে, অপরা বিদ্যা সঙ্ঘভুক্ত শিক্ষার্থীকে শেখান হত না। তবে আচাযরা মাঝে মাঝে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন। পালি চুল্লবগ্‌গ পাঠে জানা যায় দক্ষ আচার্যরাই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতেন। সমপর্যায়ভুক্ত বিষয়ের আচার্যদের বিহারের বসবার স্থান খুব কাছাকাছি থাকত এবং বিভিন্ন বিষয়ের আচার্যদের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট ছিল। গৃহস্থ শিক্ষার্থীদের নাম ও ঠিকানা বিহারের দপ্তরে লিখে রাখা হত। কারণ সঙ্ঘের নিয়মানুসারে পরিদর্শক ভিক্ষুকের বিহারে প্রথম প্রবেশের সময় গৃহস্থ শিক্ষার্থীর বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে হত।

বৌদ্ধ বিহার মাত্রই এক একটি আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ভিক্ষুদের নির্জনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে প্রথমে ঐগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ তাদের রূপ বদলাল। পরিবর্তিত হল শিক্ষা-কেন্দ্রে। আবার পরবর্তী কালে দেখা গেল গড়ে উঠল বিরাট বিরাট বিদ্যা-নিকেতন। সেখানে দেশ বিদেশের শিক্ষার্থীরা আসত বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানাহরণের জন্য। এ ছাড়া দূর দূরান্ত হতে আসতেন মহা মহা পণ্ডিত তাঁদের ধর্মবিষয়ক সন্দেহ নিরসন করতে। বিদ্যানিকেতনের ছিল অবারিত দ্বার। প্রবেশের নিয়মে ছিল না কোন কঠোরতা। চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে জানা যায় এসব বিদ্যানিকেতনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুদেরই একমাত্র প্রবেশের অধিকার ছিল না। এখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরও—এমন কি সাধারণ জ্ঞান পিপাসুরও প্রবেশের সমান অধিকার ছিল। সকল শিক্ষার্থীকে সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হত। গৃহী শিক্ষার্থীকে বলা হত মানবক বা সাধারণ

শিক্ষার্থী। আর অন্যান্য গৃহত্যাগী বিদ্যার্থীদের আখ্যা ছিল ব্রহ্মচারী। সব বিদ্যানিকেতনেই শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে পড়তে পেত। এ ছাড়া আহার ও বাসস্থানের জন্যে তাদের টাকা পয়সা দিতে হত না। সব কিছুই তারা পেত বিনা খরচায়। ধর্মপ্রবণতা, উদারতা ও দানশীলতা সাধারণত ভারতবাসীর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। সৎকাজে দান সকলেরই মতে পুণ্য কাজ। সে যুগের লোকেদের এসব গুণের পরিচয় ইতিবৃত্তে ভুরি ভুরি মেলে। এ বিদ্যানিকেতনগুলোর ব্যয়ভার বহন করতেন রাজারা, ধনী ও বদান্য ব্যক্তিগণ। তাঁরা বহু অর্থ ও ধনসম্পত্তি দান করতেন এ সবের জন্য। অনেক সময় রাজারা এক বা একাধিক গ্রামের সমগ্র রাজস্ব এগুলির ব্যয়ের জন্য সমর্পণ করতেন। কোন দিক দিয়ে এ জন্য পঠন ও পাঠনের কোন অসুবিধা হত না। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত ধর্মচর্চা, ধর্মালাপ ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষাদান। সে যুগের বিদ্যানিকেতনগুলোর মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এখানে ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন জায়গার প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। এক শত আচার্য শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিশাল বিশাল অট্টালিকাতে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন ও বাসের ব্যবস্থা ছিল। চৈনিক পর্যটক য়ুয়েন-সাং নিজে এই বিদ্যানিকেতনে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক বাঙ্গালী শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যরা তাঁদের চরিত্রবলে ও পাণ্ডিত্যে দেশের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। এ ছাড়াও সে যুগের আরও অনেক বিদ্যায়তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে বল্লভী, বিক্রমশীলা, জগদ্দল ও ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের ভগ্নাবশেষ মাত্রই এখন তাদের স্মৃতি বহন করছে ও গৌরবময় মহান ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দশম অধ্যায়

বৌদ্ধ তীর্থ

ভারতবর্ষ তীর্থের দেশ। প্রাচীনকাল হতেই তীর্থদর্শন পুণ্যার্জনের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধরাও এ ধারণা ত্যাগ করতে পাবেন নি। পালি দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বানসুত্তে বুদ্ধদেব তাঁর পরিনির্বাণের পূর্বে ভিক্ষুদের বলেছেন—চত্তারিমানি সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীয়ানি সংবেজনীয়ানি ঠানানি। ইধ তথাগতো জাতো' তি, ইধ তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধো' তি, ইধ তথাগতো অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং' তি , ইধ তথাগতো অনুপাদিসেসায় নিব্বানধাতুয়া পরিনিব্বুতো' তি—শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রের জন্য চারটি দর্শনীয় সংবেগোৎপাদক স্থান আছে। এ স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছেন। এ স্থানে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন। এ স্থানে তথাগত কর্তৃক অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে এবং এ স্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন। এই চারটি স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিদর্শন করা উচিত। এতে তাঁদের শ্রদ্ধা ও ধর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। স্থানগুলি হচ্ছে—লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর। এ ছাড়াও বৌদ্ধ গ্রন্থ হতে আরও চারিটি স্থানের কথা জানা যায়। যথা :—শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী ও সাংকাশ্য। এগুলিও বুদ্ধের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের সহিত বিজড়িত থাকায় দর্শনীয় স্থান বলে পরিচিত হয়েছে। পালি শাস্ত্রে এগুলিকে অট্‌ঠমহাট্‌ঠান (অষ্ট মহাস্থান) বলা হয়। এই আটটি স্থান ছাড়াও সাঁচি, অজন্তা, তক্ষশীলা এবং নালন্দা সম্বন্ধেও এখানে মোটামোটি কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে প্রথম দু'টি স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন এবং শেষের দুটি এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র বলে বৌদ্ধ জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। আজও এগুলির ভগ্নাবশেষ মানুষকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। এসব স্থানই বৌদ্ধ তীর্থ বলে আজ বিশ্বের সকলের নিকট পরিচিত। এখানে এ স্থানগুলির একটু বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :—

লুম্বিনী—লুম্বিনী আধুনিক ভারত নেপাল সীমান্তে নেপালের তরাই অঞ্চলে রুম্মিনদেই নামক স্থানে অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার

নাওগর রেল ষ্টেশন থেকে রুম্মিনদেই পর্যন্ত বাস চলাচলযোগ্য রাস্তা আছে এবং সরকারী বাসের ব্যবস্থাও আছে। যাত্রীদের জন্য আছে অথিতিশালা। লুম্বিনী চারটি মহাপুণ্যস্থানের অন্যতম। এখানে ভগবান বুদ্ধ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভূমিষ্ঠ হন। এ স্থানটি ছিল শাক্যগণরাজ্যের অধীনে। শাক্যদের রাজধানী ছিল কপিলবাস্তু। কপিলবাস্তু বর্তমান রুম্মিনদেই হতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

কথিত আছে বুদ্ধের মাতা মহামায়ার কপিলবাস্তু হতে দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম হয় সিদ্ধার্থ গৌতমের। সম্রাট অশোক বুদ্ধেব এ পুণ্য জন্মভূমি দর্শন করেন এবং এ স্মৃতি রক্ষার জন্য লুম্বিনী উদ্যানে নির্মাণ করেন একটি স্তম্ভ। এ স্তম্ভে খোদাই আছে সম্রাট অশোকের অনুশাসনলিপি। তা হতে জানা যায় অশোক তাঁর রাজত্বের বিশ বছরের সময়ে স্থানটি পরিদর্শনে আসেন ও পূজা করেন। আরও জানা যায় যেহেতু বুদ্ধ এখানে জন্মগ্রহণ করেন সেজন্য এ লুম্বিনী গ্রামকে তিনি করমুক্ত করে দেন। গ্রামবাসীদের উৎপাদিত শস্যের অষ্টমাংশ মাত্র রাজস্ব দিতে হত। এ স্তম্ভ লিপির জন্যই বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনী সহজে সনাক্ত হয়েছে।

বুদ্ধগয়া—বুদ্ধগয়া বিহাব প্রদেশের অন্তর্গত বর্তমান গয়া শহর হতে প্রায় সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত যানবাহন উপযোগী প্রশস্ত রাস্তা আছে। রাস্তাটি চলে গিয়েছে নৈরঞ্জনা (বর্তমান ফল্গু) নদীর ধারে ধারে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাওয়া যায় সরকারী বাস, এক্কা, টম-টম ও রিক্সা। যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যও আছে ধর্মশালা, বাংলো ও সরকারী অথিতিশালা।

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের পুণ্যস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখানেই শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বৈশাখী পূর্ণিমাতে সম্বোধি জ্ঞান লাভ করে জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। তাই দেশ-বিদেশ হতে পুণ্যার্থীরা শ্রদ্ধা জানাতে আসেন এ মহাতীর্থে। প্রাচীনকালে বুদ্ধগয়ার অপর নাম ছিল উরুবেল। এটি নৈরঞ্জনা সৈকতে অবস্থিত। আজও এ নৈরঞ্জনা ফল্গু নামে অন্তঃসলিলা অবস্থায় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বুদ্ধগয়ার প্রধান আকর্ষণীয় দৃশ্য হল বিশাল সু-উচ্চ চৌকোণা বুদ্ধ মন্দির এবং নিকটস্থ বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসন। বোধিবৃক্ষ এক ঐতিহাসিক বৃক্ষ। এর নীচে

বসেই শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ সসৈন্য মারকে পরাজিত করে সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেন। সেজন্য বোধিবৃক্ষের অপর নাম মহাবোধি বা সম্বোধি বৃক্ষ। ললিত-বিস্তর গ্রন্থে বর্ণনা আছে এ বৃক্ষে বাস করতেন বেণু, ভল্লু, সুমন ও ওজপতি প্রভৃতি দেবতাগণ। অশোকের শিলালেখ হতে জানা যায় তিনি মহামাত্রগণ সহ তাঁর রাজত্বের দশম বছরে ভগবান বুদ্ধের সম্বোধিস্থান দর্শন করেন এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণদের দান দেন।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সাঁচীর তোরণগাত্রে খোদিত অশোকের মহাবোধি দর্শনের চিত্র হতে সহজে প্রমাণ করা যায় সম্রাট অশোক নিজে বুদ্ধগয়ায় শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। পালি সমন্তপাসাদিকাতে উল্লেখ আছে এ বোধিবৃক্ষের একটি শাখা সম্রাট অশোক আপন কন্যা সংঘমিত্রাকে দিয়ে সিংহলরাজ দেবানং প্রিয়তিষ্যের নিকট পাঠান। এটিই সিংহল দেশের প্রথম বোধিবৃক্ষ এবং এটি অনুরাধপুরে রোপণ করা হয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙ ভারত পর্যটনকালে বোধিবৃক্ষ বজ্রাসনের নিকটে দেখেন বলে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন। আজও বোধিবৃক্ষ ঐ স্থানে দেখা যায়। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় এর উচ্চতা ছিল শতাধিক ফুট। এখন এর উচ্চতা মাত্র ৪০।৫০ ফুট। প্রাচীনকাল হতে এ বোধিবৃক্ষ আপন বংশ অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করেছে।

বোধিবৃক্ষের সংলগ্ন পূর্ব দিকে অবস্থিত বিশাল সু-উচ্চ চৌকোণা মন্দির। মন্দিরের মধ্যে দেখা যায় ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বিরাট বুদ্ধমূর্তি। হিউয়েন-সাঙ এ মন্দিরটিকে মহাবোধি বিহার বলে উল্লেখ করেছেন এবং মন্দিরের চারপাশের স্থানের মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন। মন্দিরটি ১৮০ ফুট উচ্চ ছিল। বুদ্ধগয়া মন্দিরের চারিদিকে অর্ধভগ্ন রেলিং-এর উপর খোদিত অবস্থায় দেখা যায় বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন। এসব শিল্প ও স্থাপত্য খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। তাঁরা আরও মনে করেন বুদ্ধগয়ার রেলিং-এ খোদিত চিত্রশিল্পগুলি শিল্পনৈপুণ্যের দিক হতে বিচার করলে এগুলি ভার্হুত ও সাঁচীর তোরণগাত্রে খোদিত চিত্রশিল্পের তুলনায় পরবর্তী। বুদ্ধ-গয়ার মহাবোধি মন্দিরের মত এরূপ বিশাল সু-উচ্চ মন্দির উত্তর ভারতে আর দেখা যায় না।

মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে বোধিবৃক্ষের নীচে হল বজ্রাসন। এ বজ্রাসন

অখণ্ড পাথরে নির্মিত। হিউয়েন-সাঙ-এর মতে এ আসনে বসে বহু বুদ্ধ বজ্রসমাধি লাভ করেছিলেন বলে এর নাম বজ্রাসন। এর উপর বসে বুদ্ধ সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেন বলে এটিকে আবার বোধিমণ্ডপ বা বোধিপল্লঙ্কও বলা হয়। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ কানিংহাম বজ্রাসনের বারটি তল আবিষ্কার করেন।

মন্দিরের চারিপাশে আবার কতকগুলি চৈত্যও আছে। এখানে কয়েকটির একটু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে :—

অনিমেষ চৈত্য—এখানে বুদ্ধ সপ্তাহ কাল অবস্থান করেন। সম্বোধি লাভের পর এ স্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের জন্য বোধি বৃক্ষের নীচে অবস্থিত বজ্রাসনের দিকে কৃতজ্ঞতা ভরে স্থির নেত্রে তাকান। তাই এর নাম হয়েছে অনিমেষ চৈত্য। এখনও তা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চঙ্‌ক্রমণ চৈত্য—এখানেও বুদ্ধ সপ্তাহ কাল কাটান। মহাবোধি মন্দিরের উত্তর পাশে তিন ফুট অনুচ্চ স্তম্ভগুলি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি বুদ্ধের চঙ্‌ক্রমণ স্থানেব স্মৃতি বহন করে।

রত্নগৃহ চৈত্য—এখানেও তিনি সপ্তাহ কাল ধবে ধ্যানাসনে বসে অভিধর্মের বিষয় চিন্তা করেন। মহাবোধি মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে ছোট অর্ধ ভগ্ন মন্দিরটি এখনও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অজপাল নিগ্রোধ চৈত্য—এখানে বুদ্ধ সাত দিন অবস্থান করেন ও হুহুঙ্ক নামক ব্রাহ্মণকে ধর্মদেশনা দেন। পুরাতত্ত্ব গবেষকগণ এস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে এখনও পাবেন নি। হিউয়েন-সাঙ এ স্থানটি বোধি বৃক্ষের দক্ষিণ-পূর্বে বট বৃক্ষের নীচে বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি একটি স্তূপ ও বুদ্ধমূর্তি দেখেন।

রাজায়তন চৈত্য—এখানে বুদ্ধ সাত দিন কাটান। এখানে আবার উৎকল (উড়িষ্যা) দেশ হতে আগত ত্রপুষ ও ভল্লুক নামক দু'জন বণিক ভগবানের নিকট বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ নিয়ে জগতে প্রথম দ্বিবাচিক উপাসক হন। হিউয়েন-সাঙ এখানেও স্তূপ দেখতে পান।

মুচলিন্দ চৈত্য—এখানে ভগবান সাতদিন অবস্থান করেন। এটি মুচলিন্দ হ্রদের তীরে অবস্থিত। কথিত আছে মুচলিন্দ নামক এক নাগরাজ বুদ্ধের মাথার উপর ফণা বিস্তার করে ঝড় বৃষ্টি হতে তাঁকে রক্ষা করেন। হিউয়েন-সাঙও মুচলিন্দ হ্রদের কথা বলেছেন। হ্রদটির জল ছিল ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ। মহাবোধি হতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে মুচলিন্দ নামক এখনও একটি গ্রাম আছে। এখানে এখনও একটি পুকুর আছে। ঐতিহাসিকদের মতে এটিই মুচলিন্দ হ্রদ। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান করেন। এর অপর নাম বোধিকুণ্ড।

মহাবোধি মন্দিরের অনতিদূরে একটি সংগ্রহশালা বা যাদুঘর আছে। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলি এখানে সংগৃহীত রয়েছে।

সারনাথ—সারনাথ উত্তরপ্রদেশের বারাণসী হতে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। বারাণসী হতে সারনাথ পর্যন্ত যানবাহন যোগ্য প্রশস্ত রাস্তা আছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাওয়া যায় মোটর, রিক্সা, এক্কা, টেক্সি ও টাঙা। এ ছাড়া সারনাথ তীর্থের নিকটেও আছে একটি সুন্দর রেলওয়ে স্টেশন। তীর্থযাত্রীদের জন্য রয়েছে ধর্মশালা ও সরকারী অতিথিশালা।

সারনাথও বৌদ্ধদের চার মহাপুণ্যস্থানের অন্যতম। বুদ্ধগয়ায় সম্বোধি লাভের পর ভগবান বুদ্ধ এখানেই প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেন পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে। তাঁর এ বাণী ধর্মপ্রবর্তনসূত্র নামে খ্যাত। তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও ভোগবিলাসপূর্ণ হীন জীবন—উভয়ই ত্যাগ করে প্রচার করেন মধ্যম মার্গ। এটিই হচ্ছে আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ।

সারনাথ নামটি এ স্থানের প্রাচীন নাম নহে। ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় এ স্থান ঋষিপত্তন মৃগদাব নামে খ্যাত ছিল। ললিতবিস্তরে উল্লেখ আছে পরিনির্বাপিত পাঁচ শত প্রত্যেকবুদ্ধের বা ঋষির পূতদেহ এখানে পড়েছিল বলে এ স্থানের নাম হয় ঋষিপত্তন (ইসিপতন)। মৃগদাব নামের সংগেও বৌদ্ধসাহিত্যে এক কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে বোধিসত্ত্ব নিগ্রোধ মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করে মৃগদের দলপতি হয়ে এ স্থানে বাস করতেন। বারাণসীরাজের অনুচরেরা মৃগ শিকার করত তাদের খুশিমত। বোধিসত্ত্ব নিগ্রোধমৃগ রাজাকে হত্যাজনিত পাপের ফল বিবৃত করে তাঁকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত করেন। সেজন্য এ স্থানের নাম হয়েছে মৃগদাব। জাতক ও ললিতবিস্তর হতে আরও জানা যায় মৃগরা রাজার অভয় বাণীর আশ্বাস পেয়ে আনন্দে যথেচ্ছ বিচরণ করত বলে এর নাম মৃগদাব হয়। মধ্য-যুগের শিলালেখ সমূহে এ স্থানকে ধর্মচক্র বা সদ্ধর্মচক্রপ্রবর্তন বিহার নামে

উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান সারনাথ নামটি সারঙ্গনাথ হতে হয়েছে বলে ও অনুমান করা হয়। এখানেই বুদ্ধ বারাণসীর শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও তার চুয়ান্ন জন বন্ধুকে ভিক্ষুত্ব প্রদান করেন। এ পঞ্চান্ন জন ও তাঁর পূর্ব পরিচিত পাঁচ জন শিষ্য মিলে মোট ষাট জন ভিক্ষু নিয়ে ভগবান প্রথম সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। জগতের ধর্মের ইতিহাসে এটিই প্রথম বিধিবদ্ধ সংঘ। তিনি এ ষাট জন ভিক্ষুকেই পাঠান বিভিন্ন দিকে ধর্ম প্রচারের জন্য।

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণেব দু'শ বছর পরে মৌয সম্রাট অশোক সারনাথে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন। এসব স্মৃতিস্তম্ভগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধর্মরাজিক স্তূপ, ধামেক স্তূপ, চতুর্মুখসিংহযুক্ত অশোক স্তম্ভ। এখানে এদের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মরাজিক স্তূপ—এ স্তূপটি নির্মাণ করেন সম্রাট অশোক। এর মধ্যে রক্ষিত হয় ভগবান বুদ্ধের পূতাস্থি। এখানে পূতাস্থির প্রস্তর নির্মিত আধারটি কেবল পাওয়া গেছে।

ধামেক স্তূপ—এটিও সম্রাট অশোকের নির্মিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। খননের সময়ে স্তূপটি হতে "**যে ধর্মা হেতুপ্রভবা**..." খোদিত একটি প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গেছে। তা হতে বলা যায় এ স্তূপটি ভগবান বুদ্ধের ধর্মের স্মৃতির স্মারক হিসাবে নির্মাণ করা হয়। এব মূল অংশ অশোকের সময়ে নির্মিত হলেও গুপ্তযুগে এটি বর্তমান আকার ধারণ করে। এর নিকটেই বুদ্ধ তার প্রথম বাণী প্রচার কবেন পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে।

চতুর্মুখসিংহযুক্ত অশোক স্তম্ভ—এটি এস্থানের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ চতুর্মুখসিংহের উপর ছিল ধর্মচক্র। ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্রের স্মারক চিহ্নস্বরূপ সম্রাট অশোক এ বিশেষ রকমের চতুর্মুখসিংহ মূর্তির উপরি ধর্মচক্র স্থাপন করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর এ অশোক চক্রই শান্তি ও ন্যায় ধর্মের প্রতীকরূপে আমাদের জাতীয় পতাকায় স্থান লাভ করেছে। সিংহযুক্ত স্তম্ভের উপরে রক্ষিত ধর্মচক্র ভগবান বুদ্ধের ধর্মের মহিমা প্রচার করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙও এ সিংহের উপর ধর্মচক্রযুক্ত অশোক স্তম্ভের কথা তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া আরও এখানে দেখবার আছে। এগুলির মধ্যে চৌখণ্ডি স্তূপটি দর্শকদের প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি একটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট প্রাচীন

চৈত্য। কথিত আছে গয়া হতে সারনাথ যাওয়ার পথে এখানেই বুদ্ধের সংগে দেখা হয় তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের।

সারনাথে আবার পাওয়া গেছে অশোকের একটি অনুশাসনলিপি। সংঘের ঐক্য রক্ষার জন্য সংঘভেদকারী ভিক্ষুদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে এ অনুশাসনলিপি লেখা হয়।

সারনাথে স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপ খনন কার্যের ফলে মৌর্য যুগের ধর্মরাজিক স্তূপ, ধামেক স্তূপ ও অশোক স্তম্ভ ছাড়া কুষাণ ও গুপ্তযুগের নির্মিত অনেক বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া এখানে সংগৃহীত ভাস্কর্যের ও শিল্পের মধ্যে কুষাণ ও গুপ্তযুগের ছাপ স্পষ্টভাবে রয়েছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত ধর্মচক্রমুদ্রাযুক্ত উপবিষ্ট এক বুদ্ধমূর্তি এখানে পাওয়া গেছে—এটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মূর্তিটির ধর্মচক্রমুদ্রার দ্বারা বুদ্ধের ধর্মপ্রচার স্থানকে সনাক্ত করছে।

এন-মুন্-সিং নামক একজন সিংহল দেশীয় দাতার বদান্যতায় ১৯৩১ সালে নির্মিত হয়েছে সু-উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মুলগন্ধকুটি বিহার। এর মধ্যে আছে ধর্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট এক বড বুদ্ধমূর্তি।

মৃগদাব নামের সার্থকতার জন্য ২,৫০০তম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সরকার দশ একর জমি লোহার তার দিয়ে ঘিরে বিভিন্ন রকমের অনেক হরিণ পোষার ব্যবস্থা করেছেন। এটি দর্শকদের যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে তেমনি আনন্দও দেয়।

সারনাথে একটি বিরাট সংগ্রহশালা আছে। প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ও চৈত্য সমূহ খননের ফলে যে সমস্ত মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ এখানে পাওয়া গেছে তা রক্ষিত হয়েছে এ সংগ্রহশালায়।

কুশীনগর—কুশীনগর উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার বর্তমান কসিয়া নামক স্থানে অবস্থিত। দেউরিয়া সদর এবং গোরখপুর রেলপথের সংগে কুশীনগরের মোটর চলাচল যোগ্য প্রশস্ত রাস্তা আছে। সেখানে যাত্রীদের জন্য আছে অতিথিশালা।

কুশীনগর বৌদ্ধদের মহাপুণ্যস্থানের অন্যতম। এ স্থান ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ তীর্থ। এখানে ভগবান বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মল্লদের শালবনে জোড়া শাল গাছের নীচে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ভগবান

বুদ্ধের সময়ে কুশীনগর মল্লগণরাজ্যের অধীন ছিল। বুদ্ধ মল্লদের পাবা ও কুশীনগরে যান। কুশীনগরের অনতিদূরে পাবানগর। ইহা বর্তমানে পেভরিয়া নামে পরিচিত। কুশীনগর বুদ্ধের সময়ে এত উল্লেখযোগ্য নগর ছিল না। ভগবান কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর শিষ্য আনন্দ বলেন,—"দেব, কুশীনগর ক্ষুদ্র শাখা নগর। আপনি চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশম্বী ও বারাণসী—এ সব প্রধান নগরের যে কোন স্থানে পরিনির্বাণ লাভ করুন।" এর উত্তরে ভগবান আনন্দকে কুশীনগরের প্রশংসা করে বলেন,—"আনন্দ, কুশীনগর ক্ষুদ্র শাখানগর হলেও এটি একদিন রাজা মহাস্থদর্শনের রাজধানী ছিল। এ কুশীনারা (কুশাবতী) সমৃদ্ধ, জনবহুল ও স্থভিক্ষ ছিল।"

ভগবান মহাপরিনির্বাণ লাভ করলে আট জন মল্লপ্রধান তাঁদের মন্ত্রণা সভায় ভগবানের পুতদেহ সৎকারের বিষয় আলোচনা করেন ও সমারোহপূর্ণ শবদাহের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা তাঁদের মকুটবন্ধচৈত্যে ভগবানের দেহ সৎকার করেন। ইহা বর্তমান রামাভাড নামে পরিচিত। এখানে একটি বৃহৎ স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কুশীনগরে মল্লদের সন্থাগার বা মন্ত্রণালয় ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি এখানে আলোচিত হত। এ ছাড়া জরুরী বিষয়েরও আলোচনা করা হত। এ কুশীনগর হিরণ্যবতী নদীর তীরে অবস্থিত। এটি বর্তমানে ছোট গণ্ডক নামে খ্যাত।

বেশ কিছুদিন কুশীনগর সম্বন্ধে তেমন কিছু শুনা যায় নি। এর গৌরব বেশ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু মৌর্যযুগে তার লুপ্তগৌরব ফিরে পেল। সম্রাট অশোক এ স্থান পরিদর্শন করে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের স্মৃতিস্বরূপ স্থাপন করেন স্তূপ ও স্তম্ভাদি। পরিব্রাজক ফা-হিয়ান কুশীনগরে লোকবসতি বিশেষ দেখেন নি বলে লিখে গেছেন। কিন্তু স্তূপ ও স্তম্ভাদির কথা উল্লেখ করেছেন। হুয়েন-সাঙও এখানে আসেন। তিনিও তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে স্তূপ ও স্তম্ভের কথা বলেছেন।

গুপ্তযুগে কুশীনগরের খ্যাতি আরও বেড়ে যায়। কুমারগুপ্তের রাজত্বের সময়ে হরিবল নামক একজন বৌদ্ধ দাতা দীর্ঘ বাইশ হাত লম্বা শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি এখানে স্থাপন করেন। এ বৃহৎ পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত বুদ্ধমূর্তি এখনও পরিনির্বাণচৈত্যে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পাশে একটি বড় স্তূপও

আছে। এর মধ্যে 'পরিনির্বাণচৈত্যতাম্রপট' নামক একটি তামার পাত পাওয়া গেছে। এতে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কুশীনগর সনাক্তকরণ সহজ হয়েছে।

এখানে মাথাকাউর নামক আরও একটি মন্দির দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালচুরি বংশের রাজত্বের সময়ে নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি এখানে দেখা যায়।

শ্রাবস্তী—শ্রাবস্তী উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা ও বহরাক জেলার অন্তবর্তী অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে তা সাহেত-মাহেত নামে খ্যাত। এটি বৌদ্ধদের প্রাধান তীর্থস্থানের অন্যতম। এখানে তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য ধর্মশালাদির ব্যবস্থা আছে। এ স্থানের সংগে রেলপথের সংযোগও সহজ।

ভগবান বুদ্ধের জীবনের সংগে শ্রাবস্তীর নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এখানে বুদ্ধ জীবদ্দশায় পঁচিশটি বর্ষাবাস যাপন করেন। শ্রাবস্তী ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম কোশল জনপদের প্রধান নগর ছিল। বুদ্ধের সময়ে কোশলের রাজা ছিলেন প্রসেনজিত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অযোধ্যার খ্যাতি নিস্প্রভ হলে শ্রাবস্তী কোশল রাজ্যের প্রধান নগররূপে পরিণত হয়। তখন এর বিশেষ গুরত্ব দেখা যায়।

শ্রাবস্তীতে জেতবন, পুর্বারাম এবং রাজকারাম নামক তিনটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ছিল। এ ক'টি প্রধান বিহারের মধ্যে জেতবন ছিল খুব সুন্দর ও মনোরম। বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতম শারিপুত্র জেতবন বিহার নির্মাণের জন্য এ স্থানটি মনোনয়ন করেন। এটি ছিল রাজকুমার জেতের প্রমোদ উদ্যান। বুদ্ধের প্রধান গৃহী শিষ্যদের অন্যতম অনাথপিণ্ডদ ভগবান বুদ্ধ ও শিষ্যদের বাসের জন্য বিহার নির্মাণের উদ্দেশ্যে জেত রাজকুমারের এ উদ্যান কিনতে ইচ্ছুক হলে কুমার জেত এ জমির খুব চড়া দাম চাইলেন। তিনি বলেন, সোনার মোহরে এ জমি ঢেকে দিতে পারলে তা বিক্রি করবেন, নতুবা বিক্রি করবেন না। বুদ্ধভক্ত অনাথপিণ্ডদ তা সত্ত্বেও জমি কিনতে রাজী হলেন। গাড়ী গাড়ী সোনার মোহর এনে উদ্যানটি ভরে দিলেন। জমির বিস্তার পরিমাণ সোনার মোহর দিয়ে কিনলেন অনাথপিণ্ডদ ভগবান বুদ্ধের জন্য এ উদ্যানটি। জেতবন বিহারটি ছিল খুব বড়। এর মধ্যে ছিল ভিক্ষুদের শয়নঘর, গুহা, প্রার্থনাকক্ষ, অগ্নিশালা, জিনিষপত্র রাখবার ঘর, পায়খানা, প্রস্রাবঘর, ধ্যানযোগ্য নির্জন কক্ষ, চঙ্ক্রমণ করবার নির্দিষ্ট স্থান, কুপ,

স্নানঘর, পুকুর এবং আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি ছিল। তিব্বতী গ্রন্থ হতে জানা যায় জেতবন বিহারে ষাটটি বড় হলঘর এবং ষাটটি ছোট কক্ষযুক্ত ঘর ছিল। জেতবন বিহারের তোরণটি তৈয়ারী করান রাজকুমার জেত। সমগ্র জেতবন বিহারের নির্মাণ কার্য শেষ করে পাত্রে জল ঢেলে এ বৃহৎ বিহারটি অনাথপিণ্ডদ দান করেন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে। জেতবন পরিবেণে অবস্থিত বিশেষ বিশেষ কয়েকটি আবাসের নাম; যেমন—মহাগন্ধকুটি, করোরিমণ্ডলমালা, কৌশাম্বিকুটি, চন্দনমালা, সললঘর। এ বিহারের প্রাকারের ভিতরে ছিল একটি বড় পুকুর। এখানে গাছ, লতা গুল্মাদি এত বেশী ছিল যে, জেতবন বিহারটি দূর হতে অরণ্যের মত দেখাত। এখানে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকদ্বয় শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের পুতাস্থি রক্ষা করা হয়। সম্রাট অশোক পরে তা অন্য স্থানে পুন প্রতিষ্ঠা করেন।

জেতবনের পরে উল্লেখযোগ্য বিহার হল বুদ্ধের নারী ভক্তগণের প্রধানা বিশাখা নির্মিত পূর্বারাম। এটা মিগারমাতা প্রাসাদ নামেও খ্যাত। বিশাখা ছিলেন সাকেত নামক স্থানের শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের পরমা সুন্দরী কন্যা। পরে শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী মিগার বিশাখাকে আপন ঘরে আনেন পুত্রবধূরূপে। বিশাখার প্রভাবে মিগার জৈনধর্ম ত্যাগ করে বুদ্ধের ভক্ত হন। বিশাখাও দাতা অনাথপিণ্ডদের মত বিশাল সম্পত্তি ও প্রচুর অর্থের মালিক ছিলেন। একদিন বিশাখা জেতবনে ধর্মকথা শুনতে গিয়ে তাঁর গলার সোনার হারটি ভুলে ফেলে আসেন। বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ তা পেয়ে সযত্নে রাখেন। পরের দিন আনন্দ বিশাখাকে হারটি ফেরত দিতে আসেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর এ উদার মনোভাব বিশাখার মনে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। সংগে সংগে তিনি সংকল্প করেন এ হারের মূল্যের টাকা দিয়ে ভিক্ষুদের জন্য তৈরী করবেন একটি সুন্দর বিহার। কিন্তু বিশাখার, এ মহামূল্যবান হারটি কেউ কিনতে সমর্থ হল না। বিশাখা নিজেই উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনলেন নিজের হার। এ অর্থের বিনিময়ে তৈরী করালেন বিরাট বিহার। এটিই মিগারমাতা প্রাসাদ নামে খ্যাত। বিহারটি ছিল দ্বিতল। এর মধ্যে ছিল অসংখ্য কক্ষ। বিহারটি খুবই সুন্দর। এর কারুকার্য এত মনোরম ছিল যে ভিক্ষুরা এর মধ্যে বাস করতে সংশয় বোধ করতেন। এ বিহারটি নির্মাণের নমুনা দিয়েছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতম মৌদ্‌গল্যায়ন।

জেতবনের তৃতীয় প্রধান বিহারটি হল রাজকারাম। এ বিহারটি তৈরী করেন কোশলরাজ প্রসেনজিত। প্রসেনজিতের অগ্র মহিষী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে একটি সুন্দর অথিতিশালা নির্মাণ করা হয়। এটি মল্লিকারাম নামে খ্যাত। এখানে ধর্মালোচনা ও ধর্মদেশনাদি হত।

শ্রাবস্তীর অদূরে ছিল সাকেত। এখানে ছিল গভীর ঘন বন। এটি অঞ্জন বন নামে খ্যাত। এখানে রাজা প্রসেনজিত শিকার করতেন। বুদ্ধ শিষ্য গবম্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে এখানে অর্হত্ব লাভ করেন।

সম্রাট অশোক জেতবন বিহারের তোরণের দক্ষিণ ধারে সত্তর ফুট উচ্চ দু'টি স্তম্ভ নির্মাণ করান। একটির উপর ছিল চক্র, অপরটিতে ছিল ষাঁড়। অশোক এখানে শারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, মহাকাশ্যপ এবং আনন্দের স্তূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অশোকের যুগে শ্রাবস্তীর ভোগ সম্পদের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

কুষাণ যুগে জেতবন আবার সংস্কার করা হয়। সে সময়ে অশোক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি স্থাপন করান। গুপ্তযুগে এ আরাম আরও উন্নতি লাভ করে। এখানে আরও অনেক নতুন নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়। হিউয়েন-সাঙ ও ফা-হিয়ান এখানে আসেন। পরবর্তী আমলে শ্রাবস্তী ও জেতবনে অনেক মহাযান বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীও স্থাপন করা হয়। তাঁদের মধ্যে লোকনাথ, ত্রৈলোক্যবিজয়, অবলোকিতেশ্বর, সিংহনাদলোকেশ্বর এবং জম্বলই প্রধান।

বারোশ শতাব্দীতে গাড়হবালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাণী কুমারদেবী এ জেতবন বিহারের সংস্কার করেন এবং আর ও নতুন বিহার নির্মাণ করেন।

রাজগৃহ—বিহার প্রদেশের পাটনা জিলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিহার-সরিফ হতে তের মাইল দূরে রাজগৃহ (বর্তমান রাজগির) অবস্থিত। বক্তিয়ারপুর হতে রাজগৃহ পর্যন্ত রেলপথের সংযোগও আছে। এটি গিয়েছে প্রশস্ত সরকারী রাস্তার ধারে ধারে। রাজগির বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থানের অন্যতম। গৌতম বুদ্ধ এখানে অনেক বর্ষাবাস যাপন করেন। রাজগৃহ আবার জৈনদেরও তীর্থস্থান। এখানে যাত্রীদের জন্য ধর্মশালা আছে এবং রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে আছে বাংলো।

প্রাচীনকাল হতে রাজগৃহের অনেক নাম পাওয়া যায়। যথা—বসুমতী,

বার্হদ্রতপুর, গিরিব্রজ, কুশাগ্রপুর এবং রাজগৃহ। রাজগৃহ পাহাড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ পাহাড়গুলি হল—বৈভাব, বিপুল, রত্ন, ছট্টাশৈল, উদয় ও সোনা। পালি সাহিত্যে এগুলিকে বেভার, পাণ্ডব, বিপুল, গিজ্ঝকুট এবং ইসিগিলি নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজগৃহ মগধরাজ বিম্বিসারের রাজধানী। বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের সমবয়সী ও তাঁর পরম ভক্ত। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য অনেক কাজ করেন এবং তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য বেণুবন দান করেন। পরে এর নাম হয় বেণুবন বিহার। রাজগৃহের কলন্দকানিবাপ নামক স্থানের দক্ষিণ দিকে বেণুবন অবস্থিত। হিউয়েন-সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এর উল্লেখ আছে। এটির অনতিদূরে দেখা যায় তপোদা। এটি হল একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান করে। বিশ্বাস যে এ প্রস্রবণের জল বাত, চর্মরোগ প্রভৃতির বিশেষ হিতকর। মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু প্রথমে বুদ্ধের প্রতি বৈরভাবাপন্ন থাকলেও পরে বুদ্ধের পরম ভক্ত হন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনতিকাল পরে স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধের বাণী সংকলনের জন্য রাজগৃহের বৈভার পাহাড়ের নীচে সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হয়। হিউয়েন-সাঙও এ গুহা দেখতে পান। এ গুহার সম্মুখভাগের ছাদ ১২০ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৪ ফুট প্রস্থ। বৈভার পর্বতের পূর্ব ধারে একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড আছে। এটি বর্তমানে 'জরাসন্ধ-কি-বৈঠক' নামে খ্যাত। একে পিপ্পলি গুহাও বলা হয়। এখানে বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপ বাস করতেন। একদা মহাকাশ্যপ অসুস্থ হয়ে পড়লে বুদ্ধ তাঁকে দেখবার জন্য এখানে আসেন। রাজগৃহে আছে বিম্বিসারের কারাগৃহ। কথিত আছে আপন পুত্র অজাতশত্রু রাজা বিম্বিসারকে এ কারাগৃহে বন্দী করে রেখেছিলেন। বিম্বিসারের এখানেই মৃত্যু হয়। এ কারাগৃহ হতে তিনি গৃধ্রকূটে ভগবানের অবস্থান কালে তাঁকে দেখতেন।

আধুনিক ছট্টা পাহাড়ের দিকে যেতে পূর্ব দিকে জীবকের আম্রবন আছে। জীবক মগধরাজ বিম্বিসারের রাজবৈদ্য তথা বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর আম্রবন ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। এটিই জীবক-আম্রবন নামে খ্যাত। এর অনতিদূরে আছে মর্দকুক্ষি। মর্দকুক্ষি নামের সংগে জড়িত আছে এক কিংবদন্তী। কথিত আছে মগধরাজ বিম্বিসারের

পত্নী পিতৃঘাতক শিশু অজাতশত্রুকে গর্ভে ধারণ করেছে জেনে আপন গর্ভপাত করবার জন্য উদর মর্দন করান বলে এ স্থানের নাম হয়েছে মর্দকুক্ষি।

স্মরণাতীতকাল হতে রাজগৃহ ছিল নানা ধর্মের পীঠস্থান। প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের সারত্থপকাসিনীতে বৈভার গিরির অভ্যন্তরে অবস্থিত মনোরম নাগলোকের কথা আছে। বর্তমানেও মণিয়র মঠ নামক জৈন গুহার আশে পাশে নাগপূজা প্রচলনের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—পুষ্পমাল্য বেষ্টিতলিঙ্গ, বাণাসুর, নাগদেবতার মূর্তি ও শিরোপরি ফণাযুক্ত বহু নাগমূর্তি প্রভৃতি। মণিয়র মঠের দক্ষিণ পশ্চিমে বৈভার পর্বতের দক্ষিণ ধারে কতকগুলি গুহা দেখা যায়। এ গুলি সোনা ভাণ্ডার গুহা নামে খ্যাত। এ গুলি জৈনদের তীর্থস্থান।

পালি সাহিত্য হতে রাজগৃহের পুরাকালের শিল্প ও স্থাপত্যের কিছু নমুনার কথা জানা যায়। নগর পরিকল্পনার মধ্যেও দেখা যায় রাজগৃহের স্থাপত্য ও শিল্পের প্রকৃষ্ট পরিচয়। পঞ্চগিরিরূপ প্রাকৃতিক প্রাচীর দিয়ে রাজগৃহ পরিবেষ্টিত হলেও নগরটি দু'টি বৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রাকার দিয়ে ঘেরা। বুদ্ধঘোষের সুমঙ্গলবিলাসিনীতে রাজগৃহের ৯৬টি তোরণ-দ্বারের উল্লেখ আছে। এ ৯৬টির মধ্যে বত্রিশটি বড় এবং চৌষট্টিটি ছোট তোরণ। নগরের বাহিরের প্রাকারে চারটি প্রধান তোরণ ছিল।

রাজগৃহের অনতিদূরে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ। এটি এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৈশালী—বৈশালী নগর বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মুজফ্‌ফরপুর জিলায় অবস্থিত। এটি বর্তমানে বেসার নামে খ্যাত। বুদ্ধের সময়ে বৈশালী এক ঐশ্বর্যময় নগর ছিল। এটি ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন গণরাজ্য লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাজধানী ছিল। আটটি জাতির (অট্ঠকুল) মিলিত শক্তিতে গঠিত এ গণরাজ্য। গণশক্তির মধ্যে লিচ্ছবিরা ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। সেজন্য একে লিচ্ছবি গণরাজ্যও বলা হয়। লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাজধানী বৈশালী বিস্তৃত ঐশ্বর্যময় ও জনাকীর্ণ। পালি মহাবগ্‌গে উল্লেখ আছে, এখানে ৭৭০৭টি প্রাসাদ, ৭৭০৭টি কুটাগার, ৭৭০৭টি প্রমোদ উদ্যান এবং ৭৭০৭টি পুষ্করিণী ছিল। বুদ্ধ জীবিতাবস্থায় এখানে অনেকবার আসেন। এখানে তিনি সশিষ্য বৈশালীর রূপলাবণ্যে অতুলনীয়া নগর-গণিকা আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করেন। বুদ্ধ লিচ্ছবিদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে বলেন, "ভিক্ষুগণ তোমরা সুদর্শনা নগর হতে উপবনযাত্রী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের দেবতাগণকে কখনও দেখনি। সম্পদ ও ঐশ্বর্যে সেই দেবগণের সমতুল্য লিচ্ছবিদের দেখে নয়ন সার্থক কর।" রামায়ণেও বৈশালী নগরকে "বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা" বলে প্রশংসা করা হয়েছে। বৈশালী পরিক্রমাকালে বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বাণ লাভের কথা ঘোষণা করেন শিষ্যদের কাছে। ভগবানের পরিনির্বাণের পরে লিচ্ছবিরাও তাঁর পুতাস্থির অংশ আপন দেশের মধ্যে স্তূপ নির্মাণ করে রক্ষা করেন। তাঁবা পুতাস্থিগুলিকে অতি শ্রদ্ধার সহিত পুজা করেন। ভগবান নিজেই লিচ্ছবি জাতির গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের সাতটি বিশেষ গুণের কথা গর্বভবে উল্লেখ করেন। এগুলি সপ্ত অপরিহানি ধর্ম নামে পবিচিত। বৈশালী জৈনদের বড় তীর্থস্থান। বৈশালী জৈনধর্মেব প্রবর্তক মহাবীরের জন্মভূমি।

"রাজা বিশালকা গড" নামক স্থানটি প্রাচীন বৈশালী নগরের প্রাকার বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। খননের ফলে এখানে অনেক মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষপত্র পাওয়া যায়।

ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সাঙ বৈশালী পরিদর্শন কবেন। এখানে তাঁরা অনেক স্থাপত্য ও প্রাচীন শিল্পের নমুনা দেখতে পান।

রাজা বিশালকা গড়ের উত্তরে কোলৌ নামক স্থানের অনতিদূরে আছে সিংহমূর্তিযুক্ত একটি বিশাল স্তম্ভ। এর মধ্যে আছে অশোকের শিলালেখ। হিউয়েন-সাঙ এটি দেখতে পান। চম্পারন ও মুজপ্‌ফরপুর জেলায় রামপূর্ব, লৌডিয়া, অবরজ, লৌডিয়া নন্দনগড় এবং কোলৌ প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত অশোক স্তম্ভের সারি হতে সম্রাট অশোকের পাটলিপুত্র হতে লুম্বিনী পর্যন্ত ধর্মযাত্রার গতিপথ সহজে অনুমান করা যায়।

সাংকাশ্য—সাংকাশ্য বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থানের অন্যতম। এটি উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলার সংকিশ-বসন্তপুর নামে খ্যাত। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে ধর্মদেশনা করে সংকিশ নামক স্থানে অবতরণ করেন। স্বর্গ হতে অবতরণ করবার জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হতে সাংকাশ্য পর্যন্ত তিনটি প্রশস্ত সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়। অবতণের সময়ে ভগবানের সংগে ছিলেন ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র। ভার্হুত ও সাঁচীর তোরণ গাত্রে খোদাই করা

হয়েছে সাংকাশ্যে ভগবানের অবতরণ দৃশ্য। সেখানে নির্মিত হয়েছে স্তূপ, চৈত্য ও বিহার।

ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সাঙ এখানে এ সব চৈত্য ও স্তূপাদি দেখেন। এর অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে দেখা যায় একটা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ। এর উপরে বিসরা দেবীর মন্দির আছে।

সাঁচী—মধ্যপ্রদেশের রেইসন জিলার ভিলসা হতে ছ'মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বীণা এবং ভূপাল জংশনেব মধ্যবর্তী স্থানে পাহাড়েব উপর সাঁচীর স্তূপগুলির খ্যাতি ভারত তথা বিশ্বের দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সব স্তূপ সাঁচী রেলওয়ে স্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশেব রাজধানী ভূপাল ও ভিলসা হতে সাঁচী পর্যন্ত যানবাহনযোগ্য রাস্তাও আছে। অবশ্য ভূপাল হতে সাঁচীর দূরত্ব চুয়াল্লিশ মাইল। পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের জন্য বাংলো এবং অতিথিশালা আছে।

ভগবান বুদ্ধের জীবনেব প্রধান ঘটনার সংগে সাঁচীর কোন সংযোগ নেই। বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থেও সাঁচীর নাম পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সাঁচীর কথা উল্লেখ করেন নি। তাহলেও স্তূপ ও স্তূপসংলগ্ন তোরণে খোদিত বৌদ্ধ শিল্পের জন্য এটি অম্লান বদনে আন্তর্জাতিক শিল্পেব দববাবে সুযশ অর্জন কবে। পালি দীপবংস ও মহাবংসে এ স্থানের কিছু বর্ণনা মেলে। এতে আছে অশোক পিতার আদেশে উজ্জয়িনী যাবার পথে বিদিশাতে জনৈক বণিকের পরমা সুন্দরী কন্যা দেবীকে বিয়ে করেন। দেবীর গর্ভে তাঁর এক পুত্র মহেন্দ্র ও এক কন্যা সংঘমিত্রার জন্ম হয়। অশোক মহেন্দ্রকে ধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে পাঠান। সিংহলে যাবার আগে মহেন্দ্র তাঁর মাতাকে দেখবার জন্য বিদিশাতে যান। তাঁর মাতা দেবী মহেন্দ্র ও অন্যান্য ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্য এক বিহার তৈরী করেন। এ বিহারকেই বেদিশাগিরি বিহার বলা হয়। কোন কোন গ্রন্থে এটাকে অভিহিত করা হয় চেতিয়গিরি নামে। এখানে মহেন্দ্র এক মাস অবস্থান করেন। বেদিশা হল বিলশার নিকটে বর্তমান বেসনগর। বিদিশার সাঁচী, আঁধের, সোনারী, শতধর এবং পিপ্পালয় (বর্তমান ভোজপুর) প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধস্তূপ এখনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়।

সাঁচীর স্থানীয় শিলালেখ হতে জানা, যায় এর প্রাচীন নাম ছিল

কাকনাব ও কাকনায়। এর পরে কাকনাদবোট এবং আরও পরে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বোটশ্রীপর্বত নামে খ্যাত হয়। এখানে সম্রাট অশোকের নির্মিত স্তম্ভ আছে। একটি অশোকের অনুশাসনলিপিও পাওয়া গেছে। এটিতে সংঘভেদকারী ভিক্ষুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারীর কথা আছে।

কয়েক বছর হল ভারত গবর্নমেণ্ট শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন এ দু'জন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকের পুতাস্থির উপর একটি বৃহৎ চৈত্য নির্মাণ করেছেন।

অজন্তা—অজন্তা নিজাম রাজ্যের উত্তরসীমায় অবস্থিত। বর্তমানে মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত আউরঙ্গবাদ হতে ৬৩ মাইল উত্তরে ফদরপুর নামক গ্রাম হতে চার মাইল দূরে অজন্তার গুহাগুলি খনন করা হয়েছে। জলগাঁও হতে এর দূরত্ব মাত্র ৩৪ মাইল। আউরঙ্গবাদ এবং জলগাঁও উভয়ের সংগে অজন্তার মোটর চলাচল রাস্তার সংযোগ আছে। উভয় স্থান হতে রীতিমত মোটর চলাচলের ব্যবস্থাও আছে। গুহাগুলির নিকটে বাসযোগ্য কোন কিছু না থাকলেও এর চার মাইল দূরে ফদরপুরে সরকার পরিচালিত অতিথিশালা এবং বাংলো আছে।

ভগবান বুদ্ধের জীবনের সংগে অজন্তার কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও অজন্তা তার গুহা ও গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রের জন্য সমগ্র বিশ্বের শিল্প জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করে আছে। বিশ্ববাসী অজন্তার ভাস্কর্য ও লেপ্য চিত্রকে নতশিরে বরণ করে। আজও তার সমকক্ষ শিল্প প্রতিভার পরিচয় মেলে না। অজন্তার পাহাড়গুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এ জনবিরল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মন হয়ত শিল্পরসে সিক্ত হয়েছিল। তাই তাঁরা বুদ্ধের মহিমা চিরোজ্জ্বল রাখবার জন্য শিল্প সৃষ্টি করেন। দুর্গম পাহাড় খোদে গুহা তৈরী করে এবং এর দেওয়াল গাত্রে ভগবান বুদ্ধের বর্তমান ও অতীত জীবনকে শিল্পের রূপ দিয়ে। পার্বত্য নদী বাঘোরা অজন্তা পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অজন্তায় বত্রিশটি গুহা আছে। এ বত্রিশটির মধ্যে আটাশটি বিহার ও চারিটি চৈত্য। এ গুহাগুলি এক সময়ে একই শিল্পীদের দ্বারা খোদাই করা হয়নি। শিল্পের দিক দিয়া বিচার করা হলে দেখা রায় গুহাগুলির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম হতে সপ্তম শতকের মধ্যে।

অজন্তার গুহা শুধু রাজানুগ্রহে নির্মিত হয় নি। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংগৃহীত

অর্থে ও প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল এ সব গুহা ও লেখ্য চিত্রগুলি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়ের গায়ে খোদিত লিপি হতে। খোদিত লিপি হতে জানা যায় ২৬নং গুহা নির্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করেন শ্রমণ বুদ্ধভদ্র ও তাঁর শিষ্য ভদ্রবন্ধু, প্রতিভূ এবং ধর্মদত্ত।

দুঃখের বিষয় যে সব স্থপতি, শিল্পী ও চিত্রকর শিল্প প্রতিভার দ্বারা গুহাগুলি মনোরম করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

অজন্তার শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পাহাড়ের গা কেটে সৌধ তৈরী করা। পাহাড়েরই সম্মুখে এর প্রবেশ দ্বার ও বড় জানালা। জানালা প্রবেশ দ্বারের ঠিক উপর। অর্ধগোলাকারে এমনভাবে এগুলি তৈরী করা হয়েছে যাতে গুহার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। এ জানালাগুলিকে অশ্বখুরাকৃতি জানালা বলা হয়। পাহাড়ের গা কেটে আবার বড় বড থামও করা হয়েছে। অজন্তা গুহাগুলির ছাদ সমতল। কয়েকটি গুহার ছাদ অর্ধগোলাকার। স্তম্ভে, ছাদের নীচে কড়িতে এবং প্রবেশদ্বারের সম্মুখে খোদিত মূর্তিগুলিই সৌন্দর্য সৃষ্টি কচ্ছে। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর লেপ্যচিত্র। অজন্তার প্রাচীরগাত্র ও ছাদের তলা নানা বর্ণের চিত্র দ্বারা শোভিত। চিত্রের অঙ্কনপদ্ধতি ও কলাকৌশল অতি উৎকৃষ্ট। অজন্তার শিল্পীদের নৈপুণ্য ও সৃজনীশক্তি জগতে অনুপম ও অদ্বিতীয়। বিশ্বের শিল্প দরবারে অজন্তার শিল্পীদের আসন পুরোভাগে।

তক্ষশীলা—বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত রাউলপিণ্ডি হতে বিশ মাইল দূরে লাহোর-পেশোয়া রেলপথে টেক্সিলা ষ্টেশনের অনতিদূরে ছ' মাইল ব্যাপী বিস্তৃত আছে তক্ষশীলা স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। তক্ষশীলার স্থানীয় নাম হল সরাইকলা। তক্ষশীলার উপর দিয়ে গেছে বাংলা দেশ হতে পেশোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ রাজপথ (গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড)। প্রাচীন কালে স্থানটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক ঘাটি ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রাচীন ঐতিহাসিকের মতে—সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর অন্তবর্তী ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল এই সমৃদ্ধশালী তক্ষশীলা। মনীষী ষ্ট্রাবো লিখেছেন, তক্ষশীলা ও চতুর্পার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড জনবহুল, বহুবসতি ও উর্বর। হিউয়েন সাঙ ও ফা-হিয়ান তক্ষশীলায় আসেন। হিউয়েন-সাঙও তক্ষশীলার উর্বরতা, শস্য

উৎপাদন শক্তির প্রাচুর্য, স্রোতস্বতী নদীর বহুলতা এবং গাছপালার সজীবতার প্রশংসা করছেন। বর্তমান হারো নদী, তাম্রনালা, লুণ্ডিনালার বিস্তৃত অঞ্চল ও হাতিয়াল পাহাড়ের উপত্যকায় তক্ষশীলা নগরটি যুগে যুগে গড়ে উঠেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তক্ষশীলার ধ্বংস স্তূপের মধ্যে তিনটি বৃহৎ নগরের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। এগুলি হল বীরমণ্ড, শিরকাপ ও শিরসুখ। বীরমণ্ড হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে গড়ে উঠে এবং শিরকাপ গ্রীক যুগে ও শিরসুখ কুষাণ যুগে।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, রামের ভ্রাতা ভরত তক্ষশীলা নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে পুত্র তক্ষের রাজ্যাভিষেক করেন। মহাভারতে তক্ষশীলাকে রাজা জন্মেজয়ের বৃহৎ সর্পযজ্ঞের পীঠস্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধযুগে তক্ষশীলা সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। এখানে অধ্যয়ন করবাব জন্য ছাত্ররা আসত বহু দূর দেশ হতে দলে দলে। তক্ষশীলার শিক্ষকদেরও ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি। এখানে ত্রিবেদ, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষবিদ্যা, গণিত, বাণিজ্যিক বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, মেজিক, নৃত্যগীত, ধনুর্বিদ্যা, হস্তীমন্ত্র, রাজনীতি ও ভৈষজ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। অস্ত্রোপচার শিক্ষাও দেওয়া হত তক্ষশীলায়। মগধরাজ বিম্বিসারের রাজবৈদ্য তথা বুদ্ধের পরম ভক্ত জীবক তক্ষশীলায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে অস্ত্রোপচারে দক্ষতা লাভ করেন। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক। রাজনীতিবিদ চাণক্য এখানে রাজনীতি শিক্ষা লাভ করেন।

প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম রাজ্য গান্ধার জনপদের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। আলেক্জেণ্ডারের ভারত অভিযানের আগে তক্ষশীলা পারস্য শাসনের অধীনে ছিল। পারস্য শাসনের কিছু নমুনা এখানে মেলে। আলেক্জেণ্ডারের ভারত অভিযান কালে তক্ষশীলার রাজা ছিলেন অম্ভি। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজশক্তির প্রভাবে আলেক্জেণ্ডারের পক্ষে ভারতে রাজ্যবিস্তার করা সম্ভব হয়নি। তক্ষশীলা হতে বিদায় নিতে হল গ্রীকদের। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তক্ষশীলা মৌর্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের প্রধান নগর হয়ে উঠে। পিতার আদেশে সম্রাট অশোক এখানে বিদ্রোহ দমনের জন্য আসেন। মৌর্যযুগে সম্রাট অশোকের সহায়তায় বৌদ্ধ স্তূপাদি নির্মিত হয়। মৌর্যদের পরে তক্ষশীলা ইন্দোগ্রীকদের অধীনে যায়। তাদের সময়ে অনেক গ্রীক স্থাপত্য

এখানে গড়ে উঠে। এর নিদর্শন তক্ষশীলায় প্রচুর পাওয়া যায়। শক-পল্লবদের ভারতে আগমনের ফলে ইন্দোগ্রীক রাজত্বের শেষ হল। তক্ষশীলায় শক-পল্লব রাজত্বের অনেক নিদর্শন মেলে। তারপর তক্ষশীলা এল কুষাণ শাসনের অধীনে। মৌর্য যুগেই সম্রাট অশোকের সহায়তায় সর্বপ্রথম এখানে বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্যাদি গড়ে উঠে। মৌর্যদের পরে ইন্দোগ্রীকদের সহায়তায় গান্ধার রাজ্যে গড়ে ওঠে এক বিরাট ইন্দোগ্রীক ভাস্কর্য ও শিল্পের ঐতিহ্য। এই ইন্দোগ্রীক শিল্পে ভগবান বুদ্ধ শিল্প জগতে প্রথম মূর্তিরূপ নিলেন। বুদ্ধমূর্তির প্রথম জন্ম হয় ইন্দোগ্রীক গান্ধার শিল্পে। হাজার হাজার বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি তৈরী হয় এ শিল্পে। এরূপে তক্ষশীলা বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে।

তক্ষশীলায় সম্রাট অশোক অনেক বৌদ্ধ স্তূপ তৈরী করান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়টির একটু বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :—

ধর্মরাজিক স্তূপ—এ স্তূপে সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের পূতাস্থি রক্ষা করেন। এটি নির্মিত হয় বীরমণ্ড নগরের প্রান্তে হাতিয়াল পাহাড়ের উপর। বর্তমানে এটি চিরটোপ নামে পরিচিত। স্তূপটি অর্ধ গোলাকার। এ স্তূপের আশে পাশে আছে অনেক স্তূপ, বিহার ও উপাসনা গৃহ।

কুণাল স্তূপ—এটি অশোকের পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়। বর্তমানে স্তূপটি ১০৫ ফুট উঁচু এবং ৬৩ ফুট প্রস্থ। এর নিকটে আছে একটি বৃহৎ সংঘারাম।

মস্তকদানের স্তূপ—নগরের অনতিদূরে উত্তরে এক উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। কথিত আছে পূর্বজন্মে ভগবান বুদ্ধ এখানে নিজ মস্তক দান করেন। হিউয়েন-সাঙ বলেন—এখানে চিকিৎসক কুমারলব্ধ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন।

মোহা-মোরাদু—হাতিয়াল পাহাড়ের উপত্যকায় এটি অবস্থিত। স্তূপটির খোপে খোপে আছে ছোট ছোট স্তম্ভ। এখানে একটি বৌদ্ধ বিহারও আছে। এছাড়া এখানে জোরাষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল জাণ্ডিয়াল।

জাণ্ডিয়াল—তক্ষশীলা সংগ্রহশালা হতে দেড় মাইল দূরে শিরকাপ নগরের উত্তরে উচ্চ ঢিবির উপর অগ্নি উপাসনা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এটি জোরাষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বীদের মন্দির।

বৌদ্ধ তীর্থ

নালন্দা—নানন্দা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত আধুনিক রাজগির হতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম বডগাঁও। পালি নিকায় হতে জানা যায় ভগবান বুদ্ধ সময়ে সময়ে নালন্দায় আসতেন। ভগবান কোন এক সময়ে পাবারিক আম্রবনে অবস্থান কালে নালন্দা বিস্তৃত, জনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্যময় বলে প্রশংসা করেন। এখানেই তাঁর সংগে দেখা হয় অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতম শারিপুত্রের। আবার জৈন নিগ্রন্থনাথপুত্রের বহুশিষ্য ও বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে তাঁর ধর্মে দীক্ষা নেন।

জৈন গ্রন্থ হতেও নালন্দার সুখ্যাতির বিষয় জানা যায। এখানে বহু অট্টালিকা, স্তম্ভযুক্ত স্নানাগার ও উপবন ছিল। কথিত আছে লেপ নামে একজন ঐশ্বর্যশালী শ্রেষ্ঠী এখানে বাস করতেন। এখানেই গৌতমের সংগে আবার পার্শ্বনাথেব শিষ্যদের কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়। জৈন ভগবতীসূত্রে উল্লেখ আছে মহাবীর এখানে চতুর্দশ বর্ষাবাস যাপন করেন।

তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ নালন্দাকে বুদ্ধ শিষ্য শারিপুত্রের জন্মস্থান বলে উল্লেখ কবেছেন। সম্রাট অশোক এখানে শাবিপুত্রেব স্মৃতি চৈত্য নির্মাণ করেন এবং নালন্দা মহাবিহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন। খ্যাতনামা দার্শনিক নাগার্জুন ও তাঁর শিষ্য নালন্দা বিদ্যায়তনে অনেকদিন কাটান। বিখ্যাত বৌদ্ধ তার্কিক দিঙ্‌নাগ নালন্দায় অবস্থান কবেন এবং ব্রাহ্মণ সুদুর্জয়কে তর্কে পরাস্ত করেন। দিঙ্‌নাগ ছিলেন বসুবন্ধুর শিষ্য। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান ও খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙ নালন্দায় আসেন। হিউয়েন-সাঙ এখানে পাঁচ বছর অধ্যয়ন কবেন। নালন্দা নামের উৎপত্তির সংগে তিনি একটি কিংবদন্তীব উল্লেখ করেন। নালন্দাব আম্রবনে ছিল একটি পুষ্করিণী। সেখানে নালন্দ নামক এক নাগরাজ বাস করত। এর নামানুসারে এ স্থানটির নাম হয় নালন্দা। জানা যায় পাঁচশো বণিক দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে নালন্দা মহাবিহার নির্মাণ করে ভগবান বুদ্ধকে দান করেন।

বহু শতাব্দী ধরে অনেক রাজা মহারাজার বদান্যতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গডে উঠে। এর সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য যে সব রাজা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম হিউয়েন-সাঙ এর বর্ণনা হতে জানা যায়। হিউয়েন-সাঙ বলেন ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত-গুপ্ত, বজ্র এবং মধ্যভারতের জনৈক রাজা নালন্দার সংঘারাম ও বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় অংশ নেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নালন্দা বিদ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মধ্যভারতের এই অজ্ঞাতনামা রাজা সম্ভবত সম্রাট হর্ষবর্ধন বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। তিনি নালন্দায় অনেক সংঘারাম তৈরী করেন এবং সেখানে বসবাসকারী ভিক্ষুদের আহার বিহারের সুবন্দোবস্তও করেন। বালাদিত্যও তৈরী করেন চতুষ্কোটি ভিক্ষু সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় বিহার।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনটি সু-উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এর প্রধান তোরণ হতে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় গৃহগুলি ছিল তলবিশিষ্ট। প্রত্যেক গৃহেরই চূড়া ছিল। বিদ্যায়তনের উচ্চতল হতে ভ্রাম্যমান মেঘের খেলা দেখা যেত। মেঘগুলি হাওয়ার গতিতে ভেঙে ভেঙে পুরাতন চেহারা বদলে নতুন রূপ নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। সন্ধ্যা বেলার সূর্যাস্তের রক্তিম আভা ও রাত্রি বেলায় চন্দ্রকিরণের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যেত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষ হতে। হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণিত নালন্দার সৌন্দর্য নালন্দায় প্রাপ্ত যশোবর্মের শিলালেখায় উৎকীর্ণ বর্ণনার সংগে সাদৃশ্য আছে। এ শিলালেখতে উল্লেখ আছে বিহারাবলী অর্থাৎ সারিবদ্ধ বিহারের শিলাসমূহ কিরূপ অম্বরধর অর্থাৎ জলধিকে অবলেহন কচ্ছে অর্থাৎ চুম্বন দিচ্ছে। প্রাসাদোপরি হতে দেখা যায় স্বচ্ছ জলের পুষ্করিণীগুলির মধ্যবর্তী স্থানে বিস্তৃত রয়েছে আম্রকুঞ্জ। ভিক্ষুদের আবাসগুলি নির্মিত হয়েছে বিদ্যায়তন হতে দূরে। আবাসগুলি খুব সুন্দর ও সুব্যবস্থিত। ইৎ-সিং বলেন নালন্দা বিদ্যায়তনে আটটি হল ও ৩০০টি কক্ষ আছে।

নালন্দা মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্বর্য ধনসম্পদ ও জাকজমকপুর্ণ অট্টালিকা সমূহের বর্ণনা অধুনা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনের সংগে নিকট সামঞ্জস্য দেখা যায়। কানিংহাম ও নালন্দার শিল্পকে শ্রেষ্ঠ বলে মত পোষণ করেন। খনন কার্যের ফলে বিহারের সারিও কক্ষসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকারও বের হয়েছে নালন্দার ধ্বংস স্তূপ হতে। কক্ষসমূহের মধ্যে কোনটি দু'জন কোনটি বা একজনের উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়েছে। কক্ষের মধ্যে বসার ও শোয়ার জন্য চৌকি এবং গ্রন্থ ও প্রদীপ রাখার কোটর আছে। শ্রীনালন্দা-মহাবিহার-আর্য-ভিক্ষু-সংঘস্য উৎকীর্ণ একটি মোহর এখানে পাওয়া গেছে। মোহরগুলির মধ্যে

ধর্মচক্র চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এখানে বুদ্ধমূর্তি ছাড়া অবলোকিতেশ্বর, বাগীশ্বর প্রভৃতি মহাযান বুদ্ধ মূর্তিও পাওয়া গেছে।

হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনা হতে জানা যায়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাজারা শুধু যে অট্টালিকা ও প্রাসাদ তৈরী করেছেন তা নয়, তাঁর নালন্দায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের আহার বিহার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করবার জন্য ১০০টি গ্রাম দান করেন। ইৎ-সিং উল্লেখ করেছেন রাজারা বংশপরম্পরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করবার জন্য ২০০টি গ্রাম দান করেন। এ সকল গ্রাম হতে শিক্ষার্থীদের জন্য আসত চাল, দুধ, মাখন ও অন্যান্য ভোজ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এসব দ্রব্যাদি সরবরাহ করবার জন্য দিনে দু'শো পরিবারের উপর ভার ন্যস্ত ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য রাজা হর্ষবর্ধনের নাম যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি অপর কয়জন রাজার নামও পাওয়া যায়। জানা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পূর্ণবর্মা নামক রাজারও কিছু অবদান আছে। তিনি এখানে ৮০ ফুট উচ্চ দণ্ডায়মান তামার নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি তৈরী করান। এই পূর্ণবর্মা ছিলেন একজন মৌখরী বংশীয় রাজা। নালন্দায় প্রাপ্ত একটি শিলালেখতে উল্লেখ আছে মালাদ নামক যশোবর্মদেবের একজন মন্ত্রী নালন্দায় অধ্যয়নকারী ভিক্ষুদের জন্য দৈনিক অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করতেন। এর পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পালরাজাদের রাজানুগ্রহ লাভ করে। তাঁদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজগতে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। এখানে রাজা ধর্মপালের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এ হতে জানা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের লুপ্ত গৌরব পুন ফিরে পায় এ রাজাদের প্রচেষ্টায়। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) রাজা শৈলেন্দ্রবংশোদ্ভূত শ্রীবালপুত্রদেব নালন্দায় অধ্যয়নকারী ভিক্ষুদের নিবাসের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করার ইচ্ছা জানিয়ে গৌররাজ দেবপালের অনুগ্রহ ও অনুমতি লাভের জন্য দূত পাঠান। দেবপাল সানন্দে শ্রীবালপুত্রদেবের অনুরোধ রক্ষা করেন। নালন্দায় বালপুত্রদেব নির্মিত বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার সাধনের জন্য রাজা দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেন। ঘোষরাঁ

শিলালেখ হতেও জানা যায় বীরদেব নামক নালন্দার পণ্ডিত আচার্য দেবপালের বিশেষ শ্রদ্ধা পেতেন। তাঁকে নিযুক্ত করা হয় নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ। নালন্দায় প্রাপ্ত বাগীশ্বরী মূর্তির নীচে উৎকীর্ণ শিলালেখে উল্লেখ আছে, রাজা গোপালও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েব জন্য কিছু দান করেন। কল্যাণমিত্র চিন্তামণি নামক একজন পণ্ডিত অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার বিগ্রহপালের রাজত্বের সময়ে অনুলিপি তৈরী করেন। গোবিন্দপালের সময়ে এর পুন অনুলিপি করা হয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি বৃহৎ শিক্ষাপীঠ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এর শিক্ষাদানের পেছনে ছিল শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষাদান কবা। ছাত্রদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায় না। বিনা ব্যয়ে শিক্ষার্থীরা এখানে বছবের পর বছব জ্ঞান অর্জন করতে পারত। অধ্যয়নকারী ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা ছিল আহাব-বিহার, শয্যা, ঔষধ এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনা হতে এসব নিত্য ব্যবহায দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য চিন্তা করতে হত না। অধ্যয়নই ছিল ছাত্রদের প্রধান কাজ। জ্ঞান অর্জনই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। মনেযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে পাঠ তৈবী করাই তাদের অধ্যবসায়ের সার্থক রূপ।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার জন্য প্রবেশ দ্বার ছাত্রদের পক্ষে এত সহজ ছিল না। যে সকল ছাত্র মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম তারাই পেত অগ্রাধিকার। কোন ছাত্রকে বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে তোলাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষত্ব। জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন স্থান তথা দক্ষিণপুর্ব-এশিয় দেশ এমন কি তিব্বত, চীন ও মঙ্গোলীয় দেশ হতে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত হাজার হাজার বিদ্যার্থীরা। ইৎ সিং ও অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজকেরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এ ছাডা দেশ দেশান্তর হতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রাদিতে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য আসতেন। এর শিক্ষা ব্যবস্থা অতি উন্নত ধরণের ছিল। সেজন্য অধ্যয়নে ইচ্ছুক ছাত্রদের পরীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া

হত। প্রবেশানুমতির জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনা হতে জানা যায় এ সকল প্রবেশানুমতি প্রার্থী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা মাত্র বিশ জন উত্তীর্ণ হতে পারত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার ছাত্রের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কঠোর ছিল, ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্যও তেমনি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হত। ছাত্রদের বয়স সম্বন্ধে বেশ নজর দেওয়া হত। কোন বয়সের ছাত্রকে কোন ধবণেব বিষয় অধ্যয়ন করবাব জন্য অনুমতির ব্যবস্থা করা যাবে, তার জন্য ছিল বিশেষ ন্যায্য বিচার। ছাত্রদের ধীশক্তি বৃদ্ধি করা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রচেষ্টা ছিল, তেমনি বুদ্ধের নীতির আদর্শে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতিও ছিল কঠোর ব্যবস্থা।

নালন্দায় ১০,০০০ বসবাসকারীর মধ্যে ১,৫০০জন ছিল অধ্যাপক এবং ৮,৫০০ জন শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য দিনে ১০০টি বক্তৃতাব ব্যবস্থা ছিল। শ্রেণীর মধ্যে বক্তৃতা করা হত মঞ্চপীঠ হতে। ছাত্রদের এ সকল পাঠ মনোযোগ সহকাবে শুনতে হত। ঘুমাবার সময় ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও পাঠচক্র চলত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র দর্শন ছাড়াও বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সংস্কৃত, ব্যাকবণ ও ন্যায়শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া হত। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া এখানে বৈষয়িক বিষয়েরও শিক্ষাদানেব ব্যবস্থা ছিল। হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রাদি ছাড়াও হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ম্যাজিক প্রভৃতি এখানে শিক্ষা দেওয়া হত।

হিউয়েন-সাঙ-এর সময়ে নালন্দার প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল। এ ছাড়া গুণমতি, স্থিরমতি প্রভৃতি পণ্ডিতদের নামও জানা যায়। আচার্য শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি উপাধি বা পদবীর ব্যবস্থাও ছিল। সর্বোচ্চ পদবীর নাম ছিল 'কুলপতি'। কুলপতি অধিকারী ছাত্রকে দশ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে হত। এর পরবর্তী পদবীর নাম 'পণ্ডিত'।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার খুব উন্নত ধরণের ছিল। এখানে প্রচুর গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল। ছাত্রদের পড়বার সবরকম সুযোগ সুবিধা ও সুব্যবস্থা

ছিল। ইৎ-সিং এখান হতে ৪০০০ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারটি জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। এটি নালন্দার বিশেষ স্থানে তৈরী করা হয়েছিল। এর নাম ধর্মগঞ্জ। এর মধ্যে রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক নামে তিনটি অট্টালিকা ছিল। রত্নসাগর প্রাসাদটি ন'তল বিশিষ্ট ছিল। এখানে রক্ষিত ছিল প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের পুঁথি ও তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ।

সম্প্রতি বিহার গভর্নমেণ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রের পঠনপাঠন ও গবেষণার জন্য নবনালন্দামহাবিহার নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

একাদশ অধ্যায়

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*

প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ ও বৌদ্ধ সাহিত্যে হতে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম এক কালে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার ঢেউ বাংলাদেশে কবে এসে পৌঁছেছিল এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পালি গ্রন্থে বা সমসাময়িক কালে রচিত অন্য কোন গ্রন্থে মেলে না। সংযুক্তনিকায়ে ভগবান বুদ্ধের বাংলা দেশের অন্তর্গত শেতক নামক নগরে কিছুদিনের জন্য অবস্থান ও বাঙালী বৌদ্ধাচার্য বঙ্গীশের উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তরনিকায়েও বঙ্গান্তপুত্ত নামক এক জন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা জানা যায়। এ ছাড়া দিব্যাবদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধভক্ত শ্রাবস্তীব শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ তাঁর কন্যা সুমাগধাকে বিয়ে দেন বাংলা দেশের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনের জনৈক যুবকের সংগে। কথিত আছে সুমাগধার শ্বশুরালয়ের সকলেই ছিলেন নির্গ্রন্থ (জৈন ভক্ত)। তাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য সুমাগধা ভগবান বুদ্ধকে পুণ্ড্রবর্ধনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ নিজেই এখানে আসেন। কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্রর বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায়ও এরূপ সুমাগধার উপাখ্যান আছে। সুমপা রচিত পাক-সম-জোন-জং নামক তিব্বতী গ্রন্থে উল্লেখ আছে মগধভদ্র নামক জনৈক লোক বুদ্ধকে পুণ্ড্রবর্ধনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে পুণ্ড্রবর্ধনে বুদ্ধের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। তদুপরি মগধ ও বংগের ভৌগোলিক অবস্থান এত কাছাকাছি যে, বুদ্ধের সময়ে বাংলা দেশে তাঁর ধর্মের প্রসার হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে না। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে বুদ্ধের বাংলায় আগমনের কথা যা আছে তার ঐতিহাসিক সমর্থন মেলে না।

---

* ১৯৪৭ সালেব ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান এ দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দেশ বিভাগের ফলে বাংলা পশ্চিম বংগ এবং পূর্ব পাকিস্তান—এ দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিকথা বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানেরই বৌদ্ধধর্মের কাহিনী। এখন পর্যন্ত যে সব বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ও সংঘারাম প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রায় সবই এ এলেকায়।

অঙ্গুত্তরনিকায় ও নিদ্দেসে উল্লেখিত ষোড়শ মহাজনপদের তালিকার মধ্যে বাংলা দেশের নাম নেই। সম্রাট অশোকের অনুশাসন লিপির একটিও বাংলা দেশের মাটির তল হতে আজও বের হয় নি। অনুশাসনগুলি হতে যোন-কম্বোজ, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র, তাম্রপর্ণি প্রভৃতি অন্তরাজ্যে ধর্মমহামাত্র প্রেরণের কথা জানা যায়। সে সব অন্তরাজ্য সমূহের মধ্যেও বাংলা দেশের নাম মেলে না। সিংহলী ইতিবৃত্ত হতে জানা যায় ভারতে সম্রাট অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ তৈরী কবান। এ সব স্তূপের কোনও নিদর্শন বাংলার মাটিতে মেলে নি। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ বাংলা দেশে অশোক নির্মিত স্তূপ দেখেন বলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। পূর্বপাকিস্তানের বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থানে ব্রাহ্মী অক্ষবে লিখিত একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। এতে উল্লেখ আছে ছব্‌বগ্‌গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কথা। এ শিলালেখব অক্ষর মৌর্যযুগের বলে মনে করা হয়। মৌর্যযুগের পব বাংলা দেশের পুণ্ড্রবর্ধন যে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হযে উঠে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার প্রচুর নিদর্শন সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে ও মৌর্যোত্তর যুগেব শিলালেখ সমূহে যথেষ্ট মেলে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় পূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে সাঁচীর তোরণ গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালেখ সমূহ হতে জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধনবাসী ধর্মদত্তা (ধমতায়) নামক জনৈক নাবী ও ঋষিনন্দন (ইসিনন্দন) নামক জনৈক পুরুষ সাঁচী স্তূপের তোরণ নির্মাণের কিছু ব্যয়ভাব বহন করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালেখর মধ্যে বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায়। তিব্বতী গ্রন্থ হতে জানা যায় আচার্য নাগার্জুন পুণ্ড্রবর্ধনে কিছু বিহার নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত মিলিন্দপঞ্‌হ নামক পালিগ্রন্থে বংগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদুপরি ললিতবিস্তর (২য় শতক), মহাবস্তু (৩য় শতক) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বংগ লিপির কথা আছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে চৈনিক পরিব্রাজকেরা বাংলা দেশে এসেছিলেন। গুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় ফা-হিয়ান ভারতে আসেন বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য। তিনি পনর বছর ভারতে ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বাংলা দেশের তাম্রলিপ্তিতে (তমলুক) এসে পৌছান। তিনি সেখানে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখতে পান বলে উল্লেখ করেন। ফা-হিয়ানের

আগেও বাংলা দেশে চৈনিক পরিব্রাজকেরা এসেছিলেন। তাঁদের বসবাসের জন্য শ্রীগুপ্ত মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে বিহার নির্মাণ করান। এর সংরক্ষণের জন্য তিনি ছাব্বিশটি গ্রাম দান করেন। এটি উত্তর বংগের কোন স্থানে অবস্থিত। গুপ্তযুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির নিদর্শন বেশ মেলে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহী জেলায় অবস্থিত বৈহারৈলে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এ মূর্তিটি গুপ্তযুগের প্রাচীনতম নিদর্শন। বগুড়া জেলায় মহাস্থানের বলাইধাপ স্তূপের নিকট বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি ব্রঞ্জ-এর নির্মিত। পূর্ব পাকিস্তানে ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘর গ্রামে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর একজন সামন্তের অনুরোধে তিনি ভিক্ষু শান্তিদেবের[১] জন্য নির্মিত বিহারের সংরক্ষণ ও শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তির পূজোপচারের জন্য জমি দান করেন। এ বিহারে বসবাসকারী ভিক্ষুদের আহারের ব্যবস্থাও করেন। এ তাম্রশাসনে রাজবিহার নামক একটি বিহারের উল্লেখ আছে। গুনাইঘর অনুশাসন হতে অনুমান করা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

গুপ্তযুগের পর হর্ষযুগ। রাজা হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে আবার কিছুদিনের জন্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তাঁর রাজত্বের সময়ে হিউয়েন-সাঙ ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। তা ছাড়া তাও-লিন্, সেঙ-চি, ইৎ-সিং প্রভৃতি আরও চীনা পর্যটনকারীরা ভারতে আসেন। তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলার বৌদ্ধধর্মের প্রামাণিক খবর মেলে। হিউয়েন-সাঙ ও ইৎ-সিং বাংলা দেশে সম্মিতীয়, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিক প্রভৃতি বৌদ্ধমতাবলম্বীদের দেখতে পান বলে তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন-সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি—বাংলার এ কয়টি জনপদ পর্যটন করেন। পুণ্ড্রবর্ধনে মহাযান ও হীনযান দলীয় বিশটি বিহার ও তিন হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখতে পান। পুণ্ড্রবর্ধনে পো-সি-পো নামক একটি বড় বৌদ্ধ বিহার দেখেন। কর্ণসুবর্ণেও দশ হাজার বিহার আর সম্মিতীয়পন্থী দু'হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর অনতিদূরে

১। এই শান্তিদেব এবং শিক্ষাসমুচ্চয়, ও বোধিচর্যাবতার প্রভৃতির লেখক শান্তিদেব এক ব্যক্তি নন্। উভয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই।

রক্তমৃত্তিকা নামক একটি বিহারের কথা তিনি বলেছেন। এই বিহারেও অনেক পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুর অবস্থানের কথা লিখে গেছেন। তাম্রলিপ্তে দশাধিক বিহার ও এক হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সমতটে দু'হাজার স্থবিরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ত্রিশটি বিহার তিনি দেখতে পান। হিউয়েন-সাঙ-এর সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম কনৌজ ও মধ্যদেশে কিছু প্রসার লাভ করেছিল। অবশ্য হর্ষবর্ধনের পরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় পুর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের পরমায়ু আরও চার পাঁচশো বছর বেড়ে গেল। হর্ষযুগেই বাংলা দেশে আবির্ভূত হন দু'জন কৃতীসন্তান শীলভদ্র ও চন্দ্রগোমী। শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজবংশের সন্তান। তাঁর ভাইপো ছিলেন বোধিভদ্র। শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যায়ের অধ্যক্ষ। হিউয়েন-সাঙ তার নিকট অধ্যয়ন করতেন। চন্দ্রগোমী ছিলেন উত্তর বংগের বা বরেন্দ্রের অধিবাসী। তিনি একজন বৈয়াকরণ, কবি, নাট্যকার, নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধতন্ত্রের উপদেষ্টা ও লেখক। ইৎ-সিং-এর বিবরণী হতে জানা যায় চন্দ্রগোমী বরাহবিহার নামক একটি বিহারে বাস করতেন। রাজা হর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাংলার অধিপতি শশাঙ্ক। শশাঙ্ক ছিলেন নাকি বৌদ্ধ বিদ্বেষী। তিনি বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের ভূমিকা স্বহস্তে নিয়েছিলেন বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, রাজা শশাঙ্কের বিরাগ মনোভাব রাজা হর্ষবর্ধনের উপর যতটুকু বৌদ্ধধর্মের উপর ততটুকু নয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে ইতিহাসে খড়্গ বংশ নামে আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশের খবর পাওয়া যায়। এ বংশের রাজারা প্রথমে বংগে রাজত্ব করতেন। পরে সমতটে রাজত্ব বিস্তার করেন। বৌদ্ধধর্ম এ বংশের স্বকীয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আস্রফপুর লিপি হতে জানা যায় কর্মন্তের (পুর্ব পাকিস্তানে কুমিল্লার বড়কামতা) পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলিতে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। আস্রফপুর হতে কাঁসার চৈত্য ও ছোট ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া গেছে। বড়কামতায় শুভপুরের পুর্বে বিহারমণ্ডল বলে একটি গ্রাম আছে। সম্ভবত এটি বৌদ্ধ নাম। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের

হিন্দুরা এখনও সকালে ঐ গ্রামটির নাম উচ্চারণ করে না। এতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিদ্বেষ এখনও সঞ্জীবিত রয়েছে বলে মনে হয়।

অষ্টম শতক ছিল বাংলার ইতিহাসে এক অরাজকতার ইতিহাস। দেশে আর কোন রাজা থাকল না। থাকল না রাষ্ট্রের সামগ্রিক কোন ঐক্য। দেশে চলতে লাগল মাৎস্যন্যায়[১]। দুর্বলের উপর চলতে লাগল ক্ষমতাশালীদের জুলুম। জোর যার মুলুক তার। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন গোপালকে রাজা বলে বরণ করে নিল লোকেরা। দেশে ফিরে এল শান্তি ও শৃংখলা। এই গোপাল হলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পালবংশের প্রত্যেকে ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁরা ছিলেন পরমসৌগত। তাঁদের শিলালেখসমূহ সুগত বন্দনা দিয়ে আরম্ভ। এ বংশের রাজারা চারশো বছর বাংলা দেশে রাজত্ব করেন। পালবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা হলেন যথাক্রমে ধর্মপাল ও দেবপাল। মহারাজ দেবপালের পর বাংলা দেশে পালবংশের অন্যান্য রাজারা শাসন ব্যাপারে এত সুদক্ষ ছিলেন না। তাঁদের রাজত্বের সময় বাংলা দেশে কচ্ছাদনের জন্য বৌদ্ধধর্মের স্থিতি অবস্থা ছিল। মহীপাল ও নয়পালের রাজত্বের সময়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নব যুগ দেখা দিল। তাঁদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম পেল নতুন জীবনীশক্তি। মহারাজ ধর্মপালের খলিমপুর শিলালেখ ও দেবপালের নালন্দা ও মুংগের শিলালেখতে উৎকীর্ণ ছিল জোড়া মৃগমূর্তি ও ধমচক্র চিহ্ন। এগুলির প্রারম্ভে আছে সুগত বন্দনা। হর্ষবর্ধনের রাজত্বের পর বৌদ্ধধর্ম শেষ আশ্রয় লাভ করে বাংলা দেশে। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রভাবও ছড়িয়ে পড়ে বহির্ভারতে। পাল যুগেই বৌদ্ধধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। এক কথায় পালযুগই বাংলার বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণ যুগ। পাল রাজাদের প্রচেষ্টায় অনেকদিন ধরে দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ইতিহাস মানব সভ্যতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কীর্তিমান সম্রাট ধর্মপালের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নালন্দা মহাবিহার সমৃদ্ধি লাভ করে। সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরই অর্থানুকুল্যে। ত্রৈকুট বিহার তাঁর অর্থে নির্মিত হয়। ধর্মমালের পুত্র

১। মাৎস্যন্যায়—অর্থ মাছের নীতি। বড় বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে গিলে খায়। এ হল নীতি—দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার।

দেবপালও পিতার মত কীর্তিমান দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তাঁর রাজত্বের সময়ে জাভা ও সুমাত্রার সংগে বাংলা দেশের সংস্কৃতিক যোগাযোগ হয়। জাভার কলসনের নিকটবর্তী কেলুরক নামক স্থানে প্রাপ্ত গৌড় শিলালিপি হতে জানা যায় যে, দ্বীপাচার্য কুমারঘোষ যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীসংগ্রাম ধনঞ্জয়ের গুরু ছিলেন। বাংগালী কুমারঘোষ সেখানে একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বেই বলেছি দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন হতে জানা যায় শৈলেন্দ্র-বংশোদ্ভূত শ্রীবালপুত্রদেব আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় বিহার নির্মাণের উদ্দেশ্যে দূত পাঠান দেবপালের নিকট। রাজা এই অনুরোধ সানন্দে রক্ষা করে বিহার নির্মাণের অনুমতি দেন এবং ঐ বিহারগুলির সংরক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রামও দান করেন। নগরহাডের অধিবাসী পণ্ডিত বীরদেব বৌদ্ধধর্মানুরাগী হয়ে বুদ্ধগয়ায় গেলে দেবপাল তাঁকে নালন্দা মহাবিহারের আচার্য নিয়োগ করেন। বৌদ্ধ মহাবিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ও ধ্যান ধারণার প্রধান কেন্দ্র। বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনাদি শেখার জন্য তিব্বত হতে বহু শিক্ষার্থী এখানে আসত। তা মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এত বড় বিহার ভারতের আর কোথাও ছিল না। এ বিদ্যায়তনে একশো পনর জন আচার্য ছিলেন। তাঁরা এখানে নানা বিষয়ে অধ্যাপনা, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করতেন। তিব্বতী গ্রন্থ হতে জানা যায় ওদন্তপুরী মহাবিহারও ধর্মপালের নির্মিত। তারানাথ মনে করেন এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবপাল। এটি নালন্দা মহাবিহারের নিকটে। সোমপুর বিহার নির্মিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত আধুনিক পাহাড়পুর নামক স্থানে। এর ধ্বংসাবশেষ এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আচার্য বোধিভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করতেন। ভাববিবেকের মধ্যমকরত্নপ্রদীপ গ্রন্থটি এখানে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বিপুলশ্রীমিত্রের লেখা হতেও জানা যায়, বিপুলশ্রীমিত্রের গুরুর গুরু করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর বিহারে বাস করতেন। বংগাল সৈন্যরা সোমপুর বিহার অগ্নিদগ্ধ করে এবং সে আগুনে পুড়ে করুণাশ্রীমিত্র মারা যান। পরে বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুর বিহার সংস্কার করেন এবং সেখানে একটি তারামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐতিহাসিক তারানাথের মতে মহারাজ ধর্মপাল পঞ্চাশটি বিহার নির্মাণ

করেন। তিব্বতী গ্রন্থ হতে আরও কিছু বিহারের খবর মেলে। এদের মধ্যে অন্যতম হল ত্রৈকূট বিহার, দেবীকোট বিহার, পণ্ডিত বিহার, সন্নগড় বিহার, ফুল্লহরি বিহার, পট্টিকেরক বিহার, বিক্রমপুরী বিহার ও জগদ্দল মহাবিহার। ত্রৈকূট বিহাব পশ্চিম বংগের রাঢ দেশের ত্রৈকূট দেবায়তনের নিকটে। দেবী-কোট অবস্থিত উত্তর বংগের দিনাজপুর জেলায় বানগডের অনতিদূরে। পণ্ডিত বিহার ছিল চট্টগ্রামে। পট্টিকেরক ও সন্নগড় মহাবিহার ছিল পূর্ব বংগের ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাডের উপব। পট্টিকেরক বিহারের ধ্বংসাবশেষ এখন খনন করা হয়েছে। বিক্রমপুরী বিহার ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। এ সকল উল্লেখযোগ্য বিহার ছাডা আবও ছোট ছোট কয়েকটি বিহার বাংলা দেশে ছিল। এর নিদর্শন মেলে তিব্বতী গ্রন্থে ও প্রত্নতাত্ত্বিক নথিপত্রে। পাহাড়পুর হতে আটাশ মাইল দূরে দীপগঞ্জে একটি বিহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এটি হলুদ বিহার নামে খ্যাত। প্রসংগত বলা যেতে পারে বগুড়ার শীলবর্ষে এবং নদীযা জেলার স্বর্ণবিহারও বৌদ্ধ সাধনার কেন্দ্র ছিল। মহীপালের রাজত্বের সময় বিক্রমশীল ও সোমপুরী বিহার ভারত তথা বহির্ভারতের শিক্ষা জগতে মর্যাদা লাভ করে। এসব মহাবিহারের জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিরা তিব্বত ও অন্যান্য দূর দেশ হতে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন জানবার জন্য আসত। এখানে বৌদ্ধ গ্রন্থাদির রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি করা হত। রামপালের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয় জগদ্দল মহাবিহার। পাল রাজত্বের সময়েই বাংলায় বৌদ্ধধর্ম চরম উৎকর্ষতা লাভ করে এবং এ রাজাদের আমলেই আবার এ ধর্মে নানারূপ বিবর্তন আরম্ভ হয়।

চন্দ্র ও কাম্বোজ বংশীয় রাজারাও পাল বাজাদের মত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁরাও ছিলেন পরমসৌগত। তাঁদের লেখমালাতেও জোড়ামৃগমূর্তি চিহ্ন আছে। তাঁরাও বহু বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পাল ও চন্দ্রবংশের রাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন হয়। এদের শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বিকাশের নতুনত্ব দেখা দিল। অসংখ্য দেবদেবী, ধ্যান-ধারণা, তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম ও দেবায়তনে। পালযুগের বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়। বৌদ্ধ পাল রাজারা ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করতেন ও ব্রাহ্মণদের জমি ও ধন প্রভৃতি দান করতেন। পালযুগে শূন্যবাদ, বিজ্ঞান-বাদ প্রভৃতি জটিল বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের কথা সাধারণ মানুষের বোধগম্য

হল না। ধ্যান-ধারণা, তন্ত্র-মন্ত্র, মুদ্রা-ধারণী প্রভৃতির দিকেই আকৃষ্ট হল। তখন মন্ত্র, জপ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপই প্রাধান্য লাভ করে এবং এটিই বুদ্ধত্ব লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচিত হয়। এরূপে উদ্ভব হল মন্ত্রযানের। ক্রমে ক্রমে এ মন্ত্রযান হতে সৃষ্টি হল বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান। বজ্রযানে বোধিচিত্তের বজ্রস্বভাব লাভই বোধিজ্ঞান। সহজযানে শূন্যতা প্রকৃতি ও করুণা পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে যে সুখ হয় তাই মহাসুখ। এটিই সহজ (সহজাত) সুখ। কালচক্রযানে নিয়ত পরিবর্তনশীল কালচক্র ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে। নিজেকে এ কালচক্রের উর্ধে নেওয়াই—এ মতের প্রধান উদ্দেশ্য। বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নহে। এগুলির প্রত্যেকটি মন্ত্রযান ভাবধারার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক[১]।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে যে সকল বৌদ্ধাচার্যরা প্রধান ভূমিকা নেন তাঁদের বলা হয় সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। তিব্বতে সিদ্ধাচার্যের এখনও পূজা হয়। এখানে অনেক সিদ্ধাচার্যের প্রতিমা মেলে। লুইপাদ ছিলেন সিদ্ধাচার্যদের প্রথম আচার্য। জানা যায় মোট চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তি ধর্মের সহিত মিলে গেল। উৎপত্তি হল কৌলধর্ম। এ কৌলধর্মের প্রথম ও প্রধান গুরু হল মৎস্যেন্দ্রনাথ। কৌলধর্মীরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম মানতেন। এ সাধনবাদ হতে উদ্ভব হয় নাথ ধর্মের। এ ছাড়া একই গুহ্য সাধনবাদ হতে উদ্ভূত হয় অবধূত ও সহজিয়া ধর্ম। বৌদ্ধ সহজিয়ারা বর্ণাশ্রম মানতেন না। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের মতে এ সব সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান ধারণা ও সাধনমার্গ বাংলার বাউলেরাই বেশী বাঁচিয়ে রেখেছেন। বৌদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রকাশ হয় বৌদ্ধাচার্যদের অধ্যবসায়ে ও বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা তা প্রকাশ করতেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলায় রচিত অসংখ্য গ্রন্থে। প্রাচীন বাংলায় রচিত চর্যাগীতি বা চর্যাপদ নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ এখনও পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ গ্রন্থটি আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হতে উদ্ধার করেন। এর মধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটি ছোট ছোট গান আছে। মূল গ্রন্থের একটি তিব্বতী

১। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বৌদ্ধ সম্প্রদায় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদও মেলে। বইটির সংগে সুবিস্তৃত সংস্কৃত টীকা আছে। এ সব সহজিয়াচার্যদের সাহিত্য হতে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, চর্যাপদগুলি বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি দেখা দিল সেন-বর্মণ রাজত্বকালে। তখন বৌদ্ধধর্মে দেবদেবীর প্রভাব কমে গেল। বিহারের সংখ্যাও কম ছিল। অভয়াগুপ্তের মত দু'চার জন বৌদ্ধাচার্যের কথা সেন রাজত্বকালে জানা গেলেও বৌদ্ধধর্মের সক্রিয় অবস্থা বিশেষ জানা যায় না। সেন-বর্মণ রাজাদের ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরাগ। সেন রাজত্বের সময় বৌদ্ধদের বেদবাহ্য পাষণ্ড বলে মনে করা হত। লক্ষণসেন বৌদ্ধধর্মের প্রতি সম্ভবত বিরাগী ছিলেন না। তাঁর তর্পণদীঘি শাসনেও একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের খবর পাওয়া যায়। তা হলেও একদিকে যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ছিল অন্যদিকে মিলন-সমন্বয়েরও কিছু পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়ের ভাবটাই কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে বেদ ও যজ্ঞ-বিরোধী ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে নবম অবতার রূপে স্থান পেলেন।[১] লক্ষণসেনের সভা কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধকে স্মরণ করে এরূপ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন—

> 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
> সদয়-হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
> কেশবধৃত বুদ্ধশরীর
> জয় জগদীশ হরে'।

বৌদ্ধ তন্ত্রমার্গী সাধনা ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের সংগে মিশে গেল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনেও প্রভেদ কমে গেল। ধীরে, ধীরে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগে মিশে গেল। বিহারে ও সংঘারামে হাজার হাজার ভিক্ষু আর দেখা গেল না। নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী মহাবিহার তুর্কী আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল। হাজার হাজার বৌদ্ধ পুঁথি আগুনে পুড়ে গেল। যাঁরা এ

১। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিত গ্রন্থে বুদ্ধের অবতারের কথা জানা যায়।

আক্রমণ হতে রেহাই পেলেন তাঁরা নিজেদের উপাস্য দেবদেবী ও পুঁথি সংগে নিয়ে চলে গেলেন নেপাল, তিব্বত ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে।

সেনবংশের পরেও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। ১২২০ সালে মহারাজ রণবঙ্কমল্লহরিকালদেবের রাজত্বকালে তাঁর সহজপন্থী প্রধান মন্ত্রী দুর্গোত্তরার এক মন্দির নির্মাণ করান। শ্রুতি-স্মৃতি-আগম প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সিংহলে গিয়ে তাঁর বাকী জীবন কাটান। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। গৌড়েশ্বর পরমরাজাধিরাজ মধুসেন পরমসৌগত বলে একটি পাণ্ডুলিপি হতে জানা যায়। ১৪৩৬ সালে জনৈক সৎ বৌদ্ধ করণকায়স্থ ঠাকুর শ্রীঅমিতাভ বেণুগ্রামে বসে বাংলা অক্ষরে শান্তিদেব রচিত বোধিচর্যাবতার পুঁথিটি নকল করেন। তারানাথ বলেন, এ শতকের শেষের দিকে চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালী রাজা তাঁর রাণীর অনুরোধে বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংস্কার করেন। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম তার স্বরূপ নিয়ে বাংলায় আর বেঁচে রইল না। সেনবংশের পর পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায়গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের সংগে বাংলায় প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রসমূহ মিশে গেল। নিজস্ব সত্তা বাংলায় আর থাকল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের তিরোধান

বৌদ্ধধর্ম এককালে কেবলমাত্র ভারতে কেন, ভারতের বাইরেও নানা স্থানে প্রভাব বিস্তার করেছিল।। সম্রাট অশোকেব ঐকান্তিক চেষ্টায় এই ধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পবিণত হয়। কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। উত্থান ও পতন—এই রীতি। ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ও লীলাভূমি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কালক্রমে এই ধর্মকেও তার জন্মভূমি হতে নানা কারণে হীনপ্রভ ও বিলুপ্তপ্রায হতে হয়। এর কি কারণ—এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে। জাগাও স্বাভাবিক। মনীষীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। নানা মুনির নানা মত। প্রধান প্রধান কারণগুলি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে :—

দিব্যাবদান নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হতে জানা যায় শুংগ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন পুষ্যমিত্র। তিনি বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদের উপর যথেষ্ট নির্যাতন করেন ও বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসের চেষ্টা করেন। কথিত আছে তিনি অনেক বৌদ্ধস্তূপও ভূমিসাৎ করেন ও প্রত্যেক বৌদ্ধ শ্রমণের কর্তিত মস্তকের জন্য একশো দীনার[১] পুরস্কারেরও ঘোষণা করেন। তিনি পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সব বৌদ্ধবিহার এবং সম্রাট অশোক নির্মিত পাটলিপুত্রের প্রসিদ্ধ কুক্কুটারাম বিহারও ধ্বংস করেন। এখনও অনেক বৌদ্ধ আছে যারা রাজা পুষ্যমিত্রের নাম মুখে বলে না এবং তাঁর নাম শুনলে গালিগালাজ করে। অনেকে আবার রাজার নামে মুখে মুখে কুৎসিৎ ছড়া কাটে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ মনে করেন রাজা পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি কেবল মাত্র প্রতিকূল ছিলেন না, অধিকন্তু এর ঘোর বিরোধিতা করেন। প্রাচীন চৈনিক ও জাপানী ঐতিহাসিকেরা ধর্মীয় নির্যাতকদের মধ্যে পুষ্যমিত্রকে প্রথম স্থান দেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হ্যাভেলের মতে রাজা পুষ্যমিত্রের বৌদ্ধধর্মের উপর যতটা বিদ্বেষ না হোক তার চেয়ে বেশী ছিল তাঁর বৌদ্ধসংঘের উপর। তিনি সন্দেহ করতেন সংঘের অনেক ভিক্ষুই ছিলেন

১। স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ।

রাজশক্তির বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তে লিপ্ত। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। জানা যায় শুংগ রাজত্বকালে অনেক বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়। মধ্য ভারতের প্রসিদ্ধ ভাহ্‌র্ত স্তূপ শুংগ যুগেই নির্মিত হয়। আবার অশোকের নির্মিত সাঁচীস্তূপের সংস্কার ও সম্প্রসারণও করা হয়। এ সব প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপগুলির বেদিকা (রেলিং) ও তোরণ গাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধের জীবনী ও জাতক কাহিনী প্রভৃতি বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন ভারত তথা আন্তর্জাতিক শিল্প জগতে আজও উন্নত শিরে মর্যাদা লাভ করে। ভাহ্‌র্ত স্তূপের কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এতে মনে হয় বৌদ্ধরা রাজা পুষ্যমিত্রের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রচারে তখন তেমন কোন বাঁধার সৃষ্টি হয় নি।

শুংগ বংশের পর হতে প্রায় পাঁচশো বছরের অধিক কাল বৌদ্ধদের উপর রাজাদের অত্যাচারও নিপীড়নের কথা ইতিহাসের পাতায় কিছুই লিপিবদ্ধ নেই। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশে মর্যাদা নিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু এই গুপ্তযুগের শেষের দিকে দুর্ধর্ষ হুন জাতির আক্রমণে ভারতের জাতীয় ও ধর্ম জীবন নানা ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মে আবার দেখা দিল দুর্দিন। হুন নায়ক তোরমানের পুত্র ছিল মিহিরগুল। তিনি বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধিতা করতেন। তাঁর সময়ে বৌদ্ধরা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়। বৌদ্ধদের তিনি বিধর্মী ও সমাজদ্রোহী বলে মনে করতেন। সেজন্য অনেক বৌদ্ধকে তাঁর হাতে নিহত হতে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাঁর মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। কথিত আছে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহার ও মূর্তি ধ্বংস করেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ হতে জানা যায় রাজা মিহির-গুল তাঁকে শাস্ত্র গ্রন্থ পড়াতে একজন আচার্যের জন্য বৌদ্ধদের অনুরোধ করেন। বৌদ্ধরা কিন্তু একজন নীচজাতীয় ও হীনপদস্থ ভিক্ষুকে তাঁর কাছে পাঠান। এতে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন আরম্ভ করেন। ফলে এত বৌদ্ধ নিহত হয় যে, তাতে শ্বেতী নদীর জল নাকি রঞ্জিত হয়ে উঠে। আরও জানা যায় রাজা ১৬,০০ চৈত্য ও বিহার ধ্বংস করেন। ন' কোটি বৌদ্ধ গৃহীর প্রাণ সংহার করেন। এরূপে রাজা মিহিরগুলের নির্যাতনে বৌদ্ধধর্মের হল হীনদশা এবং বৌদ্ধরাও বিশেষ

অবসন্ন হয়ে পড়ল। কহ্লন প্রণীত রাজতরংগিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসেও রাজা মিহিরগুলের বৌদ্ধদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের সমর্থন মেলে। এ বিবরণ অবশ্য অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। তবে বৌদ্ধদের উপর রাজার যে নিপীড়ন, সে বিষয়ে সকলই একমত।

গুপ্তোত্তর যুগে রাজা হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান হয়। এ ধর্ম কিছু দিনের জন্য পেল নব জীবন। হর্ষবর্ধনের পর আর কোন শক্তিশালী সম্রাটই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন নি। হর্ষবর্ধনের সময়ে আবার বাংলায় রাজত্ব করতেন রাজা শশাঙ্ক। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে। তিনি হর্ষবর্ধনের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ও তাঁর প্রবল বিপক্ষ ছিলেন। রাজা শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। তিনি বৌদ্ধদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করেন। হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ হতে বৌদ্ধদের উপর বিবিধ অত্যাচার ও সদ্ধর্মের নিন্দার কথা জানা যায়। কথিত আছে কুশীনগরের বিহার হতে ভিক্ষুদের বিতাড়িত করেন ও পাটলিপুত্রের বুদ্ধের পদচিহ্নিত স্মারক প্রস্তরটি গঙ্গানদীর জলে ফেলে দেন। তিনি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ নিজের হাতে কাটেন ও অবাশিষ্ট যা কিছু ছিল সবই পুড়িয়ে দেন। সেখানকার বুদ্ধমূর্তিটি স্থানান্তরিত করে মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। কর্মফল কেহ রোধ করতে পারে না। সৎকাজের সৎফল ও অসৎকাজের অসৎফল—এ হচ্ছে জগতের চিরাচরিত রীতি। সুতরাং রাজা শশাঙ্ককে এ পাপ কাজের সমুচিত প্রতিফল পেতে হয়েছিল। এ অপকর্মের ফলে তার কুষ্ঠরোগ হয়। এ রোগে তিনি মারা যান। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক বৌদ্ধ গ্রন্থেও রাজা শশাঙ্কের এ উৎপীড়ন কাহিনীর উল্লেখ আছে। এ বিবরণে অতিশয়োক্তি আছে বলে মনে হয়। তবে এও সুনিশ্চিত যে তিনি একজন ঘোর বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর যে নিদারুণ আঘাত হানেন তাতেই তারা যথেষ্ট হীনবল হয়ে পড়ে এবং এ ভাবে ধর্মের প্রভাব বাংলায় বেশ হ্রাস পেল। ফলে এ ধর্মটি লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠে।

রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর বেশ কিছু কাল পরে বাংলায় পাল রাজাদের

ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম আবার কিছু দিনের জন্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। এঁদের সময়ে বাংলা ছিল ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয় স্থল। কিন্তু এযুগে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন হল। এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করল এটি। রূপান্তরিত হল মন্ত্রযান, বজ্রযান ইত্যাদি ধর্মে। গৌতম বুদ্ধের নীতিমূলক ধর্ম শেষে হল মন্ত্র, তন্ত্র, গুহ্য, সাধন প্রণালী বহুল ধর্ম। এটিকেই বলা হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। পাল রাজাদের সময়ে কিছুটা সজীবতা লাভ করলেও এ যুগেই আবার তার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে গেল।

মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারও বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের কারণ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতে মুসলমানেরাই ছিল ধর্মীয় অত্যাচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপীড়ক। জানা যায় তারা যেখানেই যখন গেছে, গিয়েছিল সেখানে খাঁড়া হাতে। তারা বিদেশীদের ধর্মনাশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত ও একাজে প্রায়ই কৃতকার্য হত। ভারতের ইতিহাসেও এর সমর্থন প্রচুর মেলে। এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম তার আভ্যন্তরীণ অবনতির জন্য ভারতে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এজন্য অতর্কিত প্রবল ইসলামী প্লাবন রোধ করতে পারে নি। ভেসে গেল এর দুর্বার স্রোতে। বৌদ্ধধর্মের বিতাড়নে বীভৎস হত্যাকাণ্ড গোড়া হিন্দুদের অত্যাচারের চেয়েও বেশী কার্যকরী হয়। ভারতের অনেক অঞ্চল হতে বৌদ্ধধর্মকে বিলোপ পেতে হল। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বখ্‌তিয়ার দু'শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিহারের ওদন্তপুরী মহাবিহার আক্রমণ করে। প্রায় বিনা প্রতিরোধেই তিনি এটি দখল করেন। মহাবিহারের যে সব ধন রত্ন ছিল সবই তাঁর হস্তগত হয়। মুণ্ডিতমস্তক যাঁরা সেই বিহারে ছিলেন তাঁদের সকলকেই তাঁর হাতে নিহত হতে হল। তারপর যখন তিনি এই মহাবিহারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু জানবার জন্য পণ্ডিতের খোঁজ করেন তখন জানতে পারলেন যে, তুর্কি সৈন্যরা তাঁদের সবাইকে হত্যা করেছে। একজনও জীবিত নেই যে এগুলোর পাঠোদ্ধার করেন। তখনই বখ্‌তিয়ার বুঝতে পারলেন যে, ওদন্তপুরী মহাবিহার সৈন্যদের দুর্গ নহে। এটি একটি বৌদ্ধবিহার এবং মুণ্ডিতমস্তকেরা ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। এরূপে বৌদ্ধধর্ম হিমালয়ের দক্ষিণে উত্তর ভারতে শেষ আশ্রয়স্থল হতে একজন মাত্র ভাগ্যান্বেষী মুসলমানের তরবারির আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বৌদ্ধধর্মের তিরোধান

পূর্বেই বলেছি রাজাদের সক্রিয় সহায়তা না পেলে কোন ধর্মই প্রসার লাভ করতে ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকতে পারে না। অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি ভারতের পরাক্রমশালী সম্রাটদের এবং বাংলায় পাল রাজাদের আনুকুল্যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার হয়েছিল। এঁদের পর বৌদ্ধধর্ম আর কোন শক্তিশালী রাজন্যবর্গের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে নি। ক্রমশ এর প্রভাব হ্রাস পেতে লাগল এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হল। রাজাদের আনুকুল্যের অভাবও বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের অন্যতম কারণ।

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁর উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সংঘে কোন দলাদাল বা গোলমালের সৃষ্টি হয় নি। তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর সংঘের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য কাউকেও সংঘের প্রধান নায়ক মনোনীত করা হয় নি। আগেই বলেছি মহাপরিনির্বাণের পুর্বে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের আত্মদীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ, ধর্মদীপ ও ধর্মশরণ হতে উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন তাঁর প্রচারিত ধর্ম-বিনয়ই মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর স্থান অধিকার করবে। সংঘের প্রধান নায়ক না থাকার দরুণ বিভিন্ন জায়গার সংঘনায়কেরা স্ব স্ব প্রধান ছিলেন। তাঁরা নিজেদের সুবিধামত কাল ও স্থানোপযোগী করে বুদ্ধের মতবাদের ব্যাখ্যা ও প্রচার করতেন। ফলে সদ্ধর্মের মূলতত্ত্ব ও মতবাদে বিকৃত রূপ দেখা দিল এবং নষ্ট হল এর পবিত্রতা। সুতরাং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা এ ধর্মের উপর ক্রমশ আস্থা হারাতে লাগলেন।

কেউ কেউ মনে করেন সংঘ যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ তেমনি আবার এর তিরোধানের জন্য দায়ী এ সংঘ। সংঘের ছিল অবারিত দ্বার। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই সংঘে প্রবেশের অধিকার ছিল। ফলে অনেক কপট ও চতুর লোক ভিক্ষু হয়ে সংঘে স্থান পেল। সদ্ধর্মের প্রতি তাদের মোটেই কোন আস্থা ও আন্তরিক টান ছিল না। বিনা কায়ক্লেশে উদরপূর্তির ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করার জন্যই সংঘে প্রবেশ করে। তারা সদ্ধর্মের প্রচার ও সংঘের পুষ্টি করা তো দূরের কথা বরং এ ধর্মের কণ্টক স্বরূপ হয়ে উঠে। এসব অধর্মপরায়ণ লোকেরা সংঘে স্থান পাওয়ার দরুণ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হীন হয় ও তিরোধানের পথে দ্রুত এগিয়ে চলে।

বৌদ্ধধর্মের ঐকান্তিক দুঃখবাদ অনেকের মতে এ ধর্মের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সর্বদা উপদেশ দিতেন, জন্ম দুঃখ, জরা, ব্যাধি

প্রভৃতিতে দুঃখ। জীবন কেবলই দুঃখময়। মানুষ কিন্তু জীবনে দুঃখ চায় না। সে চায় অপার আনন্দ ও সুখ। এই দুঃখতত্ত্ব জনসাধারণকে সদ্ধর্মের দিকে তত আকৃষ্ট করতে পারল না।

বৌদ্ধধর্মের গোড়ার দিকে পূজা-অর্চনাদির কোন স্থান ছিল না। ভগবান বুদ্ধ পূজা ও ক্রিয়াকলাপাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এ সব অনুষ্ঠানাদি সদ্ধর্মে প্রবেশ করে। কুষাণযুগ হতে আবার বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজা আরম্ভ হল। তারপর পালযুগের সময় বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হল। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদিই পেল প্রাধান্য। ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাধান্য লাভ করল এবং বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ হীনপ্রভ হয়ে গেল।

দক্ষিণ-ভারতের কয়েকজন হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকেব আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণ হয়ে উঠে। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন ও হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থানের যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কুমাবিলভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি। কুমারিলভট্ট ছিলেন বৌদ্ধদের ঘোর বিপক্ষ। তিনি তাঁব গ্রন্থে বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মহিমা ঘোষণা করেন। জনসাধারণ বৌদ্ধধর্মের উপর ক্রমশ আস্থা হারায়। কুমারিলের সময় উজ্জয়িনীতে রাজা ছিলেন সুধন্বা। তিনিও কুমারিলের প্ররোচনায় বৌদ্ধদের সংহারে বদ্ধপরিকর হন। তিনি আবার তার কর্মচারীদের নৃশংস আদেশ দেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর হতে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে যত আবালবৃদ্ধ বৌদ্ধ আছে তাদের হত্যা করতে। যারা হত্যা না করে তারা বধ্য। এটি মনে হয় অতিশয়োক্তি। কিন্তু একেবারে অন্তঃসারশূন্য নয়। কেরাল-উৎপত্তি নামক কেরলের ইতিবৃত্ত হতে জানা যায় কুমারিলভট্ট কেরালা হতে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেন। শঙ্করাচার্য আবার বেদ ও বেদান্তের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করে শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা বৌদ্ধমতের অসারত্ব প্রমাণ করেন। ফলে বৌদ্ধধর্ম হীনপ্রভ হয়ে উঠল ও হিন্দুধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। কেউ কেউ মনে করেন শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করেন নি বরং এর বিশেষ বিশেষ মত ও ভাবধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। এজন্য এঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়।

পরিশেষে হিন্দুবা বৌদ্ধদের কিছু কিছু ভাব ও মত গ্রহণ করল এবং বৌদ্ধ-ধর্মও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাথে আস্তে আস্তে মিশে গেল। তারপর বুদ্ধদেবকে আবার বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম অবতার বলে হিন্দুরা মেনে নিল।

বৌদ্ধধর্মের তিরোধান

হিন্দুধর্ম চিরকালই বড় উদার ও পরমত সহিষ্ণু। পরকে আপনার করে নেওয়াই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এজন্য বৌদ্ধধর্ম ভারত হতে একেবারে বিতাডিত হল না। হিন্দুধর্মের সংগে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাই ভারতবষের হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মের সংগে হিন্দুধর্মের মূল পার্থক্য দেখে না। সমগ্র ভারত আজও গৌতম বুদ্ধেব উদ্দেশ্যে তাব অন্তবেব শ্রদ্ধা নিবেদন কবে। কবির কথায়—

'উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত কবিতে মোক্ষদ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর।'

গ্রন্থপঞ্জী

Bapat (editor)
—2,500 years of Buddhism

Conze—Buddhism
—its Essence and Development

Dutt Nalinaksa
—Early History of the spread of Buddhism and the Buddhist schools
—Aspects of Mahāyāna Buddhism
—Early Monastic Buddhism

Dutt N and K. D. Bajpai
—Development of Buddhism in Uttar Pradesh

Dutt Sukumar
—Early Buddhist Monachism
—Buddhist Monks and Monasteries of India

Eliot C.
—Hinduism and Buddhism Vols. II and III

Keith A.B.
—Buddhist Philosophy in India and Ceylon

Kern
—Manual of Indian Buddhism

Law B. C.
—History of Pali Literature
—Buddhistic Studies

Majumdar Ramesh Chandra (ed.)
—History of Bengal Vol. I

Mitra R. C.
—Decline of Buddhism in India

Mukherjee Radha Kumud
—Ancient Indian Education

Oldenberg—Buddha

Ray Chaudhuri Hem Chandra
—Political History of Ancient India

Rhys Davids
—Buddhist India

Smith V. A.
—Early History of India

Thomas E. J.
—The Life of Buddha as Legend and History.
—The History of Buddhist Thought

Vidyabhusana S. C.
—History of Indian Logic

Williams M. Monier
—Buddhism

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত
—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
—বাঙ্গালীর ইতিহাস।

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী
—বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ
—বুদ্ধ-প্রসঙ্গ

ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
—বুদ্ধদেব

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
—বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
—বুদ্ধদেব

নির্দেশিকা